সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরী'আহ আইনের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০[illegible]

RB
B
340.59
HOS

Dhaka University Institutional Repository

404217

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরী'আহ আইনের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

উপস্থাপক
মোঃ জাকির হোসেন
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০০৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ***মোঃ জাকির হোসেন***, এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আমার তত্ত্বাবধানে ***"সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরী'আহ আইনের ভূমিকা"*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কাজ সম্পন্ন করেছে। আমার জানামতে অভিসন্দর্ভটির পুরো অংশ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লাভের জন্য এবং কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রকাশের জন্য পেশ করা হয়নি। তাই এম.ফিল ডিগ্রী প্রদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরনের জন্য অভিসন্দর্ভটি জমা নেয়া যেতে পারে।

৫.৭.০৭

(ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান)
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

404217

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, *"সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরীআহ আইনের ভূমিকা"* শীর্ষক আমার রচিত অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা এর অংশ বিশেষ, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সংস্থায় ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করিনি। এটা আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

05.07.07

(মোঃ জাকির হোসেন)
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

404217

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে *"সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরী'আহ আইনের ভূমিকা"* শীর্ষক শিরোনামে আমার রচিত অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি।

আলোচ্য বিষয়ে এম.ফিল করার পটভূমি সম্পর্কে এখানে দু'টি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম.ফিল গবেষণা কর্ম শুরুর পূর্বে ইসলামী শরী'আহ্ নিয়ে একটি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার মনস্থির করি। ইতোমধ্যে মালয়েশীয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদের বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামের বক্তৃতা আমার নজরে আসে। তিনি ইসলামী শরী'আহ্র বিষয়ে বিশ্ববাসীকে জাগ্রত হওয়ার আহ্বান জানান এবং সুশাসনের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ আইনের কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম তার প্রমান উপস্থান করেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরী'আহ আইন শীর্ষক গবেষণা কর্ম ও অনুসন্ধনী পঠন পাঠনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হই। পরবর্তীতে এ বিষয়ে গবেষণা করার চিন্তা নিয়ে আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবয়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. এ,বি,এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী এর সাথে আলোচনা করলে তাঁরাও আমাকে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য পরামর্শ দান করেন।

অতঃপর আমার তত্ত্বাবধায়ক মহোয়ের পরামর্শক্রমে *"সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরী'আহ্ আইনের ভূমিকা"* শীর্ষক গবেষণ অভিসন্দর্ভ রচনার প্রত্যয় নিয়ে ২০০২-২০০৩ শিক্ষা বর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হতে এম.ফিল প্রোগ্রামে রেজিষ্ট্রেশন করি। দীর্ঘদিন যাবৎ তথ্য উপাও সংগ্রহের পর সম্প্রতি উক্ত বিষয়ে প্রণীত খসড়াটি তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় সমীপে পেশ করলে তিনি অনুপুংখ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান তাঁর অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে গবেষণা পদ্ধতি সহ সার্বিক বিষয়ে আমাকে অকৃপণভাবে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর সঠিক তত্ত্বাবধান, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা না পেলে আমার অভিসন্দর্ভটি যথার্থভাবে উপস্থাপন সম্ভব হত না। তাঁর ঔদার্য ও মহানুভবতার জন্য আমি তাঁর নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ। আমি তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। এ পর্যায়ে যাঁর কথা উল্লেখ না করলেই নয় তিনি হলেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরনায় উজ্জীবিত হয়েই আমার গবেষণাকর্ম ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছি।

আজকের এক্ষণে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পিতা হাজী মোঃ মুজাফ্ফর আলীকে, যাঁর একান্ত ইচ্ছা, উৎসাহ উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরনায় আমার উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষার পথ সুগম হয়েছিল। মহান আল্লাহর দরবারে আমার বিশেষ মুনাজাত তিনি যেন আমার অসুস্থ্য আব্বাকে দ্রুত আরোগ্য দান করেন। সে সাথে গভীর শ্রদ্ধা জানাই আমার মা বেগম হাসমতের নেছাকে যাঁর আপত্য স্নেহ, ভালবাসা ও আন্তরিক দু'আ-ই হল আমার জীবন চলার ও জ্ঞানার্জনের একমাত্র পাথেয়। তিনি সর্বদা নামাজান্তে দু'হাত তুলে আমার সাফল্য কামনা করেন। আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

আমার গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট দুষ্পাপ্য তথ্য উপাও ও গবেষণা উপকরণ দিয়ে যারা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহফুজুর রহমান, দাওয়াহ্ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ আবদুল কাদের, ফিক্হ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ জাকারিয়া, দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মঈন উদ্দীন, ধর্ম- বিজ্ঞান অনুষদের সহকারী অধ্যাপক ড. মোঃ অলিউল্লাহ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোঃ মানজুরে এলাহী, ড. মোঃ আনোয়ারুল কবীর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চিটাগাং এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হারুনুর রশিদ এবং ঢাকা স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হারুনুর রশিদ, ইসলামিক ল-রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারম্যান এডভোকেট নজরুল ইসলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য ডক্টরেট ডিগ্রীধারী ডক্টর মুহাম্মদ আবুল বাসার প্রমুখ। আমি এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমার গবেষণা কর্মের দীর্ঘকালীন কর্ম-প্রচেষ্টাকে সজ্জীবিত রাখতে যাঁরা পরামর্শ ও আন্তরিক দু'আ ও প্রেরনা যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুহতারাম মাওলানা মোঃ মাহবুবুর রহমান (অধ্যক্ষ' ছুপুয়া ছুপারিয়া সিনিয়র মাদরাসা), মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মদ হাশমত উল্লাহ (মুহাদ্দিস, জা'মিয়া ফালাহিয়া, ফেনী), মুহতারাম শিক্ষক মরহুম কাজী নুরুল ইসলাম, মরহুম উপাধ্যক্ষ মাওলানা এ,কিউ,এম, ছিফাতুল্লাহ, (উপাধ্যক্ষ তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা) মাওলানা মোঃ শফিকুর রহমান (উস্তাদ তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল লতিফ, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মোঃ ফরিদউদ্দিন, (প্রধান শিক্ষক শ্রীমন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়) এবং আমার সহধর্মীনি মোছাঃ মাহিনূর আক্তার। আমি তাদেরকে অকৃত্রিম সাহায্য সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার প্রার্থনা করছি।

সর্বোপরি আমার অভিসন্দর্ভের কাজ চালিযে যেতে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার হতে উপাও উপকরণ সংগ্রহ করেছি তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরী, দারুল ইহ্সান লাইব্রেরী এবং পাবলিক লাইব্রেরী ঢাকা অন্যতম। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগীতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞা থাকল।

পরিশেষে কম্পিউটার অপারেটর কাজে সহযোগীতা করার জন্য বন্ধু মাওলানা মোঃ আনোয়ার হোসাইন এবং স্নেহাস্পদ ভাতিজা দিদারুল আলমকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

০১.০৭.০৭.

(মোঃ জাকির হোসেন)
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

স.	ঃ	সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা
রা.	ঃ	রাদিয়াল্লাহু আনহু/আনহা/আনহুম
আ.	ঃ	আলাইহিস সালাম/আরবী
র.	ঃ	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
ইং.	ঃ	ইংরেজী
হি.	ঃ	হিজরী
খ্রী.	ঃ	খ্রীষ্টাব্দ
খ্রী. পূ	ঃ	খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ
মৃ.	ঃ	মৃত/মৃত্যু
ড.	ঃ	ডক্টর
অনু-অনূ.	ঃ	অনুবাদ/অনূদিত
পৃ.	ঃ	পৃষ্ঠা
ইফাবা	ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
তা. বি	ঃ	তারিখ বিহীন
খ.	ঃ	খন্ড
মাও.	ঃ	মাওলানা
মোঃ/মুহাঃ	ঃ	মোহাম্মদ/মুহাম্মদ
জ.	ঃ	জন্ম
JASB	ঃ	Journal of Asiatic Society of Bengal.
P	ঃ	Page Operac. Citrae
Op. cit	ঃ	Operac. Citrae
S.m	ঃ	Sallallahu Aliahi Wasallam
Ibid	ঃ	(Ibidem) in the same place, From the same source
Dr.	ঃ	Doctor (of Philosophy)
Ed.	ঃ	Edition/Editor/Edited

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা :

ইসলাম শব্দের অর্থ হল আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ এবং বিধি-বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করা। আর ইসলামী শাসন ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল আল্লাহর বিধানাবলীর অধীনে থেকে দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়াবলীতে সমাজের যাবতীয় কার্য পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ। আল্লাহর হকসমূহ ও বান্দার হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা এবং ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে মানব জাতির মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা ও তাদের সুখ সমৃদ্ধ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এ সংক্রান্ত আল্লাহ প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ এবং বিধি-বিধানের সমষ্টিকেই মূলত: ইসলামী শরী'আহ। ইসলামী শরী'আর বিষয়বস্তু হল মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যে আবদ মা'বুদ সম্পর্ক নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ, মানুষের সাথে অপর মানুষ ও জীবের সম্পর্ক নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং এ দুই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর সৃষ্ট এবং আল্লাহ কর্তৃক জীবের কল্যাণে নিয়োজিত যাবতীয় সামগ্রির ব্যবহার, বণ্টন ইত্যাদির নীতিমালা। আর এই নীতিমালাই ইসলামী শরী'আহ আইন নামে পরিচিত। ইসলামী শরী'আহর উৎস মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশ ওহী হলেও তার প্রাণ বা মূল হচ্ছে মনুষ্যত্ব, যৌক্তিকতা, বাস্তবকর্ম ও সভ্যতা সংস্কৃতি। তার লক্ষ্য আল্লাহর বান্দাদের উপর প্রভূত্য ও আধিপত্য করা নয়, বরং তার লক্ষ্য বান্দাদের কল্যাণ সাধন। তাতে শক্তি প্রয়োগের নীতি স্বীকৃত নয়, বরং তা সংশোধন ও পবিত্রকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'সুশাসন' একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুশাসন শব্দটি অপশাসন ও অপরাজনীতির বিপরীত শব্দকেই বুঝায়। ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দ হল Good Governance. সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর এটা সম্ভব হয়েছিল ইসলামী শরী'আহ আইনের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (স.) এবং খোলাফায়ে রাশেদার প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে। কোন রাষ্ট্রে আইনকে তার যথাযথ গতিতে চলতে দেয়া এবং আইন প্রয়োগে কোনরূপ বাঁধা সৃষ্টি না করাই সুশাসনের প্রধান লক্ষণ। ইসলামী শরী'আহ্ আইনে ব্যক্তির প্রতি সর্বাবস্থায় লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যথাযথ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইসলামী শরী'আহ আইনের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে (১) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আল্লাহর রাজত্ব ও শাসন কায়েম করা (২) শাসনকর্তাদের মাধ্যমে আল্লাহর হকসমূহের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হকসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং (৩) উন্নততর সামাজিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা বিধান ছাড়াও ব্যক্তির আত্মার পবিত্রতা সাধনের উদ্দেশ্যে ন্যায়বিচার ও সৎ গুণাবলীর সংরক্ষণ। ইসলামী শরী'আহ আইন ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠী বিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণের হাতিয়ার নয়, বরং তা মানব সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য এবং আদল ও ইনসাফের গুণাবলী সৃষ্টি করে থাকে। তাই এ আইন কোন ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা মানে না। ইসলামের মতে, কোন অপরাধী ব্যক্তিই রাষ্ট্রের মর্যাদা ও জনস্বার্থের অজুহাতে আইনের শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পেতে পারে না। যেমন হযরত মুহাম্মদ (স.) ঘোষণা করেছিলেন যে, চৌর্য অপরাধে ধরা পড়লে তিনি তাঁর প্রিয় নন্দিনী ফাতিমার (রা.) হাত কাটার হুকুম দিতেও দ্বিধাবোধ করবেন না। খিলাফতের সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্য হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আলীকেও (রা.) বিচারকের এজলাশে হাজির হতে হয়েছিল। আইনের শাসন নীতি মুসলিম সমাজে এত অধিক দৃঢ়মূল হয়েছিল যে, রাজতন্ত্রের যুগেও বাগদাদের উদ্ধত আব্বাসীয় সুলতান আল মানসুরকে সামান্য একজন উষ্ট্র চালকের নালিশের জবাব দেবার জন্য স্বীয় প্রতিষ্ঠিত বিচালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। আইনের শাসনের এই আদর্শ ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ভিত্তিমূল। সুতরাং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরী'আহ আইনের এমন অনুপম নমুনা বিশ্বের ইতিহাসে আর নেই। ইসলামী শরী'আহ আইন-কানূনের বর্ননার

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি তাকওয়া, আত্মার সংশোধন সর্বোপরি তাওবার মাধ্যমে প্রতি ব্যক্তির সার্বিক সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে।

ইসলামী শরী'আহর ভিত্তি মূলের উপর একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে সেখানে সুশাসনের সূতিকগার তৈরী হওয়া নিশ্চিত। আর এরই আলোকে কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াসের আলোকে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা ও বিধি-বিধানকে যুক্তিভিত্তিক ব্যাপক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে আমাদের সমাজ জীবনে তার যথাযথ প্রয়োগ ও উপযোগীতা সম্পর্কে জনমনে সচেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে নিম্নোক্ত পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে অভিসন্দর্ভের অবয়র ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা হয়েছে। যেমন-

প্রথম অধ্যায়ে ইসলামী শরী'আহ, ইসলামী শরী'আহ আইনের পরিচয়, ইসলামী শরী'আহ আইনের গুরুত, ইসলামী শরী'আহ আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যে পার্থক্য, ইসলামী শরী'আহ আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শরী'আহ আইনের উৎসসমূহ ও এর বৈশিষ্টাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামী শরী'আহ আইনে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা রক্ষা, মানব জীবন সংরক্ষণ, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এবং বাকস্বাধীনতা, দ্বীনের সংরক্ষণ বা ধর্মীয় চিন্তার স্বাধীনতা, মানুষের সম্পদের সংরক্ষণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে ইসলামী শরী'আহর আইনী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী শরী'আহ আইনের প্রায়োগিক ধারা নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করতে গিয়ে ইসলামী শরী'আতে সংস্কৃতি ও এর বিভিন্ন দিক; ধর্মীয় জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে, নৈতিক জীবনে, বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে এবং রাজনৈতিক জীবনে এর প্রয়োগ তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী সমাজে পরিবার ও পারিবারিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনে এর প্রযোগ তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব, বিয়ের গুরুত্ব, বিয়ের উদ্দেশ্যে এবং ইসলামী শরীআহ আইনে পারস্পরিক অধিকার সমূহ, মহিরাদের প্রাপ্য অধিকার, সন্তানের গুরুত্ব ও অধিকার, মুসলিম, পরিবারে পিতামাতার অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, আত্মীয় স্বজনের অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার বিষয়ক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

চর্তুথ অধ্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করণে ইসলামী শরী'আহ আইনের ভূমিকা, সুশাসন, রাষ্ট্র চিন্তা, রাষ্ট্রের বৈশিষ্টসমূহ, সার্বভৌমত্ব, আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব, ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী সরকার, ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ, গণতন্ত্রের ভূমিকা ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ, সুশাসনের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্টাবলী ও আধুনিক বিশ্ব বিষয়ক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরী'আহ আইনের সহায়ক ভূমিকা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অপরিহার্যতা, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ন্যায়বিচারের ভূমিকা, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিচারব্যবস্থা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের গুরুত্ব, আইন রচনা ও প্রয়োগনীতি আইনের শাসনের জন্য করণীয় দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী শরী'আয় উল্লেখিত বিষয়ের যুগান্তকারী অপরিহার্যতা তুলে ধরা হয়েছে। পরিবেশেষে ইসলামী শরী'আহ আইনের নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা নিয়ে পর্যালোচনা করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

মোঃ জাকির হোসেন
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়ন পত্র
ঘোষণাপত্র
কৃতজ্ঞতা স্বীকার
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা
ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী শরী'আহ আইনের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য (১-৪২)

ইসলামী শরী'আহর পরিচয় ২
ইসলামী শরী'আহ আইনের পরিচয় ৩
ইসলামী শরী'আহ আইনের গুরুত্ব ৬
ইসলামী শরী'আহ আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যে পার্থক্য ৭
ইসলামী শরী'আহ আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৯
মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ এর উদাহরণ ১০
ইসলামী শরী'আহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এর দলিল প্রমান ১১
উদ্দেশ্যের শ্রেণী বিভাগ ১৪
ইসলামী শরী'আহ আইনের উৎসসমূহ ১৬
কিতাবুল্লাহ ১৯
সুন্নাহ ২০
ইজমা ২২
কিয়াস ২৪
ইস্তিহ্সান ২৫
মুসলিহাত। ২৬
ইসলামী শরী'আহ আইনের বৈশিষ্ট্যাবলী ২৭
তথ্যসূত্র ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী শরী'আহ আইনে মানবজীবন (৪৩-৮২)

উপক্রমণিকা ৪৪
ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা রক্ষা ৪৬
যিনা ব্যভিচারের সংজ্ঞা ৪৯
যিনা ব্যভিচার নির্ধারণের প্রমান সমূহ ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

অবিবাহিতের শাস্তির বিধান ৫২
বিবাহিতের শাস্তির বিধান ৫৩
সমকামিতার শাস্তি ৫৩
ব্যভিচারের শাস্তির যৌক্তিকতা ৫৪
মানব জীবন সংরক্ষণ ৫৬
ইসলামী আইনে হত্যা
হত্যা ও কিসাসের সংজ্ঞা ৫৭
ইসলামী আইনে হত্যা ৫৭
রক্তপণ (দিয়াত) এর বিধান ৫৯
রক্তপণ (দিয়াত) এর পরিমান ৫৯
অঙ্গহানির বিধান ৬০
হত্যার শাস্তি হিসাবে কাফ্ফারা, মিরাছ এবং অছিয়ত থেকে বঞ্চিত করা ৬০
হত্যা আইনের যৌক্তিকতা ৬১
মানুষের বুদ্ধি বৃত্তিক বিকাশ সাধন এবং বাক স্বাধীনতা ৬৪
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষণ ৬২
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ৬৬
বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ৬৭
দ্বীনের সংরক্ষণ বা ধর্মীয় চিন্তার স্বাধীনতা ৭০
দ্বীনের হিফাজতের উপায় ৭০
মানুষের সম্পদের সংরক্ষণ ৭৩
চুরির আভিধানিক ও পারিভাষিক ব্যাখ্যা ৭৩
চুরির প্রমাণ ৭৪
চোরের শর্তাবলী ৭৫
ইসলামী শরী'আহ আইনে চোরের বিধান ৭৫
ইসলামী শরী'আহ আইনে চোরের শাস্তি যৌক্তিকতা ৭৬
তথ্যসূত্র ৭৯

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী শরী'আহ আইনের প্রায়োগিক ধারা (৮৩-১৪২)

ইসলামী শরী'আতের সংস্কৃতি ও এর বিভিন্ন দিক ৮৪
আধ্যাত্মিক জীবনে ৮৫
নৈতিক জীবনে ৮৭
বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে ৮৮
সামাজিক জীবনে ৮৯
অর্থনৈতিক জীবনে ৯২
রাজনৈতিক জীবনে ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবন ৯৭
পরিবার পরিচিতি ৯৭
ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ১০১
বিয়ের গুরুত্ব ১০২
বিয়ের উদ্দেশ্য ১০৩
একাধিক বিয়ে এবং এ ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা ১০৫
ইসলামী শরী'আতে মহিলাদের প্রাপ্য অধিকার ১০৭
তালাক সম্পর্কীয় বিধান ১০৮
ইসলামী শরী'আহ আইনে সন্তানের গুরুত্ব ও অধিকার ১১২
ইসলামী শরী'আহ আইনে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য ১২৫
স্বামী স্ত্রীর অধিকার ১২৫
পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের অধিকার ১২৭
প্রতিবেশীর অধিকার ১৩৪
তথ্যসূত্র ১৩৭

চতুর্থ অধ্যায়

সুশাসন নিশ্চিত করণে ইসলামী শরী'আহ আইন (১৪৩-১৯৩)

সুশাসনের ধারণাগত পরিচিতি ১৪৪
রাষ্ট্রের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সমূহ ১৫৯
সার্বভৌমত্ব ১৫২
সার্বভৌমত্ব প্রয়োগে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ১৫৭
সরকার ১৬০
ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ ১৬১
কুর'আনের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের রূপরেখা ১৬১
ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের গুণাবলী ১৬২
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাসূল (স.) এর ভূমিকা ১৬৩
সুশাসন ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় খোলাফায়ে রাশেদীন ১৬৪
হযরত উমরের (রা.) সুশাসন ১৬৮
হযরত উমরের (রা.) প্রশাসনিক ব্যবস্থা ১৬৯
গণতন্ত্রের ধারণা ১৭৬
ইসলামে গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতায় রাসূল (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদীন
ইসলাম ও গণতন্ত্র ১৭৬
ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য ১৭৭
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই ইসলামী পদ্ধতি ১৭৮
সুশাসনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভূমিকা ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ ১৮০
সুশাসনের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্টাবলী ও আধুনিক বিশ্ব ১৮৫
তথ্য সূত্র ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরী'আহ আইনের সহায়ক ভূমিকা (১৯৪-২০৯)

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ন্যায়বিচারের ভূমিকা ১৯৫
সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অপরিহার্যতা ১৯৭
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ২০০
ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ২০১
বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের গুরুত্ব ২০২
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিচার বিভাগ ২০৩
আইনের শাসনের নীতি ও অভিব্যক্তি ২০৪
আইনের শাসনের জন্য করনীয় ২০৫
দূর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিচার বিভাগ ২০৫
তথ্যসূত্র ২১২

উপসংহার/মূল্যায়ন (২০৯-২১২)

গ্রন্থপঞ্জি (২১৩-২২২)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী শরী'আহ আইনের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শরী'আহর পরিচয়

ইসলামী শরী'আহ আইনের পরিচয়

ইসলামী শরী'আহ আইনের গুরুত্ব

ইসলামী শরী'আহ আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী শরী'আহ আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ এর উদাহরণ

ইসলামী শরী'আহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এর দলিল প্রমান

উদ্দেশ্যের শ্রেণী বিভাগ

ইসলামী শরী'আহ আইনের উৎসসমূহ

কিতাবুল্লাহ

সুন্নাহ

ইজমা

কিয়াস

ইস্তিহ্সান

মুসলিহাত।

ইসলামী শরী'আহ আইনের বৈশিষ্ট্যাবলী

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরী'আহর পরিচয় :

শরী'আহ শব্দটি আরবী শব্দ। বাংলায়ও এ শব্দটির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এ শব্দটি অতি প্রাচীনকাল থেকে আরবগণ ব্যবহার করে আসছে, এর শাব্দিক অর্থ জলাশয় কিংবা কূপে যাবার জন্য পথ, পানির রাস্তা বা সরবরাহ কেন্দ্র। সেই পানি যাকে কেন্দ্র করে পিপাসার্তরা একত্রিত হয় এবং তা পান করে। আইনের আরবী প্রতিশব্দ আল-তাশরী' যা আশ-শারঊ' শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ পানির উৎপত্তির স্থান, ট্যাংকি, ঝর্ণা। আরবীতে মজবুত, বিস্তৃত ও বড় রাস্তাকে আশ-শারে' বলে। অনুরূপভাবে স্পষ্টতা ও চলার পথ ইত্যাদি অর্থে আত্-তাশরী' (التشريع)'আইন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[১] প্রাথমিককালে শরী'আহ শব্দটি শুধুমাত্র আক্বিদা বা বিশ্বাস এবং ব্যবহারিক আহ্কামের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। পরবর্তীতে ইসলামী জীবন বিধানের ক্ষেত্রে শরী'আহ শব্দটির প্রচলন শুরু হয়, যা অনুসরনীয় স্পষ্ট পথ। বর্তমানেও উপরোক্ত শাব্দিক অর্থগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে শরী'আহ শব্দটি একটি ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর তা হল- শরী'আহ এক সুদৃঢ় পথ যা দ্বারা তার অবলম্বনকারী লোকেরা হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম পথ লাভ করতে পারে। [২] আরবী 'শারা'আ' শব্দের আভিধানিক অর্থ রাস্তা তৈরী করা এবং এর পারিভাষিক অর্থ পদ্ধতি,বিধি ও নিয়ম কানূন রচনা করা। এই পারিভাষিক অর্থানুসারে আরবী ভাষায় 'শারা'আ' আইন প্রণয়ন এবং 'শরী'আহ' শব্দটি আইন এবং 'শারে'অ' শব্দটি আইন প্রণেতার সমার্থক শব্দ হিসেবে ধরা হয়।

পারিভাষিক অর্থ-এক সুদৃঢ় মজবুত পথ, যার মাধ্যমে তার অনুসারীরা হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পথ লাভ করে। ইসলামী আইন বিশারদগণের মতে, শরী'আহ বলতে বুঝায় ইসলামের আইন কানূন।[৩] তাছাড়া শরী'আহ বলতে বুঝায়, সে সব আদেশ নিষেধ ও পথনির্দেশ, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর আরোপ করেছেন যেন তারা তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহন করে তদানুযায়ী আমল করে এবং অনুরূপ জীবন যাপন করে। এই আদেশ নিষেধ ও নির্দেশ হতে পারে আক্বীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত, ইবাদত সংক্রান্ত, চরিত্র ও নৈতিকতা সংক্রান্ত এবং সামাজিক,রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত। বিচার ব্যবস্থাও এর অন্তর্ভূক্ত।[৪] ইসলামী শরী'আহ এর সংজ্ঞায় ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যে সব আক্বীদা ও আমল মানুষের জন্য প্রণয়ন করেছেন তাই শরী'আহ।[৫] অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'শরী'আ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উলুল আমর (তথা মুসলিম প্রশাসক ও আমীর) এর আনুগত্য করা।'[৬]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরী'আ এর সংজ্ঞা আরো সহজভাবে আমরা এভাবে দিতে পারি, 'মহান আল্লাহ তা'আলা জীবন ও জগত পরিচালনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নিজের বান্দাদেরকে যে সার্বিক হুকুম ও বিধান প্রদান করেছেন, তাই ইসলামী শরী'আহ।

এ আদেশ নিষেধ, নির্দেশ ও বিধানাবলী অত্যন্ত দৃঢ় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। হৃদয়-মন, জীবন ও বিবেক বুদ্ধির পরিচর্যা ও চরিতার্থতার এই হচ্ছে একমাত্র পথ। ইসলামী শরী'আহ ঐ সমস্ত ব্যবহৃত বিধানাবলীর সমষ্টিকে বুঝায় যা কুর'আন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস এর মাধ্যমে সংগঠিত হয়।[৭] পবিত্র কুর'আনে শরী'আহ শব্দটির উল্লেখ স্পষ্টতই প্রতীয়মান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

'আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি।'[৮] আবার শরী'আতের বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা যায় শরী'আহ্ হল কুর'আন এবং সুন্নাহ ভিত্তিক এমন একটি জীবন ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা যার মাধ্যমে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক জগতের পথ পাওয়া যায়।

শরী'আহ মূলত কুর'আন সুন্নাহ ভিত্তিক এমন একটি জীবন ব্যবস্থার নির্দেশিত অনুশাসন যা মানুষের পালনীয় কর্তব্যসমূহকে বুঝায়। কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াসের সমন্বয়ে শরী'আহ গঠিত হয়েছে। এটা মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ফিকহ্বিদদের দৃষ্টিতে শরী'আত বলতে বুঝায় সে সব আদেশ নিষেধ ও পথ নির্দেশ, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি জারী করেছেন। আর জারী করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে লোকেরা তার প্রতি ঈমান গ্রহন করে তদনুযায়ী আমল করবে এবং তদনুরূপ জীবন যাপন করবে। এই আদেশ নিষেধ ও নির্দেশ হতে পারে কর্ম পর্যায়ের অথবা আক্বীদা-বিশ্বাস পর্যায়ের অথবা চরিত্র ও নৈতিকতা পর্যায়ের। এ আদেশ-নিষেধ-নির্দেশ সমন্বিত বিধান অত্যন্ত দৃঢ় ও সুষ্ঠু ভিত্তিক।[৯]

ইসলামী শরী'আহ আইনের পরিচয় :

মানব জাতির হিদায়াত ও মুক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা শরী'আতের মৌলনীতি অবতীর্ণ করেছেন। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্ব মানবতাকে যথেচ্ছাচার, ভুল-ভ্রান্তি, কামনা-বাসনা ও লালসার হাতছানি থেকে মুক্ত করে সত্য, সুন্দর, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে আসা যেন পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সঠিক ও সুষ্ঠু নিয়মে কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে। কেননা, শরী'আতের বিধান অত্যন্ত সুদৃঢ়, সহজ ও সরল। এতে কোন বক্রতা নেই, নেই কোন হঠকারীতা, যা অবলম্বন করে চললে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হওয়া কোনটিরই আশংকা থাকে না। সুদৃঢ়, সুশৃঙ্খল, সঠিক ও সুষ্ঠু জীবন যাপন করার এটাই অনুসরণীয় পথ।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা শরী'আতসহ সব নবী রাসূল দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

ثم جعلناك عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ

'এরপর আমি আপনাকে রেখেছি দ্বীনের এক বিশেষ শরী'আতের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।' [১০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন। যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।' [১১]

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা বা শরী'আত আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর ঘোষণা,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه

'তাদের কি এমন দেবতা আছে যারা তাদের জন্য সে ধর্মসিদ্ধ করেছে। অথচ যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।' [১২] ইসলামী শরী'আত যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা,

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا.

'আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়াদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ (শরী'আহ) এসেছে তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি আপনাদের প্রত্যেককে একটি শরী'আহ (আইন) ও পথ দিয়েছি।'[১৩] পৃথিবীর সব বিধান থেকে ইসলামী শরী'আতের উত্তমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

إخراج من دوي الهوى والشهوات إلى دائرة الإنصاف والحق حتى تتحقق خلافة الله في الأرض على وجه الصحيح.

Dhaka University Institutional Repository

'বিশ্ব মানবতাকে যথেচ্ছাচার ভুল-ভ্রান্তি ও কামনা-বাসনার হাতছানি থেকে মুক্ত করে সত্য, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে আশা যেন পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সুষ্ঠুভাবে কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে।' [১৪]

প্রকাশ্য বিচার্য হিসেবে শরী'আহ আল্লাহর সাথে মানুষের ও মানুষের সাথে মানুষের বাহ্যিক সম্পর্ককে প্রধানত শরী'আহ্ আল্লাহর সাথে মানুষের অধিকার এবং মানুষের সাথে মানুষের অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়, যা লংঘন করা অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত শরী'আহ বিশ্বমানবতার প্রতি সর্বোৎকৃষ্ট নি'আমত ও রহমত। এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বকালের গ্রহণীয় ও বরণীয় মুসলিম দার্শনিক হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ আল-গাজ্জালীর (১০৫৮-১১১১) ভাষ্য হল সৃষ্টির ব্যাপারে শরী'আহ আইনের চূড়ান্ত লক্ষ্য পাঁচটি। (১) তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা; (২) তাদের ধর্ম সুরক্ষিত করা (৩) তাদের সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান করা (৪) তাদের সম্পদ হিফাযত করা (৫) তাদের বংশ সংরক্ষণ করা। [১৫] আর এগুলোর অনুপস্থিতি হবে বিশৃংখলা এবং প্রতিরক্ষা হচ্ছে মুছলেহাত তথা কল্যাণকামিতা।

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করে তাদের উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে তাদেরকে নিজস্ব বিবেক বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল করে ছেড়ে দেননি। তাতে তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট শরী'আতের বিধান দিয়ে তাদের উপর রহমত করেছেন এবং অনেকটা দায়িত্বভার মুক্ত করেছেন। তাইতো আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ

'আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন।' [১৬] আল্লাহর আনুগত্যের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে একজন মানুষকে সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করতে হয়। আর ঈমান গ্রহণের প্রথম সোপান হচ্ছে কালেমার মাধ্যমে মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করা বা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" এই কালেমার ওপরই ইসলামী জীবন দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত। এর দু'টি অংশ রয়েছে। দু'টি অংশকে একত্রে কালেমা তাইয়্যেবা বলে। প্রথম অংশ অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোন বিধানদাতা নেই, তিনি ব্যতীত সৃষ্টির নিরংকুশ আনুগত্য ও ইবাদাত পাওয়ার অধিকার বা উপযুক্ততা কারো নেই এবং তা থাকা সম্ভবও নয়। আর দ্বিতীয় অংশ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থ

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং ইসলামী শরী'আতের তিনিই একমাত্র ব্যাখ্যাদাতা। আর হযরত মুহাম্মদ (স.) কে পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

'তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'[১৭]

ইসলামী শরী'আহ এর গুরুত্ব :

শরী'আহ ও সমাজের মধ্যে একটি নিবীর বন্ধন রয়েছে। বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে সমাজ গড়ে উঠে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সমাজের প্রত্যেকের রয়েছে নানাবিধ চাহিদা। ব্যক্তি একাই নিজের সেসব চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। সে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে সমাজের অন্যদের সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। ফলে স্বভাবতই মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে সমাজবদ্ধ। সমাজের সকলের অধিকারকে সুশৃংখলভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজন একটি পরিপূর্ণ আইনী ব্যবস্থা বা বিধানের, যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করবে, অধিকারের সীমা নির্দিষ্ট করে দিবে এবং প্রত্যেকের স্বেচ্ছাচারিতাকে আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করবে। এ ব্যবস্থা না হলে মানুষের সামষ্টিক জীবন হয়ে পড়বে খুবই দুরূহ। কেননা মানুষের একটা প্রবণতা হচ্ছে নিজের সুবিধা ও স্বার্থকে বড়ো করে দেখা। এ প্রবণতা যদি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা না হয়, তাহলে পারস্পরিক যুলুম-নির্যাতন বেড়ে যাবে, অধিকার ক্ষুন্ন হবে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। আর প্রতাপশালী ও কূটজাল বিস্তারকারীদের দৌরাত্ম প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং মানুষ সব সময়ই সুশৃঙ্খল আইন-কানূন সম্বলিত এমন এক ব্যবস্থা মেনে চলার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে, যাতে সমাজের সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়, কেউ কারো অধিকার হরণ করতে না পারে এবং কেউই তার নিজের সীমা লংঘন করে অন্যের সীমায় অনুপ্রবেশ করতে না পারে। বস্তুত একটা সুষম, কল্যাণমুখী ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের পক্ষে সুস্থ্য স্বাভাবিক সমাজ জীবন যাপন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। এ জন্যই আল্লাহ নাযিলকৃত শরী'আহ তাঁর অগণিত অন্য সব নি'আমতের পাশাপাশি বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিরাট রহমত। এর ভিত্তিতেই হতে পারে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সার্থক সমাধান ও তাদের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের সুষ্ঠু মীমাংসা ও নিষ্পত্তি। বস্তুত আল্লাহর শরী'আতই হচ্ছে তাঁর বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার যথার্থ হাতিয়ার। নিঃসন্দেহে সমগ্র মানবতার প্রতি এটা তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নিজ নিজ জীবন,

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠন ও সমাজের উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব বিবেক বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী করে ছেড়ে দেননি, বরং তাদেরকে প্রবৃত্তির মোহ থেকে মুক্ত করেছেন ইসলামী শরী'আহ এর বিধান প্রদান করে। মানব রচিত কোন বিধানই প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত ও পবিত্র নয়। তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আহ বা বিধি-বিধান। [১৮]

ইসলামী শরী'আহ আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যে পার্থক্যঃ

ইসলামী শরী'আহর মতই মানব সামাজে প্রচলিত আইনসমূহ যদিও জনকল্যাণের অঙ্গীকার করে এবং সমাজের আইন, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করার আশাবাদ ব্যক্ত করে, কিন্তু এর সাথে ইসলামী শরী'আহ এর রয়েছে অনেক পার্থক্য, যাতে ইসলামী শরী'আহ এর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হল -

১. ইসলামী শরী'আহ সব ধরনের ত্রুটিমুক্ত। কেননা শরী'আহ প্রণয়ন করেছেন মহান আল্লাহ আসমান ও যমীনের অনু পরিমাণ কোন বস্তুও যাঁর অগোচরে ও অজ্ঞাতে নয়, যিনি মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। ফলে স্বভাবতই তিনি তাদের সার্বিক কল্যাণের উপযোগী বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। সাইয়েদ কুতুব (র.) তাঁর 'মা'আলিম ফিত-তারীখ' গ্রন্থে বলেন, ''আল্লাহ মানব জীবনকে সুসংবদ্ধ করার জন্য যে শরীআহ প্রদান করেছেন তা এমনই এক বিধান যা জগতের সাধারণ নিয়মের সাথে সম্পর্কিত ও সামাঞ্জস্যপূর্ণ। ..... সুতরাং মানব জীবন ও যে জগতে সে বসবাস করে তার মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনেই এ শরী'আহ মেনে চলার আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, যে আইন মানুষের ভিতরের স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যে আইন মানুষের বাহ্যিক জীবনকে পরিচালনা করে এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে এবং মানব ব্যক্তিত্বের ভেতর ও বাহির উভয় দিকের মধ্যে একটা সঙ্গতি বিধানের প্রয়োজনেও শরী'আহ মেনে চলা প্রয়োজন। মানুষ যখন জগতের সকল নিয়মনীতি জানার সামর্থ্য রাখে না এবং সাধারণ জাগতিক নিয়মের সকল দিক আয়ত্বও করতে পারে না, এমন কি যে সত্তা তাদের স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেন ও তাদেরকে নিজের অধীনস্ত করে রাখেন, তারা চাক বা না চাক - সে সত্তাকেও তারা আয়ত্ব করার সামর্থ্য রাখে না। তাহলে মানব জীবনের জন্য এমন বিধান রচনার অধিকার তাদের নেই, যদ্বারা মানুষের জীবন ও জগতের সঞ্চালনে এবং তাদের সুপ্ত স্বভাব ও বাহ্যিক জীবনে একটা ব্যাপক সামঞ্জস্য সাধিত হতে পারে। ..... এ কাজের অধিকার রাখেন জগতের স্রষ্টা, মানুষের স্রষ্টা, যিনি নিজের ইচ্ছামত একটি নিয়মের অধীনে জগত ও মানবকে পরিচালিত করেন...।' [১৯]

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ম-কানূন ও আইন প্রণয়নে মানুষের মধ্যে বিস্ময়কর স্ববিরোধিতার উপস্থিতি সাইয়েদ কুতুবের উপরোক্ত বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা পুঁজিবাদে মানুষ অসীম সম্পত্তির মালিক হতে পারে। পক্ষান্তরে কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্র এর পুরোপুরি বিপরীত। সেখানে ব্যক্তি সম্পদের মালিক হতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত সত্য কথা হল, মানুষ যত বড় বুদ্ধিমানই হোক, সে আসলে অক্ষম এবং তার জ্ঞান যতই বিস্তৃত হোক,তা সীমিত। অতএব মানুষের পক্ষে এমন বিধান রচনা অসম্ভব যা পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য, সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর ও উপযোগী এবং সকল জাতির সুখ-শান্তির নিশ্চয়তাদায়ক।

২) ইসলামী শরী'আহ চারিত্রিক নৈতিকতার উপর গুরুত্বআরোপ করে : ইসলামী শরী'আহ এর দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনা, ব্যক্তি ও সমষ্টিক সার্বিক কল্যাণ এবং জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হিফাযতের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আখলাক। এজন্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। [২০] তাই ইসলামী শরী'আহ এর যাবতীয় হুকুম-আহকাম চারিত্রিক মূলনীতি ও নৈতিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যারা তাদের আচার-ব্যবহারে, কাজ কর্মে ও জীবনের পথ পরিক্রমায় চারিত্রিক সততার দাবি অনুযায়ী চলে, ইসলামী শরী'আহ তাদের সাওয়াব ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করে। আর যারা এর বিপরীত পথে চলে ইসলামী শরী'আহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য ব্যবস্থা করেছে যথার্থ শাস্তির। অন্যদিকে মানব রচিত আইনে এদিকের প্রতি কোন গুরুত্বই নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চারিত্রিক অধ:পতন হিসেবে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও মানব রচিত আইনে যিনা-ব্যভিচারের শাস্তি মাত্র দু'টি অবস্থাতেই দেয়া হয়।

ক. যখন জবরদস্তিমূলক ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়।

খ. যখন এক পক্ষের সম্মতি ও অপর পক্ষের অসম্মতি থাকে।

এছাড়া অন্য সকল অবস্থায় ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করা হয় না। অথচ ইসলামী শরী'আতে সকল অবস্থাতেই একাজ পুরোপুরি নিষিদ্ধ ও আইনত দণ্ডনীয়।

৩. ইসলামী শরী'আহ এর দৃষ্টিতে আল্লাহ ও তাঁর দেয়া বিধানের প্রতি সঠিক আকীদা পোষণ হচ্ছে সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় উপাদান এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ সাধনের মৌল ভিত্তি। কেননা তাকওয়াই শুধু সমাজের সকল মানুষকে সততা ও সত্যের পথে পরিচালিত করতে পারে এবং অন্যায়-অবিচার ও জুলুম থেকে রক্ষা করতে পারে।৪ পক্ষান্তরে মানব রচিত কোন আইন

Dhaka University Institutional Repository

তার স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য হতে ব্যক্তিকে বাধ্য করে না, কোন ব্যক্তি বিশেষকে সৎ ও সাধু হতে বাধ্য করে না। [২১]

ইসলামী শরী'আহ আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষসহ এ বিশ্ব জগতের সকল কিছুই সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে সুস্থ, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য তিনি একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মানুষকে প্রদান করেছেন ইসলামী শরী'আহ। আর ইসলামী শরী'আহ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে আরবীতে বলা হয় 'মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ। শরী'আহ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এর আরবী পরিভাষাটির কিছুটা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। 'মাকাসিদ আশ্ শরীআহ' শিরোনামটিতে দু'টি শব্দ রয়েছে। একটি হচ্ছে মাকাসিদ, যা মাকসাদ শব্দের বহুবচন। আরবীতে মাকসাদ শব্দটির একাধিক অভিধানিক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধানতম অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য। [২২]

বাংলায় বলা হয় 'মনযিল মাকসুদ' অর্থাৎ গন্তব্যস্থল, যার উদ্দেশ্যে মানুষ যাত্রা করে থাকে। এদিক থেকে মাকসাদ ও মাকসূদ শব্দদ্বয়ের অর্থ প্রায় একই। আরেকটি শব্দ হচ্ছে শরী'আহ। ইতোপূর্বে 'শরী'আহ' এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। 'মাকাসিদ আশ্-শীআহ' ইসলামী আইন বিষয়ক জ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ শাখা, যা স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি শাস্ত্র হিসাবে আজ মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পঠিত হচ্ছে। সে জন্য 'ইসলামী শরী'আহ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য' কথাটির বদলে আমরা 'মাকাসিদ আশ-শরীআহ' কথাটিই বেশী ব্যবহার করব।

'মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

পূর্ববর্তী মুসলিম পন্ডিতগণ 'মাকাসিদ আশ-শরী'আহ এর কোন সুক্ষ পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেন নি, যদিও বিষয়টি তাদের অনেকেরই জানা ছিল। তাঁরা 'মাকাসিদ আশ-শরী'আহ' এর নানা বিষয়, যেমন- হিকমাহ বা প্রজ্ঞা, ইল্লাত বা কারণ, মাসলিহ বা কল্যাণ এবং মাফাসিদ বা অকল্যাণ প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। শরী'আহ এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা 'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ্' এর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। [২৩] পরবর্তী সময়ে মুসলিম পণ্ডিতগণ ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখার সংজ্ঞা প্রদানে ব্রতী হন। তারই অংশ হিসেবে 'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ' এর একাধিক সংজ্ঞা তারা দিয়েছেন। নিচে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল :

Dhaka University Institutional Repository

১. প্রফেসর ড. আহমাদ রাইসূনী বলেন, 'সকল বান্দার উপকারার্থে যে সব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শরী'আহ প্রণয়ন করা হয়েছে তাই হল মাকাসিদ আশ-শরী'আহ। [২৪]

২. ড. মুহাম্মদ সা'দ আল-ইয়ূবী মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ এর সংজ্ঞায় বলেন, 'মাকাসিদ হচ্ছে সেই সকল উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও হিকমাত, শরী'আহ্ প্রণয়নের সময় সকল বান্দার কল্যাণ সাধনের জন্য সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে যেগুলোর প্রতি আল্লাহ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। [২৫]

৩. এই সংজ্ঞাগুলোর আলোকে সংক্ষেপে বলা যায়, 'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ' হচ্ছে সেই সকল কল্যাণমূখী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সমষ্টি, যা শরী'আতের হুকুম মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের দ্বারা অর্জিত হওয়ার ইচ্ছা করে থাকেন।

মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ এর উদাহরণ :

ইসলামী শরী'আহ-এর বিভিন্ন আহকাম ও বিষয় সমূহে ইসলামী শরী'আহ এর সকল দৃষ্টান্তসমূহ এবং উদ্দেশ্যাবলী বর্ণিত রয়েছে। যেমন- ইবাদত, মুয়ামালাত, বিবাহ-শাদী, অপরাধ আইন ও কাফ্ফারা ইত্যাদি। বিভিন্ন রকমের কল্যাণকে সামনে রেখে ইসলামী শরী'আহ-এর প্রতিটি হুকুম বর্ণিত হয়েছে, যার অনেকগুলো পবিত্র কুরআনুল কারীমে সরাসরি বিধৃত হয়েছে। আবার বেশ কিছু উল্লেখ করা হয়েছে রসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ এবং মুজতাহিদগণের ব্যাখ্যায় যা কুরআন ও হাদীসের মূলনীতির আলোকে উদ্ভাবিত। সে সবের কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হল-

- উযূ ও গোসলের বিধান দেয়া হয়েছে সালাত ও তাওয়াফ সম্পাদনের জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য, যাতে একটি পরিচ্ছন্ন সভ্য মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত-এর বিধান দেয়া হয়েছে সমাজস্থ সকলের মাঝে সম্পর্ক দূর করা এবং সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা মহান উদ্দেশ্য। নিয়ম মাফিক সালাত আদায়ের মাধ্যমে অলসতা ঝেড়ে সময়ানুবর্তি, শৃংখলার অনুসারী, পার্থিব সকল কষ্ট, জীবনের নানাবিধ সমস্যা এবং সর্বোপরি শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তি অর্জনের শিক্ষা দেয়া হয়।
- জামায়াতবদ্ধ সালাত ও জুমআহ এর সালাতের বিধান এসেছে মহান আল্লাহর স্মরণকে জাগরণ করার জন্য। মুসলমানদেরকে সত্য, সততা ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করা, ঈমান আকীদাকে নবায়ন করা, সহীহ জ্ঞানার্জন করা এবং ইবাদতকে বিশুদ্ধ পন্থায় আদায় করার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

- শূকর, মৃতদেহ ও রক্তের ন্যায় অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ মুসলামানদের উপর হারাম করার পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর আনুগত্য ও আদেশ পালন এবং শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বিপর্যয় ও ক্ষতি পরিহার। সম্প্রতি বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, এ সকল হারাম ও নিকৃষ্ট বস্তু মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
- সমাজে সবার মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ এ জন্যই দেয়া হয়েছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অধিকার ভোগ করতে পারে এবং সমাজের ফিতনা-ফাসাদ ও বিবাদ বিসম্বাদ দূরীভূত হয়। আর মানুষ যেন আইন- শৃংখলার পথে অধিকার অর্জনে অগ্রসর হয়।
- বিবাহ শাদী, নানাবিদ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য অনেক মু'আমালাত ইসলামী শরী'আতে বৈধ করা হয়েছে মানুষের জীবন ধারণকে সহজতর করার এবং মানুষের জরুরী ও প্রয়োজনীয় লেনদেনকে সহজ করে মানুষের জীবন-যাত্রাকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করার জন্য। এভাবে ইসলামী শরী'আহ এর সকল বিধানেই নিহিত রয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কারণ। [২৬]

ইসলামী শরীআহ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এর দলীল প্রমাণ :

পবিত্র কুরআনে ইসলামী শরী'আহ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও পন্থায় পেশ করা হয়েছে। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো :

১. কুর'আনের বহু স্থানে আল্লাহ তাঁর কাজ উদ্দেশ্যেসহ বর্ণনা করেছেন। যেমন- তিনি বলেন-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

'এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানব মণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্যে।' [২৭]

তিনি আরো বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.

'নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।' [২৮]

আল-কুর'আনের বহু জায়গায় মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাকীম, প্রজ্ঞাবান। মহান আল্লাহ বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

'এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।' [২৯]

তিনি অন্যত্র বলেন,

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

'কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।' [৩০]

এ কথার অনিবার্য দাবি হল, তাঁর প্রণীত প্রতিটি বিধানের অবশ্যই একটি হিকমত ও উদ্দেশ্য রয়েছে এবং কোন কিছুই তিনি অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রচলন করেন নি।

কুর'আনের অনেক স্থানে শরী'আহ এর ব্যাপক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। কোথাও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে। যেমন- দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে কঠোরতা বিলোপ ও অসুবিধা দূরীকরণ উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। আল-কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে জিহাদ, সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতি ইবাদত সমূহের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- সালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

'এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।' [৩১]

সিয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার।' [৩২]

শরী'আহ এর লক্ষ্য সমূহ চেনার উপায় ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শরী'আহ এর প্রতিটি হুকুমে নিহিত রয়েছে একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটি শরী'আহ এর উদ্দেশ্য? প্রকৃতপক্ষে কোন একটি বিষয়কে শরী'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য বলে দাবী করা কিংবা উদ্দেশ্য নয় বলে ঘোষণা করা অত্যন্ত কঠিন। এর জন্য প্রয়োজন ধীরস্থিরভাবে গভীর চিন্তাভাবনা, বিশুদ্ধ নিয়ম প্রণালীর অনুসরণ এবং সেসব সুস্পষ্ট উপায় ও পন্থাসমূহ সুনির্দিষ্ট করা যদ্ধারা সেগুলোকে সহজেই চেনা যাবে। এ ধরণের উপায় পাঁচটি। [৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

১. গবেষণা ভিত্তিক অনুসন্ধান :

শরী'আহ এর সকল দলীল ও হুকুম আহকাম অনুসন্ধান করে জানা যায়, মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ (আদ-দারুরিয়্যাত) সর্বমোট পাঁচটি। দ্বীন, প্রাণ বা জীবন, বিবেক-বুদ্ধি, সম্পদ ও বংশধারা। অতএব সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ পাঁচটি বিষয়ের হিফাযত ও সংরক্ষণ শরী'আহ্ প্রণেতার অন্যতম উদ্দেশ্য।

২.শরী'আতের নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সমূহের কারণ অনুসন্ধান :

ইসলমী শরী'আতে যে সকল নির্দেশ কিংবা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা শরী'আহ এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন,

مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُم

'আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর রাসূলের, তাঁর আত্মীয় স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্থদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মাধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।' [৩৪]

৩.সুস্পষ্ট নির্দেশ কিংবা নিষেধাজ্ঞা :

এ থেকে বুঝা যায় যে, নির্দেশটি কার্যে পরিণত করা এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকাই শরী'আহ্ প্রণেতার উদ্দেশ্য। অতএব কেউ যদি শরী'আহ এর নির্দেশ বাস্তবায়ণ না করে কিংবা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে সে শরী'আহ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিরোধীতা করল।

৪. যে বক্তব্য থেকে সরাসরি উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়:

এ ধরণের বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে যেখানে শরী'আহ প্রণেতা স্বয়ং তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন, আল্লাহর বাণী,

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।' [৩৫]

৫.নির্দেশ দান বা নিষেধ করার বাস্তব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শরী'আহ্ প্রণেতার নিরবতা অবলম্বন। যদি প্রয়োজনীয় কার্যকারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শরীআহ এর নির্দেশ না আসে, তাহলে বুঝতে হবে

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত কাজ শরী'আহ এর অনুমোদন নেই। আবার নিষেধ করার যথার্থ কারণ ও উপলক্ষ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি শরী'আহ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে কাজটি শরী'আহ এর দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়। [৩৬]

শরী'আহ এর উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগ :

আমরা জানি, ইসলামী শরী'আহ এর প্রতিটি বিধানেরই রয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য। শরী'আহ এর সকল উদ্দেশ্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যার প্রতিটির রয়েছে আলাদা আলাদা উপবিভাগ। [৩৭]

প্রথম প্রকরণ : মৌলিকত্বের দিক থেকে শরী'আহ এর উদ্দেশ্য দু'প্রকার :

১. **মৌলিক উদ্দেশ্য :** এর দ্বারা শরী'আহ এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ শরী'আত প্রণেতা কোন নির্দেশ দ্বারা প্রথম যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন তা বুঝানো হয়েছে। যেম- সালাত আদায়ের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, স্মরণ এবং অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে মুক্তি।

২. **গৌণ বা আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য :** যে সব উদ্দেশ্য মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে অর্জিত হয় বা তার সহায়করূপে উদ্ভূত হয় সেগুলো হচ্ছে গৌণ বা আনুষাঙ্গিক উদ্দেশ্য। যেমন- সালাত আদায়ের মাধ্যমে শারীরিক মানসিক প্রশান্তি লাভ, উযুর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা অর্জন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার : পরিসরগত দিক থেকে শরী'আহ এর উদ্দেশ্য তিন প্রকার :

১. **ব্যাপক উদ্দেশ্য :** ইসলামী শরী'আহ এর সকল ক্ষেত্রে ও সকল অধ্যায়ে যে সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, সেগুলো ব্যাপক উদ্দেশ্য। যেমন- ক. কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি প্রতিহতকরণ। খ. সহজীকরণ ও কঠোরতা বিলোপ ইত্যাদি।

২. **নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য :** শরী'আহ এর নির্দিষ্ট অধ্যায় ও বিষয়ভিত্তিক যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। যেমন- সালাত, সাওম ও হজ্জের উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

৩. **ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য:** শরী'আহ এর যে সকল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কোন একটি নিদিষ্ট মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাকে বলা হয় ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য। যেমন- উযুর সময় নাকে পানি দেয়ার উদ্দেশ্য কিংবা সালাতে রুকু আদায়ের উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় প্রকার

শরী'আতের দর্শন অবহিত মনীষীগণ বলেছেন, বিশ্বালোকে শরী'আতের লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ সাধনের দিক থেকে তিন প্রকারের। এগুলো হচ্ছে,

মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ (আদ-দারুরিয়্যাত)।

মানব জীবনের প্রয়োজন সমূহ (আল-হাজিয়্যাত)।

মানব জীবনের শোভাবর্ধনকারী বিষয়সমুহ (আত-তাহসীনিয়্যাত)।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যই শরী'আহ এর সকল বিধান প্রণয়ন করেছেন। মানব জীবনের সর্বাধিক জরুরী বিষয় সমূহের সংরক্ষণ ও হিফাযত সে বিধানেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামী শরী'আহ এর পারিভাষায় এ বিষয়সমূহের নাম দেয়া হয়েছে 'আদ দারুরিয়্যাত' বা সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয়। এই সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর নিরাপত্তা ছাড়া পৃথিবীতে মানব জীবন কোনভাবেই চলতে পারে না। তাই এই সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর গুরুত্বের বিবেচনা করে ইসলামী শরী'আহ আইনে মানবজীবন নামে একটি ভিন্ন অধ্যায়। নিম্নে এর ব্যাখ্যা তুলে ধরা হল:

১. আদ-দারুরিয়্যাত বা 'জরুরী'। দ্বীন ইসলামের ও বৈষয়িক জগতের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে এটি একান্ত অপরিহার্য। কেননা 'জরুরী জিনিস' রক্ষা করা না হলে দুনিয়ার কল্যাণ সাধিত হতে পারে না বরং তখন সামগ্রিক বিপর্যয় সূচিত হওয়া অবধারিত হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, শরী'আত প্রণয়নে জরুরী প্রয়োজনের সমষ্টি মোট পাঁচটি- দ্বীনের হিদায়ত, জান-প্রাণ রক্ষা, ধন-সম্পদ রক্ষা, বংশ রক্ষা এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সুস্থ্য রাখা।

২. আল-হাজিয়্যাত বা প্রয়োজনে কমতি ও বাড়তি। আবশ্যকীয় ক্ষতির আশংকা দূরীকরণ ও বিশালতা লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ এর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। যেমন কোন কোন ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কারণের তাগিদে মাত্রা বা পরিমাণ হ্রাসকরণ, তীব্রতা-কঠোরতা হাল্কাকরণ।

৩.আত-তাহসীনিয়্যাত বা সৌন্দর্য বিধান সংক্রান্ত। উন্নত ও উত্তম চরিত্র গঠনে এটি প্রয়োজন। সুন্দর, নিখুঁত ও কল্যাণময় জীবন যাপন এর উপরই নির্ভরশীল। যেমন, পবিত্রতা অর্জন, লজ্জাস্থান আবৃত রাখা, অলংকার ও শোভা বর্ধন, অত্যধিক খরচ বর্জন এবং কৃচ্ছসাধন ও ব্যয় সংকোচন। ইসলামী শরী'আতের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। আর এর প্রত্যেকটিরই যৌক্তিকতা অনুধাবনীয়। [৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরী'আহ আইনের উৎসঃ

ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস বা 'দলীল' [৩৯] দু'টি। আল-কুরআন ও সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস। এগুলো 'মুত্তাফাকুন আলাইহি'। এগুলো শরী'আতের দলীল বা উৎস হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। আর এক ধরনের দলীল রয়েছে যাকে 'মুখতালাফ ফীহ' বলা হয়। অর্থাৎ যা শরী'আহ এর উৎস হওয়ার ব্যাপারে উসূলবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

'মুখতালাফ ফীহ' উৎস গুলো হল : ক. আল ইস্তিহসান মুজতাহিদ কর্তৃক উত্তম গণ্য করা, খ. আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ, গ আল-ইস্তিসহাব, ঘ. আল-উরফ(দেশপ্রথা), ঙ. মাযহাবুস সাহাবী (সাহাবীদের অভিমত) চ. পূর্ববর্তী নবীগণের শরী'আত ।[৪০]

কুরআন-সুন্নাহর বিধানই মূল শরী'আত। কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত বিধানই বা শরী'আহ কার্যকর করা এবং অনুসরণ করা মুমিনদের জন্য বাধ্যতামূলক। ইজমা ও কিয়াস থেকে প্রাপ্ত বিধানসমূহ অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির অধীন হতে হবে, সাংঘর্ষিক হলে পরিতাজ্য। ইজমা ও কিয়াস যে মত কুর'আন এবং সুন্নাহর অধিক নিকটতর এবং অধিক যুক্তিসঙ্গত, সেটিই গ্রহণযোগ্য।

ইসলামী শরী'আহ সাম্প্রতিক উদ্ভূত কোন বিষয় নয়। ইসলামী শরী'আতের উৎপত্তিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটা সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়েছে। সে কালের মেয়াদ কম-বেশী দেড় হাজার বছর। প্রথম পর্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর সাহাবায়ে কিয়ামের জীবনকাল ব্যাপী। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে বিভিন্ন মাযহাবের উৎপত্তি ও বিধি-বিধান প্রণয়ন কাল। আর তৃতীয় হচ্ছে নিঃশর্ত অনুসরণ বা 'তাকলীদ' এবং বর্তমান নব্য ইজতিহাদকাল। [৪১] আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স.) কে তাঁর রাসুল বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা রূপে মনোনীত করার পর থেকেই ইসলামী ফিকাহর প্রথম পর্যায়ের সূচনা। আর এ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে রাসুল করীম (স.) এর ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের প্রায় দশ বছর পর। রাসুলের মক্কী জীবনে ইসলামী সমাজ পুরামাত্রায় গড়ে উঠেনি এবং ইসলামী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ সময়টা ইসলামী দাওয়াত আক্বীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ করণ এবং লোকদের চরিত্র ও নৈতিকতা ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা-প্রচেষ্টায় অতিবাহিত হয়। এক কথায়, এই সময়টা জনগণের হৃদয়-মন ও মানসিকতাকে ইসলামী শরী'আহ গ্রহণ ও বাস্তবে অনুসরনের জন্য প্রস্তুতকরণ পর্ব। হিজরাত পরবর্তীকাল এর দ্বিতীয় পর্যায়। মোট দশটি বছর এ ভাগের মেয়াদ। ইসলামী সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্টা এই সময়ই সূচিত হয়। তাই এই সময় শরী'আহ ভিত্তিক নিয়ম-নীতি ও আইন-

Dhaka University Institutional Repository

কানূনের প্রয়োজন দেখা দেয় তীব্রভাবে। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে যখন কোন নির্দেশনার প্রয়োজন হত, তখন কুর'আন মজীদের আয়াত নাযিল হত। [৪২] রাসুল(স.)এর যুগে ইসলামী শরী'আতের একমাত্র উৎস ছিল আল্লাহর অহী, যা তিনি হয়রত জিব্রাইল (আ.) এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর নাযিল করেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তা ঠিক যেভাবে আল্লাহর নিকট থেকে হযরত জিব্রাইলের মাধ্যমে পেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে কথা, শব্দ ও ভাষা দুনিয়ার মানুষের নিকট পেশ করেছেন। আর এরূপ করার জন্যেই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছিলেন।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

'হে রাসুল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না।' [৪৩]

রাসুলের প্রতি যে কুর'আন নাযিল হয়েছে তাতে রয়েছে সাধারণ মূলনীতি ও মোটামুটি ধরণের নিয়ম-কানূন। আর তা এমন প্রকৃতির যে, রাসূলই তার বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করবেন এবং কোন আয়াত থেকে কি আদেশ বা নিষেধ জানা যায়, তা বিশদভাবে বলে দেবেন। এ দায়িত্ব তাঁরই উপর অর্পিত হয়েছে। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

'আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐ সব বিষয় বিবৃতি করেন, যে গুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।' [৪৪] রাসূল করীম (স.) কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার যে দায়িত্বটি পালন করবেন, তা একান্তভাবে আল্লাহর তরফ থেকেই তাঁর উপর অর্পিত । এ সময়টি ছিল শরী'আহ জানার আসমানী ব্যবস্থা। তাই ইলমে ফিক্হায় এ যুগটিকে বলা হয় - عصر التشريع السماوي

সাহাবী রাসুলে করীম (স.) থেকে দূরে অবস্থান করতেন প্রয়োজন হলে রাসুলের নিকট জেনে নেয়ার সুযোগ যাঁদের ছিল না, তাঁরা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রাসুল (স.)এর অনুমতিক্রমে, প্রয়োজনের তাগিদে ইজতিহাদ করতে বাধ্য হয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) এর ব্যাপারটি উল্লেখ্য। তাঁকে রাসুলে করীম (স.) ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছিলেন। তাঁর যাওয়ার সময় রাসুলে করীম (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কিভাবে শাসনকার্য চালাবে? বললেন ঃ কুরআনের ভিত্তিতে। রাসুল (স.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

তাতে যদি কোন সিদ্ধান্ত না পাও ? বললেন, তাহলে সুন্নাহের ভিত্তিতে। জিজ্ঞেস করলেন, সুন্নাতেও যদি কোন কিছু না পাও, তাহলে কি করবে ? বললেন اجتهد بالرأي আমি কুর'আন ও সুন্নাহর প্রেক্ষিতে চিন্তা-বিবেচনার সাহায্যে আমার মত নির্ধারণে প্রাণপন চেষ্টা চালাব। তখন রাসুলে করীম (স.) শুধু এই ইজতিহাদের কথা সমর্থনই করেননি, তাঁর সঙ্গে আল্লাহর শোকরও করে ছিলেন। ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে কুর'আন ও হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বয়ং নবী করীম (স.) বিদায় হজ্জ্ব এর ভাষণে ঘোষণা করেছেন, تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي আমি, রেখে গেলাম তোমাদের মধ্যে দু'টো বিষয়, যতকাল তোমরা এ দু'টোকে আঁকড়ে থাকবে ততকাল তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।[৪৫] কুরআনের ঐসব স্পষ্ট আয়াত যাতে রাসুলুল্লাহ (স.) এর সকল আদেশ নিষেধের অনুসরণ করা ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে। সে সব নির্দেশনা সম্বলিত আয়াতগুলো সর্বজনীন শরী'আতের উৎস। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا .

'হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি প্রত্যার্পন কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিনতির দিক দিয়ে উত্তম।'[৪৬] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

'রাসুল তোমাদেরকে যা নির্দেশ করেন তা গ্রহন কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।' [৪৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

فلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

'অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম যে, লোকেরা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের

Dhaka University Institutional Repository

মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং কষ্ট চিত্তে কবুল করে নেবে না।' [৪৮] এমনিভাবে কুরআনে বলা হয়েছে,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

'আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি।' [৪৯]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন -

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।' [৫০]

১. কিতাবুল্লাহ (কুরআন)

পবিত্র এই গ্রন্থ আল-কুর'আন বিশ্বমানবতার সার্বিক কল্যাণ এবং উৎকর্ষ সাধনের সকল বিধানকে সংযুক্ত করে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্যের কথা স্বরণ করিয়ে দেয় এই পবিত্র আল-কুরআন।

আল-কুর'আনের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে আল্লামা যুরকানী বলেন,

المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته.

'যা নবী করীম (স.) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়ে মুতাওয়াতির [৫১] সনদ পরম্পরার মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে আসছে, যা তিলাওয়াত করা হয় এবং যে তিলাওয়াত আল্লাহ ইবাদত হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। তাকে 'কুরআন' বলে।' [৫২] এখানে উল্লেখ্য যে, কুর'আনের আলোচ্য সংজ্ঞার মধ্যে সর্বমোট তিনটি অংশ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমটি হল-

'নবী করীম (স.) এর প্রতি অবতীর্ণ।'

সুতরাং 'কুরআন' হতে হলে নবী করীম (স.) এর প্রতি অবতীর্ণ হতে হবে। অতএব যে বিষয় নবী করীম (স.) এর প্রতি অবতীর্ণ নয়, তা কুর'আনের অন্তর্ভূক্ত হবে না। যেমন মানব সাধারণের কথাবার্তা, নবী করীম (স.) এর হাদীস' [৫৩] এবং পূর্ববর্তী অবতীর্ণ গ্রন্থ তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবুর।

দ্বিতীয় অংশটি হল- 'মুতাওয়াতির বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে বর্ণিত'

সুতরাং মুতাওয়াতির সনদের মাধ্যমে বর্ণিত নয়, এমন কোন অংশ 'কুরআন' নামে অভিহিত হবে না। যেমন, আল্লাহর বাণী,

Dhaka University Institutional Repository

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

'তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় একাধারে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে।'[৫৪]

প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) উক্ত আয়াতস্থ متتابعات শব্দকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন।

কুর'আনের সংজ্ঞায় তৃতীয় অংশটি হল :

'যার তিলাওয়াত করা হয় এবং যে তিলাওয়াত করে তা আল্লাহর ইবাদত হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।'

সুতরাং যে বিষয় তিলাওয়াত করা হয় না তা কুর'আন হিসাবে পরিগণিত হবে না। অতএব হাসীসে কুদসী কুর'আনের অন্তর্ভূক্ত নয়।[৫৫]

আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) পবিত্র কুর'আনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواترا بلا شبهة.

'কুর'আন যা রাসুলে করীমের (স.) উপর অবতীর্ণ হয়ে সহীফা সমূহে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর তা নবী করীম (স.) হতে এমনভাবে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ নেই।'[৫৬] এখানে এটাও উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুর'আনের সকল আয়াত ইসলামী শরী'আতের বিষয় বস্তু সম্বলিত নয়। মাত্র পাঁচশত আয়াত শরী'আতের বিধান সম্বলিত আর বাকী কুরআন বিভিন্ন ঘটনা ও অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত।[৫৭]

২.সুন্নাহ

রাসূল (স.) এর সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। মোল্লাজিউন (র.) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'নূরুল আনোয়ার' এর মধ্যে সুন্নাহ্ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

االسنة تطلق على قول الرسول وفعله وسكوته وعلى أقوال الصحابة وأفعالهم.

'সুন্নাত হলো রাসুল (স.) এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি। সাহাবীদের কথা ও কাজকেও সুন্নাত বলা হয়'।[৫৮] সর্বপোরি নবী করীম (স.) আল্লাহর পয়গাম পৌছাবার উদ্দেশ্যে লোকদের সাথে যে কথা বলতেন, নিজের কথার সাহায্যে ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতেন, বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন তাকে হাদীস নামে অভিহিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম (স.) নিজে ইসলামের যাবতীয় হুকুম আহকাম পালন করেছেন আল্লাহর বিধান মোতাবেক কাজ করেছেন এবং নিজের আমলের সাহায্যে আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়িত করেছেন। এ কারণে তাঁর বিভিন্ন আমলের বিবরণকেও 'হাদীস' নামে অভিহিত করা হয়।

নবী করীম (স.) বিশেষ যত্ন ও চেষ্টার সাহায্যে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কে ইসলামের উন্নত আর্দশের ভিত্তিতে তৈরি করেছেন। তাঁদের চরিত্র, চিন্তা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের উন্নতমানে গঠন করেছেন। এ কারণে সাহাবায়ে কিরামের যেসব কথা ও কাজকে নবী করীম (স.) অনুমোদন করেছেন, সমর্থন করেছেন, অন্তত তিনি যে সবের প্রতিবাদ করেন নি, তাও হাদীস নামে পরিচিত।

রাসুলের কথা, কাজের বিবরণ ও সমথ-অনুমোদনকেই হাদীস বলা হয়। একটি হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স.) নিজেই একে 'হাদীস' নামে অভিহিত করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, ' সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে, যে লোক কিয়ামতের দিন রাসূলের শাফা'আত লাভে ধন্য হবে? তখন নবী করীম (স.) বলেন,

لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسئلني أحد عن هذا الحديث أول منك لم رأيتك من حرصك على العلم الحديث.

'আমি মনে করি এই হাদীস সম্পর্কে তোমার পূর্বে আর কেহই আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। বিশেষত এই কারণে যে, হাদীস শোনার জন্য তোমাকে সর্বাধিক আগ্রহী দেখতে পাই।' [৫৯]

নবী করীম (স.) এর মহান জিন্দেগী ছিল কুরআন মজীদের তথা ইসলামের বাস্তব রূপ। অতএব দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে রাসুলে করীমের যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন ও সমর্থনকে ইসলামী পরিভাষায় 'সুন্নাহ' বলা হয়।

সুন্নাহ শব্দের অর্থ হল চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। আল্লামা আল-জাজায়েরী লিখেছেন,

أما السنة فتطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهي مرادفة للحديث عند علماء الأصول

'সুন্নাহ' অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাসূলের নামে কথিত কথা, কাজ ও সমর্থন বুঝায়। বিশেষজ্ঞদের মতে সুন্নত হাদীসের সমার্থবোধক। [৬০]

Dhaka University Institutional Repository

ইজমা (Consensus of opinion) :

ইস্‌লামী শরী'আহ আইনের তৃতীয় উৎস ইজমা। ইজমার সাধারণ অর্থ হল কোন বিষয়ে মতৈক্যে উপনীত হওয়া। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় ইজমা বলতে রাসূল, (স.) এর ইন্তি কালের পর ইসলামের (বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের) সঠিক সমাধান কল্পে বিশেষজ্ঞগণের মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমতকে বুঝায়। "রাসূলে করীম (স.) এর পর কোন এক সময়কার মুসলিম উম্মাতের সমস্ত মুজতাহিদ একত্রিত ও সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শরী'আতের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, পরিভাষায় তা-ই হল ইজমা"।[৬১] উসূলে ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ نور الأنوار এর প্রণেতা আল্লামা শায়খ আহমদ মোল্লাজিউন (র.) এর মতে,

الإجماع في الشريعة اتفاق مجتهدين صالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر واحد على أمر قولي وفعلي.

'ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে ইজমা হল একই যুগে রাসুল (স.) এর উম্মতের একদল বিশিষ্ট মুজতাহিদদের বক্তব্যের মাধ্যমে বা বাস্তব কর্মের মাধ্যমে কোন বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করা।'[৬২] ইজমার প্রকৃতি সম্পর্কে তিনটি মতবাদ প্রচলিত আছে। কোন কোন ফকীহ বা আইনবিদ মনে করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আসহাবের মতবাদের ঐক্যকে ইজমা বলা হয়।

আবার কোন কোন ফকিহর মতে, মুসলমান আইনবিদদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে একমত হওয়ার নাম ইজমা, আর একদল মনে করেন যে, হিজরী প্রথম তিন শতাব্দীতে আবির্ভূত মুসলমান আইনবিদদের মধ্যে আহুত মতৈক্যকে বলা হয় ইজমা।[৬৩]

ইজমা দুই উপায়ে নির্ধারিত হয়ে থাকে। যথা- (১) কাওল বা উক্তি দ্বারা যখন মুজতাহিদগণ কোন বিশেষ বিবেচ্য সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। (২) ফে'ল বা কর্মের মাধ্যমে মুজতাহিদগণ ঐক্যমত পোষন করেন। যখন কোন যুগের সকল মুজতাহিদ কোন বিষয়ের ফয়সালায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন তবে সেই ইজমাকে বলা হয় ইজমা-ই-আজীমা। আর যদি কোন বিষয়ে ফয়সালায় সকল মুজতাহিদ একমত না হলেও মতদ্বৈতা না করে চুপ থাকেন এবং সমাজের সকলেই এ মতকে গ্রহণ করে তবে সেই ইজমাকে বলা হয় ইজমা-ই-রুখসাহ্।[৬৪] রাসূল (স.) এর বাণী এবং কুরআনুল কারীম ইজমার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। মুসলিম সমাজের ঐক্যমত সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন, (হাদীস) আল্লাহ কোন ভ্রান্তিতে আমার অনুগামীদের একতাবদ্ধ করেন না এবং আল্লাহর হাত সমাজের উপর প্রসারিত এবং যে কেহই নিজেকে বিচ্ছিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

করিবে সে দোযখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য তা করবে।[৬৫] 'যে ব্যক্তি সমাজ থেকে সামান্যতম সরিয়া দাঁড়াবে সে ইসলামের বন্ধন হ'তে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে'।[৬৬] পবিত্র কুরআনে ইজমার দৃষ্টিভঙ্গী সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছে।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً

'এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্য এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।'[৬৭]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً

'যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরন করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্য স্থান।'[৬৮]

রাসূল (স.) এর ইন্তিলের পরই ইজমার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ মুহাম্মদ (স.) এর জীবদ্দশায় মুসলিম সমাজ কোন সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজন বোধ করেনি। তখন কোন সমস্যা উদ্ভূত হলে ওহী কিংবা রাসূল (স.) এর সমাধানই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর সে পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং মুসলিম সমাজ কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজন অনূভব করে। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইজমার নীতি অবলম্বিত হত। খোলাফায়ে রাশেদীন রাসূল (স.) এর এই উপদেশের ভিত্তিতেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান করতেন। রাসূল (স.) নিম্নোক্ত বানীটি থেকে সম্মূখে ইজমার গুরুত্ব উপলব্দি করা যায়। বিষয় মীমাংসার জন্য আসিলে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করিও, আল্লাহর কিতাবে নেই এমন কিছু আসলে সুন্নাতে রাসূলের দিকে তাকাইও; সুন্নাতে নেই এমন কোন বিষয় আসলে জনগণের মতৈক্যের উপর নির্ভর করিও।

তত্ত্বগতভাবে অবশ্য সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় কখনও কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত কিছুতে একমত হতে পারে না, কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগন বিভিন্ন রকম নুতন নুতন স্থানীয় আইনের সংস্পর্শে আসে এবং তখন তাদের উক্ত আইনসমূহ গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্ন দেখা দেয়। মুসলিম আইনের এই বিবর্তণের ধারায় মুজতাহিদদের ঐক্যমত (ইজমা) বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং বিজিত রাষ্ট্রসমূহের আঞ্চলিক আইন বর্জন করে ইসলামী আইন প্রণয়নে সাহায্য করে।[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

কিয়াস (Analogy):

কিয়াস ইসলামী শরী'আহ আইনের চতুর্থ উৎস। কিয়াস হলো সাদৃশ্যমূলক অবরোহণ প্রক্রিয়া। এর আক্ষরিক অর্থ হল 'পরিমাপ' সমর্থন প্রদান, 'অনুমান করা এবং সমতা। কিয়াস বলতে তুলনামূলক বিচার বা অনুমানকে বুঝায়। কুরআন সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে কোন নূতন সমস্যার সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্তের নাম কিয়াস। মোল্লাজিউন (র.) তার নুরুল আনওয়ার গ্রন্থে বলেন, القياس في الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم و العلة ও ইসলামী শরী'আহ আইনের পরিভাষায় শাখা বিষয়কে ইল্লত ও হুকুমের ব্যাপারে (আসল) মৌলিক বিষয়ের উপর অনুমান করে এর হুকুমের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়াকে কিয়াস বলা হয়।[৭০] যে সমস্ত বিষয় কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার অন্তর্ভূক্ত হয়নি সে সব বিষয় কিয়াসের মাধ্যমেই মীমাংসিত হয়ে থাকে। যে বিষয়ে কোন 'নচ্ছ'(نص) অকাট্য দলীল নেই, নেই কোন ইজমা সেই বিষয়টিকে অপর একটি ব্যাপারের সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করা, যে বিষয়ে শরী'আতের স্পষ্ট অকাট্য দলীল আছে কিংবা যে বিষয়ে কোন ইজমা হয়েছে এবং এই শেষোক্ত বিষয়ে শরী'আতের যে হুকুম সেই হুকুমকে প্রথমোক্ত বিষয়ে প্রয়োগ করা। এ প্রয়োগের মূল কারণ হচ্ছে যে ঠিক যে কারণে এ বিষয়ে কোন অকাট্য হুকুম হয়েছে,আলোচ্য বিষয়টিতে সে কারণটি বর্তমান রয়েছে। ফিকহবিদগণ বলেছেন,(ان القياس مظهر للحكم لا مثبت له) 'কিয়াস হচ্ছে যে বিষয়ে কোন হুকুম নেই সে বিষয়ে কোন হুকুম প্রকাশ করা।'[৭১] এর বিশেষ কারণ হল, নতুন নতুন এমন অনেক সমস্যা সংঘটিত হচ্ছে যা পূর্বে সংঘটিত হয়নি এবং যে বিষয়ে শরী'আতের স্পষ্ট কোন দলীল ও হুকুম নেই। এরূপ অবস্থায় ফিকহবিদগণকে সে দলীলহীন নতুন বিষয়টিকে পূর্ববর্তী দলীল সম্পন্ন বিষয় বা ব্যাপারের সাথে বিবেচনা করতে হয়েছে এবং দু'টি বিষয়ে মৌল কারণে মিল ও সাদৃশ্য থাকায় দুটিতে একই হুকুম নির্ধারিত করতে হয়েছে।

অতএব, কিয়াস সংঘটিত ও বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য অন্তত চারটি জিনিস অপরিহার্য। প্রথমত, مقيس عليه অর্থাৎ এমন একটি বিষয়, যে সম্পর্কে শরী'আতের অকাট্য দলীল রয়েছে এবং তাতে সেই বিষয়ে একটা হুকুমও রয়েছে। পরিভাষায় এটাকে বলা হয় 'মূল'। দ্বিতীয়ত, مقيس যে বিষয়ে নতুন করে হুকুম জানতে হবে। কেননা সে বিষয়ে শরী'আতের কোন হুকুম পাওয়া যায়নি। অথচ সে সম্পর্কে শরী'আতের হুকুম যে কি, তা অবশ্য জানতে হবে। পরিভাষায় এটিকে বলা হয় فرع শাখা। তৃতীয় হল علت কারণ, নিমিত্ত বা ফলপ্রসু যুক্তি। তা এমন একটা গুণগত দিক, যা মূল ও শাখা উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান এবং এই কারণটি থাকার কারণেই মূল বিষয়ে শরী'আতের সেই

Dhaka University Institutional Repository

হুকুমটি দেখা হয়েছে। মুজতাহিদ সে হুকুমটি শাখা বিষয়েও আরোপিত করতে চান। কেননা এর মধ্যেও ঠিক সেই গুণ পাওয়া যায়, যা মূলে বর্তমান রয়েছে। মূলের ব্যাপারে দেয়া হুকুমও হবে সাধারণ। কেননা যাতে ব্যতিক্রম রয়েছে তাতে 'কিয়াস' চলে না।[৭২]

কিয়াসের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে মোল্লা জিয়ন (র.) বলেন, انه حجة نقلا و عقلا 'কিয়াস কুরআন, সুন্নাহ এবং যৌক্তিক ভিত্তিতে শরী'আতের দলীল।'[৭৩] কিয়াস কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা থেকে নির্গত একটি সুস্পষ্ট শরীয়াতি হুকুম। নিম্নে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা থেকে উদ্ভাবিত কিয়াসের উদাহরণ উল্লেখ করা হল। কিতাবুল্লাহ বা আল কুর'আন থেকে উদ্ভাবিত কিয়াসের দৃষ্টান্ত হল ইসলামে মাদকতা সৃষ্টিকারী তীব্র পানীয় তথা মদকে নিষিদ্ধ করা। মদকে স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ করার বিধান না থাকলেও মদ মাদকতা ও উম্মাত্ততা সৃষ্টিকারী তীব্র পানীয় বিধায় উহার মধ্যে মাতাল করার উপকরণ রয়েছে। সুতরাং খেজুর হতে প্রাপ্ত মদ, আঙ্গুর হতে প্রাপ্ত মদ, আফিম, গাজা ইত্যাদি সর্বপ্রকার মাদকই নিষিদ্ধ।

সুন্নাহ হতে উদ্ভাবিত কিয়াসের নমূনা বা দৃষ্টান্ত جنس ও قدر এর علت থাকার কারণে جص (চুন) ও نورة (সুরকির) লেন-দেন অতিরিক্ত গ্রহন হারাম হওয়াকে ছয়টি বস্তুর উপর কিয়াস করা। যা রাসুল (স.) এর নিম্নোক্ত বাণীর দ্বারা জানা যায়। গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খুরমার বিনিময়ে খুরমা, লবনের বিনিময়ে লবন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের লেন-দেনে সমপরিমাণ এবং নগদ হতে হবে। অতিরিক্ত গ্রহণ সুদ হিসাবে গণ্য হবে।

ইজমা হতে উদ্ভাবিত কিয়াসের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যিনাকৃতা মহিলার মাকে বিয়ে করা হারাম হওয়াকে সংগমকৃতা দাসীর 'মা' কে বিয়ে করা হারাম হওয়ার উপর কিয়াস করা। যা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।

উপরোক্ত উৎস সমূহের পর কতিপয় সম্পুরক উৎস এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় ইসলামী শরী'আহ আইনে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। যেমন,

ইস্তিহসান:

ইস্তিহ্সান শব্দের অর্থ কোন জিনিসকে উত্তম ও ভাল মনে করা বা কোন জিনিস কে উত্তম ও ভাল বলে গণ্য করা। আর পরিভাষায় এর অর্থ :

وهو العدول عن قياس وضحت علته الى قياس خفيت علته او إلى دليل آخر.

Dhaka University Institutional Repository

কিয়াসের একটা স্পষ্ট কারণ বাদ দিয়ে কিয়াসেরই অপর একটি কারণের দিকে যা অস্পষ্ট রয়ে গেছে কিংবা অপর কোন দলীলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। কিংবা একটি সামগ্রিক হুকুম বাদ দিয়ে এমন কোন দলীলের ভিত্তিতে কোন ব্যতিক্রমধর্মী হুকুমের দিকে মুজতাহিদের প্রত্যাবর্তন করা, যা এই প্রত্যাবর্তনকে তার নিকট অগ্রাধিকারী বানিয়ে দিয়েছে তাকেই ইস্তিহসান বলা হয়।[৭৪] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'ইসলামী নীতিতে চুক্তিকালে বর্তমান নেই এমন বস্তু অর্থাৎ কাল্পনিক বস্তুর চুক্তি বেআইনী ও বাতিল। সুতরাং সাদৃশ্যমূলক বা কিয়াসের দৃষ্টিতে ভবিষ্যতে কোন কার্যের চুক্তি বাতিল হওয়া উচিত, কারণ তা বর্তমানে নেই। কিন্তু ভবিষ্যত কার্যের কোন চুক্তি কুর'আন ও হাদীসে অনুমোদিত আছে বিধায় উক্ত চুক্তি বাতিল হবে না, বরং উহা আইনানুগ চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে। আবার কৃষি জমি ওয়াক্ফ করার ব্যাপারে সাধারণ জনকল্যাণের অধিকারকে শামিল করা সংক্রান্ত মত। এতে কোন অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল নেই। এটা সম্পুর্ণ ইস্তিহ্সান এর ভিত্তিতেই করা হয়েছে। কেননা জমিন দ্বারা কোন ফায়দা পাওয়া এ ছাড়া সম্ভবপর নয়। যদিও 'ওয়াকফ'ও বিক্রয় দু'টিই একই রকম কাজ। কেননা দুটি ক্ষেত্রেই মূল মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে যায়। 'ওয়াক্ফ' কে বিক্রয় এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা কোন দলীল ছাড়াই অনুসরণ করার দাবি করে।

মুসলিহাত :

'মুসলিহাত' বলতে বুঝায় এমন প্রত্যেকটি কল্যাণকে যে বিষয়ে শরী'আত প্রণেতার তরফ হতে এমন কোন অকাট্য স্পষ্ট দলীল এসে পৌছায়নি, যা তাকে গণ্য করার আহবান জানায় কিংবা গণ্য না করার এবং যার এমন কোন মূলও নেই যার উপর ভিত্তি করে কিয়াস করা যেতে পারে। এতে তা গ্রহণ ও গণ্য করা হলে তাতে কোন না কোন ফায়দা অর্জন বা ক্ষতি প্রতিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

আল-ইস্তিস্হাব :

অতীতকালে শরী'আতের যে হুকুমটা যেমন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই হুকুমটাকে সে ভাবে অপরিবর্তিত রাখাকেই বলা হয়, 'ইস্তিসহাব'। সে হুকুমটাকে কার্যকর ও স্থায়ী বলে গণ্য করতে হবে যতক্ষণ না এমন কোন দলীল পাওয়া যাবে না সেটিকে বদলে দিতে কিংবা সেটিকে রদ করে দিতে। যেমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ হিসাবে নেয়া অর্থ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে, যতক্ষণ না তার ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার কোন অকাট্য প্রমাণ বা সাক্ষ্য পেশ করা সম্ভব হবে। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই ফিকহ্ বিজ্ঞানে বলা হয় 'ইস্তিসহাব'।[৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরী'আহ আইনের বৈশিষ্টাবলী :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পূর্ণাঙ্গতা দানের জন্য মানব রচিত আইন থেকে এর আবেদন সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামী শরী'আহ তার অবতীর্ণকাল থেকে বিশ্বের সকল মানবগোষ্ঠীর বিধান হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। জাগতিক বিধি-বিধানের মাধ্যমে সমাজ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানের সাথে সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের কথা ও ঘোষণা করেছে ইসলামী শরী'আহ। একজন রাষ্ট্র প্রধানের রাষ্ট্র পরিচালনার যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা তাকে অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছে। সাথে সাথে তাকে মসজিদে সালাতের নেতৃত্ব দেয়ার মতো গুণাবলী অর্জন করারও তাগিদ দিয়েছে। প্রচলিত আইনে কেবল বস্তুজগতের উন্নয়নের পথ-নির্দেশনা রয়েছে, কখনো এ আইন ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কখনোবা ধর্ম বিদ্বেষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, । প্রচলিত আইনের বিভিন্ন সংগঠন দেখলে মনে হয় যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃষ্টি-কালচার, ধ্যান-ধারনা বা দর্শনকে সামনে রেখে তা রচনা করছেন। কিন্তু ইসলামী শরী'আতের মৌলিক নীতিমালা মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তাই ইসলামী শরী'আহ কালজয়ী।

নিম্নে ইসলামী শরী'আতের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল-

ইসলামী শরী'আহ মহান আল্লাহ কতৃক প্রেরিত শরী'আহ :

প্রচলিত আইন বিধানের সাথে সাথে ইসলামী শরী'আতের সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামী শরী'আহ মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত এক সুস্পষ্ট জীবন-বিধান। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন,

الم - ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

"আলিফ, লাম, মিম' এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য।[৭৬] ইসলামী শরী'আত অসম্পূর্ণতা, অপারগতা, সময়, স্থান, অবস্থা, অভিজ্ঞতা, মেজাজ, প্রবৃত্তি এবং আবেগ থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত। ইসলামী শরী'আহ তথা ইসলামী বিধি-বিধান দাতা হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন কিসে মানব জাতি তথা সৃষ্টি জগতের উপকার এবং উন্নতি হবে এবং কিসে ও কিভাবে সমস্যার সমাধান হবে।[৭৭]

ইসলামী শরী'আতের সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি করা, যাতে করে মানুষ আল্লাহকে সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে পারে। অন্তরে প্রকৃত ভয় স্থাপন করে

Dhaka University Institutional Repository

ও তার প্রতি যথার্থ আনুগত্য প্রদর্শন করে জীবন-যাপন করতে পারে। তবে ইসলামী শরী'আতের উদ্দেশ্য ইবাদতের মধ্যেই সীমিত নয়, বরং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সভ্যতা, ফৌজদারী ও দেওয়ানী দন্ডবিধি সবকিছু এর মধ্যে পরিবেষ্ঠিত। যাতে মানুষ ইহ্কালীন জীবনে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-উৎপীড়নসহ সকল দ্বন্দ-কলহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। আল্লাহর ইবাদত এবং বিধি-বিধানকে অগ্রাহ্য করা করো জন্যে বৈধ নয়। আর কোন মুসলিমকে এ বিষয়ে ভিন্নমত ও পথ গ্রহন করার এখতিয়ারও দেয়া হয়নি।[৭৮] ইসলামী শরী'আতের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا

'আল্লাহ্ ও তার রাসূল কোন বিষয়ে রায় প্রদান করলে, কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।'[৭৯] মানব-জীবনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন না করার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظالمون.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفاسقون.

'আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচার-ফয়সালা করে না তারা কাফির' 'আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা জালিম' 'আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা ফাসিক।' [৮০] প্রতিটি মু'মিনের মনে আল্লাহর আইনের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা এবং অনুসরন পরিলক্ষিত হয়, যা প্রচলিত কোন আইনে দেখা যায় না।

ইসলামী শরী'আতের ব্যাপ্তি সমগ্র বিশ্বমানবতা :

ইসলামী শরী'আহ হল আল্লাহর নিকট থেকে বিশ্ব-মানবতার জন্যে আসা সর্বশেষ শরী'আহ। এ শরী'আত নির্দিষ্টভাবে বিশেষ কোন জাতির জন্যে বিশেষ কোন কাল, যুগ বা শ্রেণীর জন্যে নয়। তা সর্বকালের সর্বদেশের ও সর্ব জাতির এবং সর্ব শ্রেণীর মানুষের জন্যে। এর রচয়িতা স্বয়ং আল্লাহ। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রকাশ্য ও গুপ্ত সর্ব বিষয়ে পুরামাত্রার জ্ঞানের অধিকারী। অতএব তার রচিত শরী'আহ সর্বদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সঙ্গতিপূর্ণ। এতে নেই একবিন্দু একদেশদর্শীতা। আল্লাহ নিজে সর্ব প্রকার ভূল ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, পক্ষপাতিত্ব, বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

আকর্ষণ, স্বার্থপরতা ও নিজস্ব ঝোক প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই তার তৈরী শরী'আহ মানুষের বাস্তব জীবন গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি সর্বোত্তভাবে ভুল-ত্রুটিমুক্ত। এর প্রতিটি আদেশ-নির্দেশ, মৌল-নীতিমালা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বমানবতার জন্য। যেমন আল-কুর'আনে বিভিন্ন জায়গায় সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে আদেশ-নিষেধ সম্বলিত বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য কোন জীবন বিধান বা আইন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা দৃশ্য, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে পুরোমাত্রার জ্ঞানের অধিকারী। তাই, তার অবতীর্ণ শরী'আত আন্তর্জাতিক। আল্লাহ রাব্বুল বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ

'হে নবী আমি তো আপনাকে গোটা মানবজাতির জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।' [৮১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً

'বলুন, হে মানব সকল, আমি তোমাদের সবার প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।' [৮২]

এ শরী'আতকে বলা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে রহমত স্বরূপ এবং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের পথ হিসেবে। ইসলামী শরী'আতের ব্যাপকতা কোন কালের কোন খন্ডিত অংশের জন্য নির্দিষ্ট নয়, অথবা মানব জাতির কোন গোত্র বা সমাজের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং এটা স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে সবার জন্য। তাই ইসলামী শরী'আহ চিরকাল বিদ্যমান থাকবে মানব জাতির হিদায়াত ও পথ নির্দেশনার জন্য ।[৮৩]

মানব কল্যাণে নিয়োজিত :

মানুষের কল্যাণকর সবদিক এ জীবন বিধানে প্রাধান্য পেয়েছে। অধিক ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সামান্য কল্যাণকে পরিহার করা হয়েছে। ইসলামী শরী'আহ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা, তা পৃথিবীর সকল মানুষ, পরিবার গোত্র, শ্রেণী, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র তথা সব কিছুর জন্য বাস্তব ও কার্যকর বিধান। এই শরী'আহ মানব কল্যাণে কিভাবে নিয়োজিত তার একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে রাসুল (স.) এর নীতিমূলক একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হল-

لا ضرر ولا ضرار

'ক্ষতিস্বীকার করা এবং অন্য কারো ক্ষতি করা দু'টোই নিষিদ্ধ।' [৮৪] কল্যাণকে শরী'আতের অন্যতম মৌল উৎসরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি এমন প্রদীপ্ত মশাল, যা ইসলামের রাজপথে চলার জন্যে

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ সুবিধা বিধান করে দিয়েছে। এর আলোকে ইসলামী আইন বিশারদগণ ইজতিহাদ তথা গবেষণার দুরুহ কাজ বিশেষ সুষ্ঠুতা সহকারে সুসম্পন্ন করেছিল এবং সকল ক্ষেত্রে শরী'আতের মূল লক্ষ্য অনুপাতে আইন বিধান রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল। মালিকী মাযহাবের আইনবিদগণের মতে সার্বিক জনস্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে কোন সাধরণ অর্থবোধক নস বা (Text) বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় গৃহীত সিদ্ধান্তকে এমন কোন মৌলিক নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া যায় ফলে উহা জনস্বার্থে ও শরী'আহর উদ্দেশ্য উভয়টির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে সকল বিষয়ে শরী'আতের সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান আছে সেই বিষয়ে মুসলিহাত বা মাসালিহে মুরসালা হয় না। ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ও ইবনে মাযাহ মতে যে সকল বিষয়ে শরী'আতের সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান আছে সেই বিষয়ে মুসলিহাত বা মাসলিহ মুরসালা হয় না। কোন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা বা কোন মারাত্মক ক্ষতি প্রতিরোধ বা দূরীভূত করা, শরী'আহর উদ্দেশ্য পূর্ণ করা, ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং যে সব মূলনীতির উপর ইসলামী শরী'আতের ভিত্তি স্থাপিত তার পূর্ণতা সাধন করাই মাসালিহে মুরসালার উদ্দেশ্য। [৮৫]

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের কল্যাণ সাধন :

ইসলামী শরী'আহ মানুষের সর্বপ্রকার কাজের জন্য দু'ধরনেণর কর্মফল নির্দিষ্ট করেছে। তার একটি দুনিয়ার প্রাপ্তব্য। তাতে বৈষয়িক উপায় উপকরণ প্রয়োগ করা হয়। আর অপরটি পরকালে প্রাপ্তব্য। তা একান্তভাবে পরকালের জন্যে নির্দিষ্ট এবং পরকালীন উপায়-উপকরণই তাতে প্রয়োগ করা হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও আমাদেরকে সে ভাষা কুর'আনে শিখিয়ে দিয়েছেন যাতে করে আমরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কল্যাণ পেতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে রাব্বুল আলামীন! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।' [৮৬] আইন রচনা কারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কখনো ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ ও কল্যাণকর আইন রচনায় সক্ষম নয়। তা কোন না কোন দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়, যা সংশোধন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। তাছাড়া মানুষ জানে না যে, কোন আইন রচনায় সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সর্বকল্যাণ হবে। মানুষের মধ্যে যে স্বেচ্ছাচারিতা,

Dhaka University Institutional Repository

লোভ , লালসা, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগুলো রয়েছে তার দমন আইনের মাধ্যমে কখনো সম্ভব নয়। প্রয়োজন আনুগত্যও অনুসরণের।

ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত :

ইসলামী শরী'আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের মধ্যে ইনসাফ ও আদল প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি। সহায়-সম্পদ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার লালনই ইসলামী শরী'আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যে ভাবে তা দ্বীন ও স্বভাব চরিত্রের হিদায়াত করে থাকে। ইসলামী শরী'আতের উদ্দেশ্য সর্বস্তরের মানুষের সমস্যার সঠিক বিচার বিশ্লেষণ করা। কোন স্তর বা শ্রেণীকে বাদ দিয়ে অপর কোন স্তর বা শ্রেণীর মানুষকে প্রাধান্য দেওয়া ইসলামী শরী'আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয় অথবা কোন ব্যাক্তিকে বাদ দিয়ে অপর ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এর উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতাকে বাদ দিয়ে বস্তুবাদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এর কামনা নয়। এমন কি পরকালকে বাদ দিয়ে শুধু জাগতিক সমস্যাবলীর সমাধান নিশ্চিত করা এর লক্ষ্য নয়।৫৫ সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামী শরী'আর বৈশিষ্ট্য।[৮৭] ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সাধারণ আদেশ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা হতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।' [৮৮] আল্লাহ পাক আরো বলেন,

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط

'হে মু'মনিগণ। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য ও ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।'[৮৯] তাছাড়া এমন অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোতে আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

'আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর। তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক।'[৯০]

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

'তোমরা ওজন মাপ পূর্ণ কর ন্যায়ের ভিত্তিতে।'[৯১]

Dhaka University Institutional Repository

আমরা যদি ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধানের দিকে তাকাই তা হলে দেখতে পাব যে, ইসলাম সকল ক্ষেত্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে। আলোচ্য আয়াত সমূহে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। তাই ইসলমী শরী'আহকে ন্যায়ের লালন ক্ষেত্র বললে অত্যুক্তি হবে না। ইসলামী শরী'আহ যেমন আদল বা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ন্যায়বিচার কার্যকর করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকে তেমনি অন্যায়-অত্যাচার ও অবিচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে। অন্যায়ের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। অন্যায় অবিচার আগুনের মতো ধ্বংসাত্মক। যদি অন্যায় অবিচারকে লালন করা হয় এবং ন্যায় ও আদলকে উপেক্ষা করা হয় তাহলে সমাজে অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা সমাজে কখনো তাদের সাহায্যকারী পাবে না আর কেউ তাদের সহায় সম্পদ ও জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এগিয়ে আসবে না। তদুপরি সেখানে অপরের অধিকার খিয়ানতকারীর দাপট বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে অন্যায় ও অবিচার কারীর রাজত্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হবে যদিও তার শাসকগোষ্ঠী মুসলমান হয়।

পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বাস্তব ভিত্তিক :

ইসলামী শরী'আহ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর প্রতিটি বিধি বিধান পূর্ণতা সহকারে আর্ন্তজাতিকতার বৈশিষ্টে মর্যাদাবান। পৃথিবীর কোন জীবন বিধান সুচনা লগ্ন থেকে পরিপূর্ণতা, সুসামঞ্জস্যতা ও সাম্যের দাবীদার নয়। কেবল ইসলামী শরী'আহ আইনই এর ব্যতিক্রম। এটা এমন একটা জীবন ব্যবস্থার নাম যা মানব জীবনের সকল দিক বিভাগ ও আচার আচরণকে একীভূত করে। ইসলামী শরী'আতের এই ব্যাপকতা ও পূর্ণাঙ্গতা শুধু কিতাবে লিপিবদ্ধ নয়, বরং বিগত চৌদ্দশ বছর ধরে বাস্তব স্বীকৃত। এর কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কু'রআনুল কারীমে ঘোষণা করেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সমূহ সম্পূর্ণ করে দিলাম, ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'[৯২] যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞতা বা ভুলের কারণে ইসলামী শরী'আতের বিপরীত কোন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে অথবা ইসলামী শরী'আতের কতক অংশ গ্রহন করে আর কতক অংশ বর্জন করে তাও তার জন্যে বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

'তোমরা কি কিতাবের কতক অংশ মানবে আর কতক অংশ অস্বীকার করবে ?' [৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতার লালন ক্ষেত্র :

ইসলামী শরী'আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চারিত্রিক গুণাবলীর সংরক্ষণ ও নৈতিকতাবোধ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতাকে অত্যন্ত উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৎচরিত্র ও নৈতিকতার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ইসলামী শরী'আহ মানুষের সৎগুণাবলী ও তার ক্রমবিকাশের জন্য সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করেছে। শরী'আহ তার এ মহান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এতখানি গুরুত্ব দিয়ে থাকে যে, দু'টি নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিটিকেই সে ধ্বংসের এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্রের সাথে যদি কোন বস্তুর অতি ক্ষীণতম সম্পর্কও বিদ্যমান থাকে তবে শরী'আহ আইনে সে ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে আসে।[৯৪]

ইসলামী শরী'আতে চরিত্র ও নৈতিকতা সংক্রান্ত রীতিনীতি অত্যন্ত ব্যাপক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত করাই শরী'আতের মূল লক্ষ্য। সৎ চরিত্র ও নৈতিকতার প্রভাবে সমাজে যাবতীয় কাজ-কর্ম সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয়। ব্যক্তি জীবন ছাড়াও অপরের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলীতেও নৈতিকতার লালন অত্যবশ্যক। ইসলামী শরী''আহ ছাড়া অন্য কোন জীবন দর্শনে এরূপ উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার অধিকারী হওয়ার কোন সুযোগ নেই। ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান যার মাধ্যমে ব্যক্তি,পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্র ও আদর্শকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ইসলামী আদর্শবাদের কারণেই মানুষের মধ্যে তা গ্রহণ ও অনুসরণের সাড়া পড়েছে। নিশ্চয় ইসলাম অনৈতিকতার আশ্রয় থেকে বহুদুরে অবস্থান করে। ব্যক্তি জীবনে ইসলাম যে সব আচরণকে অন্যায়, মন্দ ও নিন্দনীয় মনে করে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও তা অন্যায় বলে বর্জন করে। আর ব্যক্তি জীবনে যেসব সৎগুণাবলীর উম্মেষ ঘটে এবং নৈতিকতার আদর্শ উজ্জীবিত হয় রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইসলাম তা লালন করে। এ কারণে ইসলামী জীবন বিধান বা জীবন দর্শনে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে একই ধরনের চরিত্রিক গুণাবলী ও নৈতিকতাকে উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

'যদি আপনি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভঙ্গের আশংকা করেন তবে আপনার চুক্তিও আপনি বাতিল করবেন। আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।'[৯৫]

যখন খিয়ানত প্রকাশিত হয় চুক্তির মধ্যে এবং প্রমানাদি পাওয়া যায়, তখন বিদেশের সাথে চুক্তি বাতিল করে দিতে হবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা খিয়ানত পছন্দ করেন না, যদিও খিয়ানত অমুসলিম রাষ্ট্রের মাধ্যমে হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তানুসারে যে কোন মুসলমান মক্কা থেকে মদীনায়

Dhaka University Institutional Repository

চলে আসলে তাকে মক্কায় ফেরত দিতে হবে। সন্ধির পর আবু জিনদাল নামক এক ব্যক্তি কুরাইশদের নিকট পাঠিয়ে দেন, সাহাবা কিরাম এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মহানবী (স.) বলেন, "আমরা পরস্পরে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি শান্তির জন্য এবং এ চুক্তিপত্র তারা আমাদেরকে দিয়েছে এবং আমরাও তা তাদেরকে দিয়েছি, কিন্তু আমি এ ব্যাপারে শঠতা করতে পারি না। ইসলামী আইনবিদগণ বলেছেন- মুসলমানদের জন্য অমুসলিম দেশে (দারুল হারবে) প্রবেশের পর কোন প্রকার খিয়ানত করা বৈধ নয়, বরং তাদেরকে শান্তির সাথে বাস করতে হবে। কেননা খিয়ানত করা হল শঠতা, আর শঠতা ইসলামী জীবন বিধানে নিষিদ্ধ। ইসলামী শরী'আহ নৈতিক মূল্যবোধ সুতিকাগার। কেননা নৈতিক চরিত্রের উপর যখন বিপর্যয় আসে তখন সমগ্র মানব জাতি অপবিত্র ও কলংকিত হয়ে সমাজের ভিত্তি ধ্বংস করে দেয়। স্বভাব-চরিত্র ও নৈতিকতাকে উর্ধ্বে স্থান দেয়ার জন্য মহানবী (স.) ঘোষণা করেছেন-

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

'উন্নত চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।'[৯৬]

মহানবী (স.) চরিত্রকে ইসলামের অংশ হিসেবে তুলনা করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন দ্বীন হল উত্তম চরিত্র। এ হাদীস থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে উত্তম চরিত্র ইসলামের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ। উন্নত চরিত্রগত আদর্শ ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠার কল্পনাও করা যায় না। কিয়ামত দিবসে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে তাদেরকে যাদের স্বভাব-চরিত্র উত্তম। মহানবী (স.) হতে এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত আছে তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে যে দু'টি জিনিস তুলাদন্ডে ওজন করলে ভারী হবে তার একটি হচ্ছে 'আল্লাহ্ ভীতি' ও অপরটি হচ্ছে উত্তম চরিত্র।

ব্যাপক ও বিস্তৃত :

ইসলামী শরী'আহ যেহেতু বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত, তাই এতে বর্ণ, শ্রেণী, সম্প্রদায় জাতীয়স্বার্থ স্থান পায়নি। তাই এই শরী'আহ আইন ব্যাপক ও বিস্তৃত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ঘোষনা করেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

'আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি, যেটি এমন যে,তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।'[৯৭] নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো ইসলামী শরী'আতের ব্যাপকতা সম্পর্কে সৃষ্ট ধারণা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত, ইসলামী শরী'আহ আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াবলীকে মৌল বিষয় হিসেবে গ্রহন করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের বিশ্বাস, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস এর অন্তর্গত। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কোন সত্তাকে অংশীদার করা কোন মতেই বৈধ নয়।

দ্বিতীয়ত, স্বভাব চরিত্র সংক্রান্ত বিষয়াবলী যা একজন মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসেবে অলংকৃত করে। স্বভাব চরিত্র হল মানব দেহের ভূষণ। সত্য কথা বলা, মিথ্যা না বলা, মানুষকে ধোঁকা না দেওয়া, জীবন দর্শন হিসেবে ইসলামী শরী'আতের উৎকর্ষতা। প্রাপ্য দিয়ে দেওয়া, প্রতারণা না করা, পরনিন্দা না করা, চুক্তি না করা, কারো উপর নির্যাতন-নিপীড়ন না করা, মানুষের সাথে মানবিক আচরণ এর অন্তর্ভূক্ত।

তৃতীয়ত, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াবলী। মানুষ যাবতীয় সৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে। মানুষের প্রতি আল্লাহর যে অধিকার রয়েছে তা পালন করবে। সালাত কায়েম, সিয়াম সাধনা যাকাত আদায়, হজ্জ পালন প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। সকল প্রকার অন্যায় ও অশ্লীলতা পরিহার সংক্রান্ত বিধি-বিধান এর অন্তর্ভূক্ত।

চতুর্থত, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক গঠন করা এবং পরিবার গঠনের জন্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, বিবাহ-বিচ্ছেদ, স্ত্রীর ভরণ পোষণ, সন্তান লালন-পালন, উত্তরাধীকার সূত্রে সম্পদের মালিক হওয়া ও সম্পদ বন্টন-রীতি ইত্যাদি এর অন্তর্গত।

পঞ্চমত, ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-বিধান। ব্যবসায়-বাণিজ্য রীতি-পদ্ধতি, হালাল ও হারাম ব্যবসায় বাণিজ্য, অগ্রীম ক্রয় বিক্রয়, সুদী ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এর সাথে সম্পৃক্ত।

ষষ্ঠত, বিচার-ব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান এর অন্তর্ভূক্ত। হাদ্দ, কিসাস, রাজম, তা'যিরসহ যাবতীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধি-বিধান, আইনের মৌল নীতিমালা, আইন প্রয়োগ পদ্ধতি এবং প্রয়োগকারী সংস্থা সবকিছু ইসলাম অত্যন্ত পরিস্কারভাবে উদ্ধৃত করেছেন।

সপ্তমত, অমুসলিম জনসাধারণ সংক্রান্ত নীতিমালা। যে সব অমুসলিম অন্যদেশ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে এসে বসবাস করে। অথবা ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম ইসলাম গ্রহন না করে বসবাস করে, তাদের নিরাপত্তা, অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করে। বর্তমানে যাকে বিশেষ পররাষ্ট্র নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

অষ্টমত, ইসলামী রাষ্ট্র ও অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংক্রান্ত নীতিমালা। যেখানে মুসলিম দেশের প্রতিবেশী অমুসলিম দেশ বা অমুসলিম দেশের প্রতিবেশী হিসেবে মুসলিম দেশ তাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সামরিক উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে আইন প্রণয়ন

Dhaka University Institutional Repository

করে থাকে। বর্তমানে যাকে সাধারণ পররাষ্ট্র নীতি বা আল কানুন আত-দাওলী আল'আম বলা হয়ে থাকে।

নবমত, সরকার পদ্ধতি সংক্রান্ত নীতিমালা এবং তার মৌলনীতি সমূহ অর্থাৎ সরকার গঠন পদ্ধতি, রাষ্ট্র পরিচালনা কাঠামো, সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও কল্যাণকর নীতিমালা, জনসাধরণের অধিকার সংরক্ষণ নীতিমালা প্রভৃতি। ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে সকল বিষয়ে সুন্দর, সাবলিল ও জনকল্যাণমূলক নীতিমালা প্রবর্তন করেছে। বর্তমানে যা আল কানূন আত-দাস্তরী বা সংবিধান নামে পরিচিত।

দশমত, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও এর খাত সংক্রান্ত নীতিমালা। ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কিভাবে নির্বাহ করা হবে এবং কোন কোন উৎস থেকে এ অর্থ আসবে ইসলামী শরী'আহ তা অতি সুন্দর, নিরপেক্ষ নির্ভেজাল ও সুষমভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যাতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত, প্রতারিত ও উপেক্ষিত হতে না পারে। ইসলামী শরী'আহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমন সাম্যের নীতি প্রবর্তন করেছে যা ধনতান্ত্রিক ও নয় আবার সমাজতান্ত্রিকও নয়, বরং ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক প্রত্যেকেই তার অধিকার প্রাপ্তিতে সক্ষম।[৯৮]

কঠিনতা ও কঠোরতা পরিহার করা ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য :

ইসলামী শরী'আহ মানবতা বিকাশে সহায়ক। তাই এ শরী'আহ কঠিনতা ও কঠোরতা পরিহার করে সহজ পন্থা অনুসরণ করে থাকে। কেননা, আল্লাহর ইচ্ছাও এতে নিহিত। আল-কুর'আনে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে যে,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ করতে চান, তোমাদের জটিলতা কামনা করেন না এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।'[৯৯]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) যখন হযরত মায়ায ইবনে যাবালকে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান তখন তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা লোকদের জন্যে সহজতর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে, তাদের জন্যে কঠিন ও দুর্বিসহ কোন অবস্থার সৃষ্টি করবে না, লোকদেরকে সুসংবাদ দেবে, তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ ও আস্থাহীন বানাবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহদেরকে কোন কষ্ট বা দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য করতে চাননি। তিনি তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজ করতে নির্দেশ দেননি; এমন কোন বিধান দেননি, যা করা মানুষের সাধ্যাতীত। সূরা আল মায়িদায় শরী'আতের নানা বিধি-বিধানের উল্লেখ করার পর সে সবের

মূল উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে এভাবে 'আল্লাহ্ তা'আলা শরী'আতের এসব বিধি-বিধান দিয়ে তোমাদের উপর কোন অসুবিধা বা বিপদ চাপিয়ে দিতে চাননি, বরং তিনি চেয়েছেন তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত সমূহ পূর্ণ করে দিতে যেন তোমরা তাঁর শোকর আদায় করতে পার।

ইসলামী আইনের মৌলনীতি হচ্ছে কঠোরতা না করা। যেখানে কঠোরতা ও কষ্ট সেখানে সহজতর করা। ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে কঠোরতা ও কষ্ট বা অসুবিধা বলতে কারো উপর সাধ্যাতিরিক্ত কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া। যা লোকদের মনোবল সংকীর্ণ করে দেয় এবং চেষ্টা সাধনার পথকে করে অবরুদ্ধ। এ কারণে শরী'আত সেই কষ্ট ও অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে করে সবকিছু সহজতর হয়।

অপরিবর্তনীয় এক কালজয়ী আদর্শ:

ইসলামী শরী'আহ আইন আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত এক চিরন্তন, চিরপ্রগতিশীল, অপরিবর্তনীয় ও কালজয়ী জীবনাদর্শ। ইসলামী শরী'আহ কেবল ইবাদতের মধ্যেই সীমিত নয়, বরং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সভ্যতা, আইন বিচার, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থাৎ সবকিছু এর মধ্যে সন্নিবেশিত। ইসলামী শরী'আহ ও প্রচলিত আইন কখনও এক নয়। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত ও মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামী শরী'আহ আইনের মৌল নীতিমালা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত যার বিভাজন অথবা পরিবর্ধন ও সংস্করণ বৈধ নয়। পক্ষান্তরে প্রচলিত আইন এমন একদল লোক বা সমাজের হাতে তৈরী হয়ে থাকে, যে দল বা সমাজ এর রুপরেখা সীমিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংস্করণ ও সংশোধন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ইসলামী শরী'আতের চিরন্তন আবেদন মহান আল্লাহর বাণীতে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন,

ثُم جعلناك عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ.

'এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরী'আতের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না।'[১০০]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আগমন এই কালজয়ী আদর্শ নিয়ে। মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

'তিনিই তাঁর রাসুলকে হেদায়েত ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন।'[১০১]

Dhaka University Institutional Repository

আর এই ইসলামী শরী'আহ ছাড়া কোন শরী'আহ তথা শাসন ব্যবস্থারই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

'যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না'।[১০২] এতে বুঝা যায় যে, কোন লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না। অতএব ইসলামী শরী'আহ ছাড়া অন্য কোন শরী'আহ আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়। ইসলামী শরী'আহ হল সদা অপরিবর্তনীয় ও সর্বকালীন।

ইসলামী শরী'আহ্ আইনের মৌলিকবৈশিষ্ট্যঃ

ইসলামী শরী'আহ এর তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য কোন প্রচলিত আইন বা বিধি-বিধানে নেই। নিবে এ মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলঃ

১। তার পূর্ণাঙ্গতা একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ শরী'আতের জন্য যে সব নিয়ম-কানূন, আদর্শ নীতিমালা ও দর্শনের প্রয়োজন হয় তা সব কিছুই ইসলামী শরী'আহর মধ্যে বর্তমান। এদিক দিয়ে তা অপর হতে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র। বর্তমানকে অতিক্রম করে সুদূর ভবিষ্যতেও তা সমাজের সমুদয় প্রয়োজনের পূর্ণরূপে নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম।

২। এর মহামহিমা ও সর্বোচ্চতাঃ এর নীতি ও আদর্শ সমসাময়িক সামাজিক মানদন্ড হতে উন্নত শ্রেণীর মানদন্ডের ধারক-বাহক। তার মহামহিমা ও উন্নতিও চিরন্তন ও স্থিতিশীল। এ এমন কিছু দর্শন ও নীতিমালার বাহক, যে কোন সমাজ উন্নতি প্রগতির যতটি সোপানই অতিক্রম করুক না কেন, এর মান উন্নত হতে উন্নততর। শরী'আহ আইনের মহত্ব আপন আসনে সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত।

৩ এর চিরন্তনতাঃ কালের চক্র যতই ঘুরুক না কেন এবং অবস্থার যতই বিবর্তন হোক না কেন, শরীয়তের বিধান ও ঘোষণাবলীর মধ্যে সংস্কার ও বর্ধন-কর্তনের কোনই অবকাশ নেই, নেই কোন পরিবর্তনের সুযোগ। তার বিধান ও ঘোষণাবলী চিরন্তন ও স্থিতিশীলরূপেই প্রতিষ্ঠিত। শরী'আহ এর স্বীয় মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রেখেই সর্বযুগ ও অবস্থার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। এজন্যই তাকে প্রগতিশীল ও গতিশীল দ্বীন নামে আখ্যায়িত করা হয়।

শরী'আতের এ তিনটি বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, একই মূল্যের সাথে এ সংশ্লিষ্ট এবং একই সত্যের বিভিন্ন প্রদর্শনী। আর তা হচ্ছে ইসলামী শরী'আত আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ হওয়া এবং তিনিই এর রচয়িতা। এটা যদি আল্লাহ্ তা'আলার প্রণীত বিধান না হত, তবে এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা, মহামহিমা ও চিরন্তনতা পাওয়া যেত না। কারণ এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তার দ্বারাই সৃষ্টি হতে পারে।[১০৩]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. আবুল ফজল জামালদ্দিন ইবনে মানজুর আল-আফরীকী আল-মিশরী, লিছানুল আরব, (বৈরুত দারু ছাদের- ১৪০২ হিজরী) পৃ. ৪০-৪২; আল-ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল কুরতুবী; আল-জামে'লি আহকামিল কুরাআন, ১ম খন্ড (মিশর, কায়রো, দারুশ শুরক) পৃ. ৮৩০; মুহাম্মদ শফিক গারবাল, মৌসু'আতুল আরাবিয়াহ, ইহইয়াউত তুরাসুল লিলআরাবী, (বৈরুত, লেবানন-১৯৮৭) ২য় খন্ড, পৃ. ১০৮৩।

২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী শরী'আতের উৎস, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৩ পৃ. ৯।

৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৮২, পৃ. ৪০৯।

৪. ইউসুফ আল কারজাভী, শরী'আতুল ইসলাম খুলুদুহা ওয়াসালাহুহা ফি কুল্লি যামান ওয়া মাকান, আল-মাকতাবাতুল ইসলামীয়া, বৈরুত-১৩৯৭, পৃ ১৩-১৬

৫. ইবনু তাইমিয়া, মাজমূ' আল-ফাতাওয়া, ১৯/৩০৬

৬. প্রাগুক্ত, ১৯/৩০৯

৭. মুহাম্মদ শফিক গারবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮৩।

৮. আল-কুরআন, ৫:৪৮

৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

১০. আল-কুরআন, ৪৫:১৮।

১১. আল-কুরআন, ৪২;১৩

১২. আল-কুরআন, ৪২:২১

১৩. আল-কুরআন, ০৫:৪৮

১৪. মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

১৫. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-২০০৬, পৃ. ১১।

১৬. আল কুরআন ৩:১৬৪

১৭. আল কুরআন : ৬২:৯

১৮. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, ইসলামী আইন ও বিচার (ত্রৈমসিক গবেষণা পত্রিকা) বর্ষ: ৩ সংখ্যা : ৯ জানুয়ারী মার্চ ২০০৭ পৃ. ১১-১২

১৯. সাইয়েদ কুতুব, মা'আলিম ফিত-তারীখ, পৃ. ১১১

২০. মুয়াত্তা ইমাম মালেক ও মুসনাদ আহমদ।

২১. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

২২. আস-সিহাহ, ২/৫২৪, লিসানুল আরব, ৩/৩৫৩, আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত, ২/৭৩৭।

২৩. ড. মুহাম্মদ সাদ আল-মু'জাম আল-ইয়ূতী, মাকাসিদুশ-শরীআহ আল-ইসলামিয়াহ, পৃ. ২৩-২৪

২৪. ড. আহমাদ আল-বাইসূন, ইমাম শাতিরবীর মাকাসিদ তত্ত্ব , পৃ. ৭

২৫. ড. মুহাম্মদ সা'দ আল-ইয়ূবী, মাকাসিদুশ-শরী'আহ আল-ইসলামিয়াহ, পৃ. ৩৭

২৬. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫-১৬

Dhaka University Institutional Repository

২৭. আল-কুরআন ২:১৪৩

২৮. আল-কুরআন ৪:১০৫

২৯. আল-কুরআন ৪১ :৪২

৩০. আল-কুরআন : ৩৯:১, ৪৫:২, ৪৬:২

৩১. আল-কুরআন ২০:১৪

৩২. আল-কুরআন ২:১৮৩

৩৩. ড. মুহাম্মদ সা'দ আল-ইয়ূবী, মাকাসিদুশ-শরীআহ আল-ইসলামিয়াহ, পৃ. ১২৩

৩৪. আল-কুরআন ৫৯:৭

৩৫. আল-কুরআন ২:১৮৫

৩৬. ড. মুহাম্মদ মানযুরে এলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৩৭. ড. মুহাম্মদ সা'দ আল-ইয়ূবী, মাকাসিদুশ-শরীআহ আল-ইসলামিয়া,প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৯

৩৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী উৎসহ, খায়রুন প্রকাশনী-২০০৩, পৃ. ১৫০

৩৯. দলিল শব্দের আভিধানিক অর্থ হিদায়াতকারী, নির্দেশক ইত্যাদি। ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় দলিল বলতে বুঝানো হয় এমন সব জিনিস যার প্রতি সঠিক ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হলে শরী'আতের আমলী হুকুমকে সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া যায়। (আবদুল ওয়াহাব খাললাফ, ইলমু উসুলিল ফিকহ পৃ.২০)।

৪০. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-২০০৪, পৃ. ২১৩-২৮৯

৪১. মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত পৃ. ৪০।

৪২. প্রাগুক্ত পৃ. ৪১-৪২

৪৩. আল-কুরআন ৫:৬৭

৪৪. আল-কুরআন ১৬:৪৪

৪৫. বায়হাকী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৪

৪৬. আল-কুরআন ৪:৫৯।

৪৭. আল-কুরআন, ৫৯:৭।

৪৮. আল-কুরআন, ৪:৬৫

৪৯. আল-কুরআন, ৬:৩৮

৫০. আল-কুরআন, ৫:৩

৫১. প্রত্যেক যুগে এত অধিক পরিমান লোকের বর্ণনাকে 'মুতাওয়াতির সনদ' বলা হয় যাদের সাধারণত কোন মিথ্যার উপর একতাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। উক্ত সনদ দ্বারা 'ইলমে ইয়াকীন' অর্থাৎ এমন দৃঢ় জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ হয়, যা সকল ওরা সন্দেহের উর্ধ্বে।

৫২. মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, পৃ. ২০

৫৩. কুরআনের ভাব ও ভাষা উভয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। কিন্তু হাদীসের কেবল ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। ভাষা নবী মুহাম্মদ (স.) অথবা জিব্রাইল (আ.) এর নিজস্ব।

৫৪. আল-কুরআন

৫৫. মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. মোল্লাজিউন (র.), নুরুল আনওয়ার, দেওবন্দ, ইয়াসির নাফিম, তা. বি. পৃ. ৯-১১

৫৭. মোল্লাজিউন, প্রাগুক্ত পৃ. ৭

৫৮. মোল্লাজিউন, প্রাগুক্ত, ১৭৯

৫৯. আবু আবদুল্লাহ্ ইসমাইল বোখারী (রা.) সহীহ্ বুখারী খন্ড-২ কিতাবুর রিকাক

৬০. মোল্লাজিউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৬১. শায়খ আহমদ মোল্লাজিউন, নূরুল আনওয়ার, দেওবন্ধ, ইয়ামিসর নাদিম, তা. বি. পৃ, ২২৩

৬২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

৬৩. ড. রশিদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির বগুড়া, ঢাকা- ১৯৯৯ পৃ. ১২১, ১২২

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

৬৫. তিরমিজী

৬৬. আহম্মদ ও আবুদাউদ

৬৭. আল-কুরআন ২:১৪৩

৬৮. আল-কুরআন ৪:১১৫

৬৯. অধ্যাপক মোঃ আলতাফ হোসেন, ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন বাংলাদেশ ল' বুক সেন্টার-২০০৫, পৃ. ৩৬

৭০. মোল্লাজিয়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

৭১. মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৭৩. মোল্লাজিয়ন, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৮

৭৪. মাওলানা আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩১

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৭

৭৬. আল্ -কুর'আন, ১(১-৩)

৭৭. ইউসুফ আল কারযাভী, ১৩৯৭ হিজরী, শরী'আতুল ইস্লাম,খুলুহ্হা ওয়া ছালাহুহা লিততাবিক ফিকুল্লি যামান-ওয়া মাকান, আল মাক্কাবুল ইসলাম, বৈরুত, পৃ. ১৮

৭৮. ড. মোঃ আমির হোসেন সরকার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৫বর্ষ, ১ম সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৯৬

৭৯. আল-কুরআন-৩৩-৩৬

৮০. আল-কুরআন ৫,৪৪,৪৫,৪৭

৮১. আল-কুরআন ৩৪: ২৮

৮২. আল-কুরআন ৭: ১৫৮

৮৩. আবদুল করীম যায়দান, ১৯৭৫, উস্লুদ দাওয়াহ, তৃতীয় সংস্করণ, দার উমর ইবনুল খাত্তাব ইস্কান্দারিয়া, পৃ. ৫৪

৮৪. ইমাম মালিক। ইমাম আহম্মদ ও ইবনে মাযাহ।

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. মুহাম্মদ মুসা-১৯৯৬, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খন্ড দ্বিতীয়ভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃঃ ২৫-২৭

৮৬. আল-কুর'আন ২:২০

৮৭. মোঃ আমির হোসেন সরকার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পত্রিকা, জীবন দর্শন হিসাবে ইসলামী শরী'আতের উৎকর্ষতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৮৮. আল-কুরআন, ৫:৮

৮৯. আল-কুরআন, ৪:৫৮

৯০. আল-কুরআন, ৬:১৫২

৯১. আল-কুরআন, ৫:৩

৯২. আল-কুরআন, ১৬:৮৯

৯৩. আল-কুরআন, ২:৮৫

৯৪. সীরাত ইবনে, হিশাম, ৭ম সংস্করণ ১৯৮৩, দারুল ইমান প্রকাশনী , সৌদী আরব, পৃ. ১৭৯

৯৫. আল-কুরআন,৮: ৫৮

৯৬. বুখারী মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, সহীহ আল বুখারী ,২য় খন্ড, মাগাজী অধ্যায়, মাফতাবা, দারুল ইশা'আত, ভারত , হাদীস নং ১৪৭৫ পৃ.৭৫৯

৯৭. আল-কুরআন, ১৬:৮৯

৯৮. আবদুল করীম, যায়দান , উসুলুদ দাওয়াহ, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৯: ১৯২

৯৯. আল-কুরআন, ২:১৮৫

১০০. আল-কুরআন, ৪৫:১৮

১০১. আল-কুরআন, ৪৮:২৮

১০২. আল-কুরআন, ৩:৮৫

১০৩. আব্দুল কাদির আওদাহ শহীদ (মিসর), ইসলামী আইন বনাব মানব রচিত আইন, (অনু: মাওলানা কারামত আলী নিজামী) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারী-২০০৫, পৃ. ২২৭-২২৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী শরী'আহ আইনে মানবজীবন

উপক্রমণিকা
ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা রক্ষা
যিনা ব্যভিচারের সংজ্ঞা
বিনা ব্যভিচার নির্ধারণের প্রমান সমূহ
অবিবাহিতের শাস্তির বিধান
বিবাহিতের শাস্তির বিধান
সমকামিতার শাস্তি
ব্যভিচারের শাস্তির যৌক্তিকতা
মানব জীবন সংরক্ষণ
ইসলামী আইনে হত্যা
হত্যা ও কিসাসের সংজ্ঞা
ইসলামী আইনে হত্যা
রক্তপণ (দিয়াত) এর বিধান
রক্তপণ (দিয়াত) এর পরিমান
অঙ্গহানির বিধান
হত্যার শাস্তি হিসাবে কাফ্ফারা, মিরাছ এবং অছিয়ত থেকে বঞ্চিত করা
হত্যা আইনের যৌক্তিকতা
মানুষের বুদ্ধি বৃত্তিক বিকাশ সাধন এবং বাক স্বাধীনতা
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষণ
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা
বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা
দ্বীনের সংরক্ষণ বা ধর্মীয় চিন্তার স্বাধীনতা
দ্বীনের হিফাজতের উপায়
মানুষের সম্পদের সংরক্ষণ
চুরির আভিধানিক ও পারিভাষিক ব্যাখ্যা
চুরির প্রমাণ
চোরের শর্তাবলী
ইসলামী শরী'আহ আইনে চোরের বিধান
ইসলামী শরী'আহ আইনে চোরের শাস্তি যৌক্তিকতা

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরী'আহ আইনে মানবজীবন

উপক্রমণিকা:

মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক জীব। মানব জাতি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান,শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। আঞ্চলিকতা, ধর্মীয় চিন্তা, বংশ, গোত্র, ভাষার ভিন্নতা এবং সংস্কৃতিক ভিন্নতার প্রেক্ষিতে প্রথমে নগর রাষ্ট্র এবং চূড়ান্তপর্যায়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাকণ করেছে। এ রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থারই পরিশীলিত রূপ। কেননা মানুষ সামাজিক জীবনে সুন্দর, সুশৃংখল জীবন যাপন করার জন্য যে আইন-কানুন, বিধি-বিধান, রীতি-নীতি, বা সংবিধানের আওতায় আসতে হয় তা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সংগঠন হচ্ছে রাষ্ট্রব্যবস্থা। এ সমাজ ব্যবস্থা গড়তে মানুষকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমে ব্যক্তি সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা পরে সামাজিক সমস্যা। চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছে। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষকে প্রতিরোধ স্বরূপ আইন-কানূন রচনা করতে হয়েছে। ফলে জন্ম নিয়েছে বিশ্লেষণমূলক মতবাদ ঐতিহাসিক মতবাদ। সমাজবিজ্ঞান মূলক মতবাদ এবং দার্শনিক মতবাদের। এ সকল মতবাদের নিরিখে শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional law), সাধারণভাবে প্রণীত আইন (Statute), সাধারণ আইন (Common law), বিভাগীয় কর্তাদের নির্দেশ নামা (Ordinance), শাসন বিভাগীয় আইন (Administrative law), সর্বোপরি আর্ন্তজাতিক আইন (International law) প্রণয়ন করা হয়েছে। [১]

প্রচলিত আইনের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থায় সুখ, সমৃদ্ধি ও স্বস্তি অনুপস্থিত। কেননা তার ব্যাপ্তি বংশ-গোত্র, গোষ্ঠী, বর্ণ-ভাষা ও সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে নয়। তাই এ আইন সমাজে শান্তি ও কল্যাণের স্থলে বিপর্যয়ই সৃষ্টি করেছে বেশি। এমতাবস্থায় মানুষ সৃষ্টিকর্তার পথ-নির্দেশের কামনা করে। এ অবস্থার আলোকেই মহান আল্লাহ যুগে যুগে বহু নবী রাসূলকে শরী'আহ (আইন-বিধান) দিয়ে এ ধরায় পাঠিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

'আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দেশসহ প্রেরণ করেছি, এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।'[২]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

Dhaka University Institutional Repository

'তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন।'[৩]

পরিশেষে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর আবির্ভাব হয়। মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তাঁর মনোনীত দ্বীন 'ইসলাম'কে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেছেন। তিনি বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'[৪]

মহান আল্লাহ প্রদত্ত সে দ্বীন বা জীবন বিধান মানব জাতির ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা নির্ধারণ করেছে। আর মানব জীবনের সর্বাধিক জরুরী বিষয়সমূহের সংরক্ষণ ও হেফাযত ইসলামী শরী'আহ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আর এ বিষয়গুলো হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার সে সকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ যার অনুপস্থিতে দুনিয়ার কল্যাণের সঠিক গতিধারা ব্যাহত হয়। ফলে দেখা দেয় বিপর্যয়, সীমাহীন ক্ষতি ও প্রাণহানির ন্যায় ঘটনা। আর আখিরাতে নাজাত ও নিয়ামত লাভ হয় সুদূর পরাহত।

ইসলামী শরী'আহ আইন মানব জীবনে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে।

১। আকায়েদ বা বিশ্বাস সম্বন্ধীয় ব্যাপার

২। আখলাক বা চরিত্র গঠন ব্যাপার

৩। আহকাম বা বিধি বিধানগত ব্যাপার।

আবার বিধি বিধান প্রধানত ঃ দু' প্রকার :

(১) ইবাদত ও (২) মু'আমালাত। আর মুয়া'মালাত হল বান্দার তথা মানব জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কীয় ব্যাপার। আর তা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্তঃ (১) পারিবারিক বিধি বিধান, (২) সামাজিক (৩) রাষ্ট্রীয় (৪) আন্ত:রাষ্ট্রীয় বিধি বিধান যা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং রাষ্ট্রীয় বিধি বিধানের মধ্যে হল ইসলামী অপরাধ আইন।[৫]

দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলামী শরী'আহর প্রয়োগে অসভ্য বর্বর জাতি পৃথিবীর সবচেয়ে মহান সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছিল। আজও বিশ্ব তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। সে সময় খোদায়ী বিধান অনুযায়ী মানব দেহের নিরাপত্তা বিধান করেছিল। মাদককে অবৈধ ঘোষণা করার সাথে সাথে বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারণ করে এ কুঅভ্যাস প্রতিরোধ করতে পেরেছিল। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের দ্বারা মানব বংশ সংরক্ষণ করতে পেরেছিল। মানুষ মানুষের ইজ্জত সম্মান

Dhaka University Institutional Repository

যেন নষ্ট করতে না পারে সেজন্য অপবাদের শাস্তি নির্ধারণ করে ইজ্জত সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। বিভিন্ন মতবাদের করালগ্রাসে পড়ে ধর্মত্যাগ করতে উৎসাহিত যেন না হয়, সেজন্য ধর্মকে হিফাজতের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে প্রতিরোধ করতে পেরেছিল। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে বিত্ত সম্পদ প্রতিটি মানুষের একান্ত প্রয়োজন। এক শ্রেনীর দুস্কৃতিকারী বিনা রোজগারে অগোচরে বা জোরপূর্বক সম্পদ নিয়ে যাবে এটাকে রোধ করার জন্য শাস্তির বিধান কার্যকর করে এ মনোবৃত্তির চিকিৎসা করতে পেরেছিল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন শৃংখলা পরিস্থিতি শান্ত থাকা একান্তভাবেই বাঞ্চনীয় ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এজন্য রাষ্ট্রে বিশৃংখলা রোধ করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃংখলা সংরক্ষণ করতে পেরেছিল। সর্বোপরি রাষ্ট্রদ্রোহীতার শাস্তি নির্ধারণ করে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল।[৬] এ প্রসঙ্গে দার্শনিক হুজাতুল ইসলাম আবু হামেদ আল-গাজ্জালীর (১০৫৮-১১১১) (র.) ভাষ্য হল শরী'আহ আইনে চূড়ান্ত লক্ষ্য পাঁচটি। (১) ধর্ম সুরক্ষিত করা (২) দৈহিক নিরাপত্তা বিধান, (৩) বিবেক বুদ্ধির হিফাজত, (৪) বংশ সংরক্ষণ, (৫) এবং সম্পদ হিফাজত করা। আর এ পাঁচটি মৌলিক নীতির হিফাজত বয়ে আনবে মুছলিহাত তথা কল্যাণকে। আর এগুলোর অনুপস্থিতি হবে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং এর প্রতিরক্ষা হচ্ছে মুছলিহাত তথা কল্যাণকামীতা।[৭] প্রয়োজনের তাগিদে ও সময়ের প্রয়োজনে আলোচ্য পাঁচটি বিষয়কে ইসলামী শরী'আহ অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করে বিধায় বিষয়গুলো নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক.ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা রক্ষা :

মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্ট। মানুষকে আল্লাহ নর-নারী দু'শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটি নর ও নারী সৃষ্টিগত ভাবেই জৈবিক চাহিদা রয়েছে। জৈবিক চাহিদা নিবারণ ছাড়াও নর ও নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ স্বভাবজাত। একজন পুরুষের জীবন পূর্ণাঙ্গ হয় না একজন নারীকে ছাড়া। আবার নারীর জীবনও পূর্ণাঙ্গ হয় না পুরুষের সংস্পর্শে না আসলে। তাদের এ চাহিদা পূরণ করার জন্য ইসলামী শরী'আহ বৈধতা দান করেছে বৈবাহিক বন্ধনকে

ইসলামী শরী'আহ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে সর্বপ্রকার কলুষতামুক্ত রাখে। জন্মের পূর্ব থেকেই প্রতিটি মানুষের বংশীয় পবিত্রতা রক্ষা করা এবং মানব বংশের একটি সুষ্ঠু ক্রমধারা সুবিন্যস্ত করা ইসলামী শরী'আহর দাবী। যার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে মানুষের পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমাধান কল্পে, বৈবাহিক ব্যবস্থায় সুষ্ঠু আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। এর বাস্তবায়ন দেখা যায় মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) -এর সৃষ্টিলগ্ন থেকে। সর্বপ্রথম আদম (আ.) আল্লাহর ইচ্ছায় হাওয়া (আ.)

Dhaka University Institutional Repository

এর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর মানব ইতিহাসের সূচনা থেকে অদ্যাবধি মানুষ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই মানব বংশ বিস্তারের ধারা অব্যাহত রেখেছে। যদিও বৈবাহিক পন্থা ছাড়া মানব জাতির সৃষ্টি ও বংশ বিস্তার সম্ভব তবে তা আল্লাহর বিধান বহির্ভূত হওয়ায় ইসলামী শরী'আহ্ তার অনুমোদন করে না। এমনকি মানব সভ্যতায়ও তা এক গ্লানিকর ব্যাপার। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেননি। যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়ে তাদেরকে শরী'আহ আইনের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আর এর সর্বশেষ ধারাবাহিকতায় আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আগমন। প্রত্যেক নবী ও রাসূলের দায়িত্ব ছিল মানুষকে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখা। তন্মধ্যে অন্যতম গর্হিত কাজ হল সামাজিক ব্যাভিচার। বৈবাহিক ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে সকল প্রকার ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে মানব সৃষ্টির ধারাবাহিকতাকে ইসলাম অনুমোদন করে এবং এর প্রতি উৎসাহ দান করে। কেননা এই পৃথিবীতে মানব জাতীর মাধ্যমেই আল্লাহর বিধান ও শরী'আহ বাস্তবায়িত হবে। অন্যদিকে অবৈধ যৌনাচারের মাধ্যমে মানব সৃষ্টির যে ধারাবাহিকতা বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুমোদন করে এর অনেকগুলো বিপদজনক পরিণতি অবশ্যম্ভাবী . মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

'তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর, আল্লাহ অনুগ্রহ কারীদেরকে ভালবাসেন।'[৮]

এই কারণে আমরা সামাজিক মরণব্যাধি এইডস্ এর বিস্তৃতি দেখতে পাই। এ ছাড়াও মানব জাতির শারীরিক ব্যাধির অনেকগুলোই অবৈধ যৌনাচারের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে, যার সর্বশেষ পরিনতি অশান্তিময় জীবন এবং মৃত্যু।

অবৈধ বংশ বিস্তার এবং অবৈধ পন্থায় জৈবিক চাহিদা সমাধা করা গর্হিত কাজ। জৈবিক চাহিদা পূরণ করা মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্যতম। এর সমাধান না হলে মানুষের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এছাড়াও মানব জাতির অস্তিত্ব স্থায়ীত্বের জন্য সুসন্তান একান্তভাবে কাম্য। আর সন্তান জন্ম নেয় যৌন কার্য সম্পন্নের মাধ্যমে। ইসলামী শরী'আহ আইনে যৌনাঙ্গ পবিত্র রাখার জন্য সকল প্রকার অবৈধ পন্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং যৌনাচারের জন্য সুনির্দষ্ট বিধিমালা তৈরী করে মানুষের বংশীয় পবিত্রতা রক্ষা করে। প্রত্যেক জাতি ও দেশে রাষ্ট্রীয় আইন তথা ধর্মীয় বিধানে তার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান ও আইন কানূন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীষ্ট্রীয় আইনে জোরপূর্বক যৌনকর্ম সমাধা করার শাস্তি রয়েছে। ইসলামী আইনেও জোরপূর্বক এ কার্য সমাধান করা হলে শাস্তির বিধান রয়েছে। ইসলামী আইনে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় যদি নারী পুরুষ বিবাহ বহির্ভূতভাবে জৈবিক চাহিদা সমাধা করে তবে তার জন্য রয়েছে শাস্তির বিধান, যা বিধিবদ্ধ ফৌজদারী আইনের আওতাভূক্ত।

বর্তমান বিশ্বে এ যৌন কার্য অবৈধভাবে বিবাহ ব্যতিরেকে যিনার মাধ্যমে সমাধা হয় বিধায় এইডস নামক মারাত্মক ঘাতক ব্যাধির জন্ম নিয়েছে। যা একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। সে জন্য বিশ্বের প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যাভিচার বাদ দিয়ে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিবাহ কার্যের মাধ্যমে যৌন কার্য সমাধার জন্য প্রতিনিয়ত আহবান জানাচ্ছে।

ইসলামী শরী'আহ আইন ব্যক্তি জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করতে গিয়ে বিবাহের প্রতি উৎসাহ দান, ব্যভিচার প্রমানের শর্তাবলী, শাস্তির বিধান এবং যৌক্তিকতা নিয়ে যে মত পোষণ করে তার তাত্ত্বিক ও তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

ইসলামী শরী'আহ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈবাহিক ব্যবস্থাপনায় মানব সৃষ্টির বিশাল কাজটি সম্পন্ন হয়। শরী'আহ অনুমোদিত বৈবাহিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের আত্মায় প্রশান্তি সৃষ্টি হয়। মানুষ যখন তার নিজের সন্তানকে কাছে পায়, তার থেকে ভবিষ্যত জীবনে কিছু পাওয়ার আশায় বুক বাঁধে এবং সাথে সাথে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নিজের জীবনের সকল কর্মকান্ড চালিয়ে যায় তখন তাদের মাঝে আত্মিক প্রশান্তি বিরাজ করে। এ জন্যই মহান বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

'মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।'[৯]

নিজের বিবাহিত স্ত্রী, পরিবার পরিজনের প্রতি মমতার যে বন্ধন সৃষ্টি হয় তা অতুলনীয় মহান আল্লাহ বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

'তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ'।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

যিনা ব্যভিচারের সংজ্ঞা :

যিনা শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সংকীর্ণতা ও ঢেকে ফেলা। তা গোপন সংকীর্ণ লিঙ্গে সংঘটিত হয়ে থাকে। আর শাব্দিক অর্থটি পারিভাষিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল। [১১]

ইংরেজীতে বলা হয় ঃ Voluntary sexual intercourse between he and she.[১২] or It is said , Adultery, Which is commited either between an unmarried or married, and forcely intercourse is called rape.[১৩] ইসলামী আইনের পরিভাষায় : যিনা বা ব্যভিচার অবৈধ সংগমের নাম যা যৌন উত্তেজনাপূর্ণ জীবিত মহিলার সামনের দিক দিয়ে স্বেচ্ছায় ইনসাফের দেশে (যারা ইসলামী আইন পালন করে) সংঘটিত হওয়া যে মহিলা হবে নিঃসন্দেহে প্রকৃত মালিকানামুক্ত। তেমনিভাবে মালিকানার অধিকার মুক্ত প্রকৃত বিবাহ ও রূপক বিবাহ থেকে মুক্ত। অনুরূপভাবে বিবাহ ও মালিকানা সবটাই সন্দেহের স্থান ও কিংবা সন্দেহ থেকে মুক্ত হতে হবে। [১৪] ইবনে রুশদ আল-হাফীস বলেন,

أما الزنى فهو كل وطئ وقع على غير النكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين.

'যিনা এমন সহবাসকে বলা হয় যা বিশুদ্ধ বিবাহ, রূপক বিবাহ (নিকাহ্ সাদৃশ্য) ও দাসত্বে মালিকানা ব্যতিরেকে সংঘটিত হয়।' অথবা সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলা যায়,

أن الزنا هو وطئ الرجل المرأء في قبل في غير ملك ولا شبهة ملك.

'প্রকৃত মালিকানাহীন ও রূপক মালিকানাহীন মহিলার সামনের দিকে কোন পুরুষ সংগম করাকে যিনা বলা হয়।'[১৫] সুতরাং বিবাহ কিংবা দাসত্বে মালিকানা সূত্রে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সহবাস বৈধ বলে স্বীকৃত। আকদ কিংবা দাসত্ব সূত্র ছাড়া পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে সংগম বৈধ নয়। যেহেতু বিবাহ বিধান এজন্যই করা হয়েছে, যাতে নারীর থেকে পুরুষ গ্রহন করা বৈধ হয়ে যায়।

যিনা ব্যভিচার নির্ধারনের প্রমান সমূহ :

যিনা ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করার জন্য কতিপয় শর্তাবলী রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কতগুলো শর্ত সর্বসম্মতিক্রমে আর কতগুলো শর্তাবলী মতভেদ সহ।

১। যিনা ব্যভিচারকারী যিনা সম্পর্কিত সাক্ষী নর ও নারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেক সম্পন্ন হতে হবে। এর কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Dhaka University Institutional Repository

দু'জন সাক্ষী কর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর। যাতে একজন যদি ভুলে যায় তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। [১৬]

এ ছাড়া এ সম্পর্কে রাসূল পাক (স.) এর বাণী হল-

'তিন ব্যক্তি থেকে আমলনামা লিখার কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে, বালক থেকে যতক্ষণ সে বালেগ হয়, ঘুমন্ত থেকে যতক্ষণে সে জাগ্রত হয়, পাগল থেকে যতক্ষণে সুস্থ হয়।' [১৭]

খ। যিনাকারীকে মুসলমান হতে হবে।

গ। যিনাকারীকে সম্মত হতে হবে।[১৮]

ঘ। মানুষের সাথে যিনা সংঘটিত হতে হবে।

ঙ। যার সাথে যিনা করবে, সে সংগমের যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

চ। সন্দেহের বশীভূত হলে সে যিনা কার্যকরী হবে না। [১৯]

ছ। যিনাকারীকে যিনা হারাম হওয়া সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। [২০]

জ। মহিলাকে যুদ্ধ এলাকার বাসিন্দা নয়, এমন হতে হবে।

ঝ। মহিলাকে জ্যান্ত হতে হবে। মৃতকে সংগমকারীর উপর শাস্তি দেয়া হয় না।[২১]

ঞ। মহিলাকে ইসলামী রাষ্ট্রে থাকতে হবে।[২২]

ট। যিনাকারী মহিলাকে যিনা করা অবস্থায় অনড় শান্ত থাকতে হবে।[২৩]

এছাড়াও তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণ করা যায় :

১। ব্যভিচারী নারী পুরুষের মৌলিক স্বীকৃতি।

২। চারজন সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা। এ দু'টি সর্বসম্মতিক্রমে যিনা প্রমাণের দলীল হিসেবে স্বীকৃত।

৩। প্রসূতি হওয়া। এতে প্রমান হওয়ার জন্য মতভেদ রয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন আলামত দ্বারাও প্রমান করা যায়। তবে তাতে দন্ডবিধি রাষ্ট্রীয় শাস্তি কার্যকরী হবে, হদ বা বিধিবদ্ধ দন্ড কার্যকরী করা যাবে না।[২৪]

হযরত আবু হুরায়রা ও সাঈদ বিন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসুলে পাক (স.) এর দরবারে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর শপথ করে আপনার নিকট সাহায্য কামনা করছি যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার কিতাব দ্বারা ফয়সালা করবেন আর বিবাদী বলল সে তার থেকেও জ্ঞানী। হ্যাঁ, আপনি আমাদের আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করুন। হে আল্লাহর

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল! ঘটনা বলার অনুমতি দিন। রাসুল (স.) অনুমতি দিলেন। সে বলল, আমার ছেলে এক ব্যক্তির উট চড়াতো। অতঃপর তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। আর আমাকে খবর দেয়া হয়েছে যে, আমার ছেলেকে রজম করা হবে। আমি এজন্য একশত বকরী ও একটি ছাগল ছানা ফিদিয়া হিসেবে দিতে চাই। আর আমি আলেমদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমাকে জানালেন যে, তার জন্য একশত বেত্রাঘাত ও এক বছর নির্বাসন, আর এ মহিলার জন্য রজম নির্ধারিত শাস্তি। মহানবী এতদ্ শ্রবণে বললেন, আল্লাহ্ পাকের শপথ করে বলছি, যার কুদরতি হাতে রয়েছে আমার জীবন। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কিতাব দ্বারা ফয়সালা করব, বকরী ও ছাগল ছানা বাতিল করা হল। তোমার ছেলের উপর একশত বেত্রাঘাত ও এক বছর নির্বাসন। হে উনাইছ! তুমি সকালে এ মহিলার নিকট যাবে যদি সে যিনার কথা স্বীকার করে, তাহলে তাকে রজম করবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে সকালে মহিলার নিকট গেল। আর মহিলা যিনার কথা স্বীকার করল, তাই রাসূল (স.) এর নির্দেশ মত তাকে রজম করা হল।[২৫]

রাসূল থেকে বর্ণিত,

وروي سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جائته امرأة من غامد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري ربك وتولي إليه فقالت أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذالك قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حبلى من الزنا قال انت، قالت : نعم، فقال لها حتى تصعى تصعى ما في بطنك قال، فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال : بها النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت الغامدية فقال إذن لا ترجمها حتى يستغنى عنها ولدها فقال قد وضعت الغامدية فقال إذن لا ترجمها حتى يستغنى عنها ولدها فقال رجل من الأنصار فقال إلى أعالية يا رسول الله قال فرجمها.

হযরত সুলাইমান বিন বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, গামিদ সম্প্রদায় থেকে একজন মহিলা রাসূল (স.)এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে পবিত্র করুন। রাসূল (স.) বললেন, তোমার জন্য আফসোস, তুমি ফিরে গিয়ে তোমার প্রভূর নিকট ক্ষমা চাও ও তাঁর নিকট তওবা কর। মহিলাটি বলল, আপনি আমাকে দিয়ে বারবার কথা বলাবেন, যেমন মায়েজ বিন মালিককে দিয়ে বারবার কথা বলিয়েছেন। রাসূল (স.) বললেন, তা কি? স্ত্রী লোকটি আল্লাহর রাসূলকে (স.) জানালো যে, সে যিনা দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে। রাসূল (স.) জিজ্ঞাসা

Dhaka University Institutional Repository

করলেন, তুমি? সে বললো-হ্যাঁ। হুজুর (স.)তাকে বললেন, তোমার পেটে যে সন্তান আছে তা প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল (স.) ঐ মহিলাকে বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত একজন আনসারের জিম্মাদারীতে থাকতে দিলেন। সে আনসারী প্রসবের পর ঐ মহিলাকে নিয়ে রাসুল (স.) এর দরবারে এসে বললেন গামেদিয়াহ তো বাচ্চা প্রসব করেছে। রাসুল (স.) বললেন, এখন তাকে তুমি রজম কর না, যতক্ষণ না তার বাচ্চা তার মুখাপেক্ষী না থাকে। অতঃপর (দুধ ছেড়ে দেয়ার পর) আনসারী ব্যক্তি এসে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (স.), সে তো আমার নিকট পরিবারের মালিক হয়েছে। রাসুল (স.) বললেন তাকে রজম কর।'[২৬]

আর সাক্ষীদের সংখ্যা চার হতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

'আর যারা সতী সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না। তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে।'[২৭] আর সাক্ষীদেরকে পুরুষ হতে হবে, যিনা ব্যাভিচারে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

যারা ব্যাভিচারিনী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর।[২৮] আমর বিন হাজম বলেন, যিনার সাক্ষ্যের ব্যাপারে দু'জন মুসলমান নারী একজন পুরুষের সমান হিসেবে গ্রহনযোগ্য হবে। যেমনঃ তিনজন পুরুষ দুজন মহিলা অথবা দু'জন পুরুষ ও চারজন মহিলা, অথবা একজন পুরুষ ও ছয়জন মহিলা, অথবা আটজন মহিলা যাদের সাথে পুরুষ থাকবে না।

ইসলামী আইন বিদগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, সমকামিতা গর্হিত ও অশ্লীলতার অন্যতম। তা মহাপাপ এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

'এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি।' [২৯]

অবিবাহিতের শাস্তির বিধান (Laws of Punishment of the Unmarried): ইসলামী আইনবিদগণ অবিবাহিতের যিনার শাস্তি একশত বেত্রাঘাতের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তারা আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা দলীল পেশ করেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ

অর্থাৎ ব্যাভিচারিনী নারী ব্যাভিচারী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর।[৩০]

বিবাহিতের শাস্তি বিধান (Lows of punishment of the married):

ইসলামী আইন বিশারদবর্গের অধিকাংশ মতে বিবাহিত যিনাকারীদের শাস্তি "রজম" প্রস্ত রাঘাতে হত্যা হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে খারেজী সম্প্রদায় ভিন্নমত পোষণ করে বলেন বিবাহিতদের শাস্তিও একশত বেত্রাঘাত। কেননা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই। তাদের মতে আয়াতখানা সার্বিক। অনুরূপভাবে বাণী ও কর্ম সম্পন্ন সুন্নাহ দ্বারাও একই সময়ে মহানবী (স.) থেকে বিবাহিত পুরুষ ও মহিলার শাস্তি রজম- এটা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে ইসলামী আইনবিদ ফকীহগণ দাস-দাসীর শাস্তি অর্ধেক হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষন করেছেন। কেননা এ সম্পর্কে আল-কুর'আনের ভাষ্য সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

'অতঃপর যখন তারা (দাসদাসী) বিবাহ বন্ধনে এসে যায়। তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে; তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে।'[৩১]

সমকামিতার শাস্তি :

ইসলামী আইনবিদগণের মধ্য থেকে ইমাম আবু হানিফা (রা.) এর অগ্রণী মতামত ও শাফেরী আইনবিদদের একটি মতানুসারে সমকামিতা এমন অপরাধ, যার জন্য তা'যীরী শাস্তি যথাযথ।

ইমাম শাফেরী ও হাম্বলী (র.) এবং হানাফী আইনবিদগণের মধ্য থেকে আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও তাহাভী (র.) এর মতে সমকামিতা যিনার মতই অপরাধ। তাই তার শাস্তি ও যিনার মত। বিবাহিতদের ক্ষেত্রে রজম এবং অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত ও নির্বাসন। [৩২] মালেকী মাযহাবের আইনবিদগণের আদি মতে, এবং শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আইনবিদগণের এক বর্ণনা মতে সমকামিতা যিনা। তাদের মতে বিবাহিতের দন্ডই সমকামিতার শাস্তি। আবার কারো মতে, সমকামী বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত হোক,তার শাস্তি হবে হত্যা। তবে এর বৈশিষ্ট্য মত পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা তাদের অভিমতের পক্ষে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। রাসুল (স.) বলেছেন,

من وجدتموه بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.

Dhaka University Institutional Repository

'যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে হযরত লুত (আ:) এর সম্প্রদায়ের কর্ম করতে পাও তবে কর্তা ও যার সাথে কর্ম সম্পাদিত হয় উভয়কে হত্যা কর।'[৩৩]

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন,

'তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে তবে তাদের থেকে তা গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী দয়ালু।'[৩৪]

ব্যভিচারের শাস্তির যৌক্তিকতা :

অবশ্যই ইসলামী শরী'আহ আইন চরিত্র, ইজ্জত ও বংশের প্রতিটি বিষয়কে সংমিশ্রণ থেকে রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। ইসলামী শরী'আহ মানুষের নিরঙ্কুশ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে, যাতে তাকে কোন কলুষতা গ্রাস না করতে পারে। এ জন্য তা মানুষের কামনা পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেয়, যাতে আইনের সামনে সে দূর্বল হয়ে না পড়ে। আর মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাপনাই ইসলামী শরী'আহ অনুমোদন করে যাতে প্রতিটি ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন সংরক্ষিত হয়। আর তা হল বৈধ বিবাহ ব্যবস্থা। ইসলামী শরী'আহ মানুষ বালেগ হয়ে যখন থেকে সম্ভ্রম রক্ষায় ভীত হয়ে পড়ে তখনই তাকে বিবাহ করা অপরিহার্য করে দেয়। কেননা তাকে হতে হবে পুত ও পবিত্রতার অধিকারী। যেহেতু বিবাহ চক্ষু নিম্নগামী ও যৌনাঙ্গের হিফাজতের দায়িত্ব বহন করে, ফলে সে তার ব্যক্তি সত্তাকে ফেৎনার কিংবা এমন বস্তুর দিকে ঠেলে দেয় না। যার জন্য সে শাস্তি ব্যয় করে জড়িয়ে পড়বে। আর যখন সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, তার স্বকীয়তা ও কামনার আকাংখা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে বিবেক ও সংকল্পকে ধরে রাখতে পারে না। তাই তার এ রিপুকে শাস্তি প্রদানের লক্ষে শরী'আহ একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসনের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। যদি রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাসন ভাল মনে করেন, তাহলে তাকে তা'যীরী শাস্তিও দিতে পারেন। অথবা এ শাস্তি হালকা করার ব্যাপারে স্বাধীন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা হয়। যদি সে বিবাহ করতে বিলম্ব করে, তাহলে সে যৌন অপরাধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। [৩৫] আর যদি সে বিবাহ করে তাহলে তার কোন ওজর আপত্তি থাকে না, আর তার জন্য কেউ সুপারিশও করতে পারবে না যাতে শাস্তি লাঘব করা হয়।

বিবাহ এ অপরাধের দিকে প্রত্যেক গমনের রুদ্ধ করে দেয়। ইসলামী আইন বিবাহিত নারী ও পুরুষের জন্য হালালের সকল দরজা খুলে দিয়েছে। আরো যত প্রশস্ততা সম্ভ্রম তা ও খুলে দিবে আর হারামের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বিবেকও প্রকৃতিগতভাবে অপরাধের দিকে আহবান করার

Dhaka University Institutional Repository

সকল বাহনগুলো নিঃশেষ করে দিয়েছে। [৩৬] শাহ আলীউল্লাহ (র.) বলেনঃ বিবাহিতকে ফেরাতে রজম ও অবিবাহিতকে বেত্রাঘাতই হদ। যেহেতু বালেগ হওয়ার সাথে দায়িত্বশীলতা পূর্ণতা লাভ করে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক পূর্ণতা লাভ করে না। অবশ্য অবিবাহিতের একশত বেত্রাঘাত শাস্তি নির্ধারণ প্রভৃত পরিমান হুমকি ও খবরদারীর জন্য করা হয়েছে।

১। যেহেতু যিনা ব্যভিচার মারাত্মক ব্যাধি প্রসারে সরাসরি কারণ, যা শরীরকে লন্ড ভন্ড করে দেয়। এ ব্যধিগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা থেকে সন্তানের মাধ্যমে অধস্তদের মাঝে বিস্তার লাভ করে। এ ব্যাধির মধ্যে বিষক্রিয়া, প্রমেহ ও গনোরিয়াহ অন্যতম।

২। যিনা গৃহের শৃংখলা নষ্ট করে দেয়। পরিবারের অস্তিত্ব বিনষ্ট করে। পারিবারিক দাম্পত্য সম্পর্ক নস্যাৎ করে দেয়।

৩। যিনা বংশ বিনষ্ট করে। ওয়ারিস হওয়া থেকে বাদ দিয়ে অপরকে সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়।

৪। যিনা কখনও কখনও এমন পিতৃহীন বাচ্চা নিয়ে আসে, ফলে পুরুষ অপরের সন্তানকে লালন পালন করতে বাধ্য হয়।

৫। যিনার সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক ,যা সার্বিক সম্পর্ক নয়। এটা পশুসূলভ কর্ম, এটা ভদ্র মানুষকে কলুষিত করে। [৩৭]

৬। শয়তানের অনুসরণ করা হয়, আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে পবিত্র কুর'আনুল কারীমে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরন করো না, যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। [৩৮]

৭। দুনিয়াবী শাস্তি প্রাপ্ত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে যিনাকারী অবিবাহিত হলে তার উপর একশত বেত্রাঘাত প্রয়োগ করা হবে। আর বিবাহিত যিনাকারকে রজম প্রদান করে শাস্তি দেয়া হবে।

৮। পরকালীন শাস্তি অবধারিত থাকে। যিনাকারী নারী পুরুষের জন্য পরকালীন কঠিন শাস্তি রয়েছে, যদি সে তওবা না করে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র না থাকার কারণে ইহকালীন শাস্তি দেয়া হয় না, তবে পরকালে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

৯। উভয়ের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। যিনা মারাত্মক অপরাধ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উভয়ের উপর গজব নাযিল হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১০। সমকামিতা নিষিদ্ধ অশ্লীল কর্ম। তা কবিরা গুনাহ তাই এর জন্য তা'যীরী তথা রাষ্ট্রীয় দন্ডবিধি রয়েছে। একে হারাম করার মধ্যে তাত্ত্বিক দর্শন ও গভীর হিকমত রয়েছে।[৩৯]

১১। যিনা ব্যভিচার দ্বারা যে সকল রোগ ব্যাধির জন্ম হয়, সমকামীতার দ্বারাও ঐ ধরনের রোগব্যধি বিস্তার লাভ করে। আর তাদের ক্ষতি সাধনে চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে। তাদের শরীরগুলো রোগাগ্রস্ত ও তাদের আত্মাসমূহকে কেটে ফেলে।[৪০]

উল্লেখিত ক্ষতি ও বিপর্যয় রোধে আল্লাহ তা'আলা যিনা ব্যভিচার ও সমকামীতাকে হারাম করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। মানুষকে অশ্লীলতা থেকে হিফাজত করেছেন। অনুরূপভাবে তাদের বংশ, মানসম্মান, স্বাস্থ্য সর্বোপরি তাদের ঈমান হিফাজত করেছে না।[৪১]

মানব জীবন সংরক্ষণ:

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে রাষ্ট্রের শান্তি শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। তাই শরী'আহ আইন অপরাধ ও শাস্তির শ্রেণীবিন্যাসে একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। ইসলামী শরী'আহ কয়েকটি অপরাধ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছে এবং এসব অপরাধের শাস্তিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। উল্লেখিত অপরাধ ও শাস্তি সমূহের কোনটাকে ইসলামী আইনে বলা হয় হদ আবার কোনটাকে বলা হয় 'ক্বিসাস'।

ইসলামী শরী'আহ আইন কিসাসের বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে মানুব জীবনের সার্বিক নিরাপত্তা সংরক্ষণ করেছে। অপরদিকে 'হদ' এর বিধান প্রয়োগ করে সামাজিক শৃংখলা ও নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করেছে। হত্যা একটি জঘন্যতম অপরাধ। বিশেষতঃ নরহত্যা মারাত্মক মানবতা বিধ্বংসী অপরাধগুলোর অন্যতম। যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করে সে গোটা মানব জাতিকে হত্যা করার দায়ে দায়ী। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً.

'যে কেহ প্রাণের বিনিময় প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে।' [৪২]

ইসলামী আইনে মহান স্রষ্টা মানুব হত্যার বৈধতা ও অবৈধতা সুনির্দিষ্ট করার সাথে সাথে এর শাস্তিও সুনির্দিষ্টভাবে নিধারণ করে দিয়েছেন। ইসলামী আইনবিদগণের জন্য গবেষণা করে কিয়াসের মাধ্যমে বিধান প্রণয়নের অবকাশ রাখেননি। আল্লাহ নিজেই বিধান রচনা করেন এবং তাঁর মহান তত্ব ও হিকমত বর্ণনা করে পবিত্র কুরআনুল কারীম বলেন,

ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون.

Dhaka University Institutional Repository

'হে বুদ্ধিমানগণ। কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে যাতে তোমরা সাবধান হতে পারে।'[৪৩] সুতরাং এটা নি:সন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা হত্যার শাস্তি হিসেবে কিসাসকে উপযুক্ত বিনিময় ব্যবস্থা করেছেন।

মহান আল্লাহ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানকল্পে কিসাসের বিধান দু'ভাবে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত: জীবন হানির দ্বারা কিসাসের বিধান। দ্বিতীয়ত: অঙ্গহানির বিনিময়ে কিসাসের বিধান। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

'আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময় সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ্ থেকে পাক হয়ে যায়। যে সব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালেম'।[৪৪]

উল্লেখিত আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নে হত্যা ও কিসাসের সংজ্ঞা, শ্রেণী বিন্যাস, প্রমাণ এবং যৌক্তিকতা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

হত্যা ও কিসাসের সংজ্ঞা :

আরবী ভাষায় হত্যার প্রতিশব্দ হল 'কূদ'। যার আভিধানিক অর্থ কর্তন করা, দূরীভূত করা। এমনি ভাবে 'কাস্সা' শব্দের শাব্দিক অর্থ হল 'কর্তন করা', বিচ্ছিন্ন করা, অনুসরণ করা। এই শব্দ থেকেই কিসাস শব্দের উৎপত্তি। ইসলামী আইনে এর অর্থ কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষত, অঙ্গহানি কিংবা মৃত্যুর কারণে অপরাধীকেও শাস্তিস্বরূপ ক্ষত সৃষ্টি করা, অঙ্গহানি কিংবা হত্যা করা।[৪৫]

ইংরেজীতে হত্যাকে বলা হয় মার্ডার (Murder). Murder means unlawful killing of a human being, Internationally commited is Murder.

উদ্দেশ্য প্রণোদিত বেআইনীভাবে উত্তেজনার বশীভূত হয়ে মানুষের জীবন সংহার করাকে মার্ডার (হত্যা) বলা হয়।[৪৬]

ইসলামী আইনে হত্যা :

হত্যা এমন একটি কর্ম যা মানুষের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয় এবং যা দ্বারা জীবনাবসান হয়। অর্থাৎ একজন মানুষের প্রাণ অন্য মানুষের কর্ম দ্বারা চলে যাওয়াকে হত্যা বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে রুশ কূদ-শব্দের পরিবর্তে জিনায়াত শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর তা তিন প্রকার: শরীর সমূহের জিনায়াত, জীবন নাশের জিনায়াত ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ সমূহের জিনায়াত। যাকে হত্যা ও জখম বলা হয়।

ইবনে হুম্মাম (র.) বলেন, ইসলামী আইনের পরিভাষায় বিশেষ করে অবৈধ কর্ম দ্বারা মানুষ হত্যা ও অঙ্গহানিকে জিনায়াত বলে। প্রথমটিকে হত্যা বলেও অভিহিত করা হয়। আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় কর্তন।[৪৭]

ফকীহগণ কিসাসের সংজ্ঞায় বলেছেন, কিসাস হলো কোন ব্যক্তির হক্ব বিনষ্টের পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান যা ওয়াজিব। হদ ও কিসাসের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। শাস্তি সুনির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে হদ ও কিসাসের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য হল, 'হদ' এর এমন কোন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্যায় নেই যে, উভয়ের মধ্যবর্তী আরো বিভিন্ন পর্যায় থাকবে। কিন্তু কোন মানুষের হক বিনষ্টের কারণে যে কিসাস ওয়াজিব হয় এর মধ্যে এই অবকাশ আছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত বা মৃত ব্যাক্তির উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করলে খুনের ক্ষতিপূরণ না চেয়ে ক্ষমা করে দিতে পারে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ও অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারে। এমতাবস্থায় শাস্তি রহিত হয়ে যাবে কিন্তু 'হদ' কারো পক্ষে রহিত করা সম্ভব নয়।

শামছুদ্দীন রামলী (র.) বলেন :

القصاص أن يفعل به مثلها فعل مستواء كان قتلاً أو جرماً أو قطعاً أو صبراً.

'কিসাস হল হত্যার অনুরূপ কাজ করা। চাই সেটা হত্যা হোক কিংবা জখম হোক কিংবা কর্তন করা কিংবা মারধর হোক।' 'তিনি আরো বলেন যে, 'ইসলামী আইনবিদদের পরিভাষায় কিসাস হল হত্যাকারীকে তার কৃত অপরাধীকে অপরাধের অনুরূপ শাস্তি দেয়া।'[৪৮]

যে সব অপরাধে আল্লাহ তা'আলা কিসাস আবশ্যক করেছেন, এসবের মধ্যে ইচ্ছাকৃত নরহত্যা ও কোন মানুষের দৈহিক ক্ষতি সাধন অন্তর্ভূক্ত।

সুতরাং হত্যার শাস্তি হবে কিসাস, যা শরী'আতের বিধান কর্তৃক নির্ধারিত।

হত্যা দু'প্রকার হতে পারে, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশত। কিসাস শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস প্রযোজ্য নয়। যেমন ক্রিকেটের বল খেলোয়াড়ের গায়ে পড়ে অথবা 'ফুটবল মাঠে বল পড়ে যদি কেউ মারা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিসাস প্রযোজ্য হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

রক্তপণ (দিয়াত) এর শাস্তি বিধান :

ইসলামী শরী'আহ আইন কিসাস এর বিধান ব্যতিরেকে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত তথা ক্ষতিপূরণ রক্তপণ খুনী ব্যক্তির উপর অপরিহার্য করে দেন যা তার খুন করা বা খুনের চেয়ে কম কোন অপরাধের কারণে প্রযোজ্য হয়। এ দিয়াত প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলেন,

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا، ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة غلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.

'মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে, কিন্তু ভুলক্রমে যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সম্পর্ন করবে তার স্বজনদেরকে, কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অত:পর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় তবে রক্ত বিনিময় সর্ম্পন করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ্ মাফ করানোর জন্যে উপযুপরি দুই মাস রোযা রাখবেন। আল্লাহ্ মহানজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।'[৪৯]

রাসূল(স:) এর সুন্নাত দ্বারাও দিয়াত এর বিষয়টি প্রমাণিত। যার মাধ্যমে নিহতের পরিবার তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে বিশেষ ভাবে উপকার লাভ করতে পারে। মুক্তিপন তথা দিয়াত প্রসঙ্গে মহানবী মুহাম্মদ(স:) বলেন,

في نفس المؤمن مائة من الإبل.

'মু'মিনের জীবন হাসিতে একশত উট ' ইমাম মালেক ও ইমাম নাছায়ী (র:) বর্ণনা করেন।[৫০] যা ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত।

দিয়াত রক্তপণের পরিমাণ **(Quantity of price blood)** :

দিয়াতের ছয় শ্রেণীর বস্তু দ্বারা দিয়াত আদায় করার বিধান রয়েছে। একশত উট, এক হাজার স্বর্নমূদ্রা-দিনার, দশ হাজার রৌপ্যমূদ্রা-দিরহাম, কিংবা বার হাজার রৌপ্য মূদ্রা- দিরহাম, দুইশত গাভী, এক হাজার বকরী, একশত দুম্বা এ বিষয়ে আবু ইউসুফ (র.) মুহাম্মদ (স:) ও সাতজন ফকীহর নিকট এরূপ বিধান স্বীকৃত।[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু হনিফা (র:) ইমাম মালেক (র:) ও ইমাম শাফেয়ী (র:) এর নিকট তিন শ্রেণীর বস্তু দ্বারা দিয়াত আদায় করা যায়। একশত উট, এক হাজার স্বর্ণের দিনার, দশ হাজার রৌপ্য মূদ্রা-দিরহাম, কিংবা বার হাজার রৌপ্য মূদ্রা-দিরহাম। তাঁরা এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, দিয়াত উট কিংবা স্বর্ণ-কিংবা রৌপ্য ব্যতিরেকে গ্রহন করা যাবে না।[৫২]

অঙ্গহানির বিধান (Laws of Injured parts of body):

মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলো বিভিন্ন উপকার কিংবা পূর্ণতার দাবী রাখে, আর এই দিক বিবেচনার মাধ্যমে দিয়াতের পরিমাণও কম বেশী হয়ে থাকে। এ ধরনের অপরাধ সংঘঠিত হওয়ার দু'ধরনের কারণ থাকতে পারে। এক: ইচ্ছাকৃত দুই: অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশত। যদি ইচ্ছাকৃত হয় তাহলে এর জন্য সম্পর্ণ দায়ভার ব্যক্তির উপর বর্তাবে। অতএব সে ক্ষেত্রে ব্যক্তির শাস্তি ও কঠোর হবে। আর অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান সহজ হবে। কেননা এটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। যদি আঘাত ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে এবং এর কিসাস নেয়া সম্ভব হয়, তাহলে কিসাস ছাড়া অন্য বিধান কার্যকর করা যাবে না। কেননা ইসলামে একই সঙ্গে দু'টি বিধান কার্যকর করার মাধ্যমে তাকে অসহায় বোধ হতে বাধ্য করে না। তবে যদি কেউ কিসাসের অধিকার ক্ষমা করে দিন, তাহলে দিয়াতের মাধ্যমে তা কিসাসের অধিকার ক্ষমা করে দেয়া, তাহলে দিয়াতের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে। আর 'অঙ্গহানীর' বিধান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن الأذن والسن بالسن والجروح قصاص.

' আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম।'[৫৩]

ফলে ইসলামে ইচ্ছাকৃত আঘাতের জন্য কঠিন ও কঠোর দিয়াতের বিধান রয়েছে। তবে ভূলবশতঃ আঘাতের জন্য হালকা দিয়াতের ব্যবস্থা রয়েছে। যখন আঘাত একাধিক হয়, আর একটি অপরটি থেকে পৃথক হয়, দিয়াতও একাধিক প্রকারের হবে। তবে এই দিয়াতের পরিমাণ কোন অবস্থাতেই জীবন ধ্বংসের ন্যায় দিয়াতের চেয়ে বেশী হবে না।

হত্যার শাস্তি হিসাবে কাফ্ফারা, মিরাছ এবং অছিয়াত থেকে বঞ্চিত করা :

কাসাস যোগ্য অপরাধ যেমন ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং মানুষের দৈহিক অঙ্গের ক্ষতিসাধন, তবে কেউ যদি কিসাসের অধিকার ক্ষমা করে দেয়, তাতে দিয়াত ওয়াজিব হয়ে থাকে। তবে বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

কিছু ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ভাষ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র দিয়াত এবং কাফ্ফারা বা শুধুমাত্র কাফ্ফারাকে শাস্তি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليماً حكيماً.

' মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে, কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলকমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সম্পর্ণ করবে তার স্বজনদেরকে, কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সম্পর্ন করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ মাফ করনের জন্য উপযুপরি দুই মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।'[৫৪]

তেমনিভাবে হত্যাকান্ডের হত্যাকারীর জন্য আরেক বেদনাদায়ক পার্থিব শাস্তি হল তাকে তার মীরাছ বা উত্তরাধীকারী হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) এর বাণী হল, 'হত্যাকারীর জন্য মীরাছের কোন কিছুই নেই।'[৫৫]

ইসলামী আইনবিদগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, যেসকল হত্যা শত্রুতামূলক এবং ইচ্ছাকৃত এর দ্বারা ব্যক্তি মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে। তবে সে সকল হত্যার কিসাসের দায়ে দন্ডিত নয় এ সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি মিরাছ এর অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী আইনবিদদের মতভেদ বিদ্যমান।

মোটকথা হত্যাকারী ব্যক্তি যদিও হত্যাকৃত ব্যক্তি থেকে মিরাছ পায় এবং অছিয়াতের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় তথাপিও মহান আল্লাহ তাকে অছিয়াত থেকে বঞ্চিত করেছেন। কেননা ইসলামী আইনবিদগণ বলেন যে, হত্যাকারী যখন তাড়াতাড়ি তার মৃত্যুর ইচ্ছা পোষণ করেছে, যা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিন্তা, তাই তাকে এই লোভের মত অসৎ কার্যের কারণে অছিয়াত এবং মিরাছ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

হত্যা আইনের যৌক্তিকতা :

ইসলামী শরী'আত মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি পরিপূর্ণ শরী'আত। যা দ্বারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করেছেন। আর তার এই বিধান কিয়ামত পর্যন্ত চিরন্তন

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে। ইসলাম হল ন্যায় প্রতিষ্ঠার ধর্ম। ইসলামী উম্মাহকে মধ্যমপন্থী তথা উত্তম ও ন্যায়পরায়ণ উম্মাহ হিসেবে কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, মহান আল্লাহ তার প্রতিষ্ঠিত দ্বীন আল-ইসলাম এর বিধানাবলীর মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। আল্লাহ তা'আলা হত্যার শাস্তির যৌক্তিকতা হিসেবে একটি উপযুক্ত বিনিময় শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। ইসলামী আইনবিদগণের জন্য গবেষণা করে কিসাসের বিধান করার অবকাশ রাখেননি, বরং এর হিকমতকে একটি আয়াতে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে বিজ্ঞজনদের লক্ষ্য করে বর্ণনা করেছেন। যাতে করে তারা আয়াত গ্রহণে সর্তকতা অবলম্বন করে এর চাহিদা মোতাবেক আমল করে। যার ফলে শান্তি ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের হানাহানি বন্ধ হয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ করেন।

ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون.

'হে বুদ্ধিমানগণ, কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।'[৫৬]

মহান আল্লাহ এ বিধানের নির্দেশ প্রদান করে সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধে একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছেন যাতে মানুষের জীবনের নিশ্চিত হয়।

কিসাসের বিধান সামাজিক পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান, পারিবারিক ক্রোধের মূলোৎপাটন, রক্তপাত কম ঘটানো, নিরপরাধ লোকদিগকে হত্যা না করা দৃষ্টান্তও উপদেশ গ্রহন করা সর্বোপরি তাকওয়া এবং পরকালীন শাস্তি ভীতি প্রদর্শনের জন্য কার্যকর করা হয়েছে।

নিম্নে কুরআন ও হাদীসের উল্লেখ পূর্বক কিসাস এর কতিপয় যৌক্তিকতা তুলে ধরা হল।

১. **কিসাস একটি আদি বিধান :** পূর্ববর্তী উম্মতদের শরী'আতেও কিসাসের বিধান প্রচলিত ছিল। সে জন্য আন্ত:রাষ্ট্রীয় আইনে এর প্রভাব বিরাজমান। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণীটি প্রনিধানযোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.

'আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম।'[৫৭]

এখানে 'ফিহা' বলতে তাওয়াত কিতাবের কথা বলা হয়েছে, আর ইসলামী উম্মার নিকট এই বিধান কার্যকর হওয়ায় পূর্ববর্তী বিধানসমূহের মত একটি উত্তম বিধান হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. **জীবনের নিশ্চয়তা :** আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে বলেন,

وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلبَابِ

' হে বুদ্ধিমানগণ; কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।'[৫৮]

হত্যার পরিবর্তে হত্যা অঙ্গহানীর পরিবর্তে এর মাধ্যমে হত্যা অপরাধগুলো কমে যাওয়াতে ' কিসাসে জীবন' হিসেবে প্রমাণিত।

৩. **ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা :** মানব সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য কিসাসের বিধান প্রচলন করা হয়েছে। মানব জাতির নিকট তার জীবন সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সে যখন বুঝতে পারে অন্যের জীবন নাশ করলে তাকে সে পরিণতি ভোগ করতে হবে তখন হত্যার ন্যায় জঘন্য কর্ম থেকে সে বেঁচে থাকে।

৪. **পারিবারিক ক্রোধের মূলোৎপাটন :** হত্যাকারী যখন নিরপরাধ লোককে হত্যা করে, তখন হত্যাকৃত ব্যক্তির পরিবারে হত্যাকারী এবং তার আত্মীয়স্বজন সকলের বিরুদ্ধে ক্রোধের দাবানল জ্বলে উঠে, ফলে প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিসাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পারিবারিক ক্রোধের মূলোৎপাটন হয় এবং তাদের অন্তকরণ প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে মুক্তি পায়। এতে সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

এছাড়াও ইসলামে রক্তপণ, কাফ্ফরা এবং মিরাছ ও অছিয়াত থেকে বঞ্চিত করা হয় এর যৌক্তিকতাও যথেষ্ট প্রমাণিত। হত্যাকান্ডের কাফ্ফারা জনিত শাস্তি হল-গোলম আযাদ করা। যেহেতু কোন মুসলমান হত্যা হওয়ার কারণে তাদের দলের একজন কমে গেল, আর গোলাম আযাদ করার মাধ্যমে একজন মু'মিনকে প্রকৃত জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়, এর মাধ্যমেই কমে যাওয়ার বিনিময় প্রদান করা হয়ে থাকে।

অপরদিকে সে যদি মুমিন গোলাম না পায় তাহলে সে তার মূল্য পরিশোধ করবে আর এই মূল্য সাদকা হিসেবে ব্যয় করা হবে। এতে মুসলিম সমাজ উপকৃত হবে। যেহেতু গোলাম আযাদ করার জন্য সদকা এর বিধান পবিত্র কুর'আনে বিদ্যমান আছে, এর প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Dhaka University Institutional Repository

'যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারীও যাদের চিত্ত আকর্ষন প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্য ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদ কারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে।'[৫৯]

অনুরূপভাবে হত্যাকারী হত্যাকৃত ব্যক্তির মিরাছ থেকে এবং অছিয়াত থেকে বঞ্চিত হবে এটা ও যথেষ্ট যৌক্তিকতার দাবী রাখে যে একজন ব্যক্তি যখন তার আত্মীয় বা নিকট জনের জীবনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হল এবং তাকে হত্যা করল তাতে কি করে সে ঐ হত্যাকৃত ব্যক্তির মিরাছের মালিক হবে। এতে করে ওয়ারিশগণ কিংবা অছিয়াত কারীর নিকটস্থ ও দূরবর্তী কেউই কখনো তাকে হত্যা করার চিন্তাও করবে না। এতে বিচারকও এই রায় দিবেন যে হত্যাকারী তার হত্যাকৃত ব্যক্তি থেকে মিরাছ কিংবা অছিয়াত দ্বারা অতি তাড়াতাড়ি লাভমান হওয়ার জন্য এই কার্যসিদ্ধ করেছে। তাই তাকে এর থেকে বঞ্চিত করা হল। সর্বোপরি মহানুভবতা ও মানবতা বোধের কারণে কিসাস থেকে ক্ষমা করে দেয়ার বিধানও ইসলামী শরী'আতে বিদ্যমান।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন এবং বাক স্বাধীনতা :

ইসলামী শরী'আত এমন কোন বিষয়ের পক্ষপাতি নয়, যার মাধ্যমে মানুষের সামন্যতম ক্ষতি সাধন হয় এবং তাদের অধিকার হরণ হয়। মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে নূন্যতম আকল বা জ্ঞানের অধিকারী করেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন যাতে করে তারা মহান আল্লাহকে চিনতে পারে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

'তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।' [৬০]

আর এই আক্বল তথা জ্ঞানের যথাযথ বিবেচনা এবং বিকাশের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি তার মহান স্রষ্টাকে চিনতে পারে। আর যদি সে তার গোঁড়ামী বা মূর্খতার কারণে আল্লাহর দ্বীনকে এবং আল্লাহকে চিনতে না পারে তাহলে এর দায়টুকু ব্যক্তির নিজের উপরেই বর্তাবে। আর এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

Dhaka University Institutional Repository

'তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরাই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই।'[৬১]

মহান আল্লাহ প্রদত্ত এই জ্ঞানের গুরুত্ব অপরীসীম। মানুষের عقل বা জ্ঞান লোপ পেলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির যথাযথ বিকাশ ঘটে না। আবার একথাও উল্লেখ্য যে, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত না করলে ধ্বংসের অতল গহবরে পৌঁছা অনিবার্য। তাই বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশের মাধ্যমে মানুষ তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। আর এই বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে মানুষ নিজেদের তৈরী বিভিন্ন রকম চেতনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে আর এই চেতনার মাধ্যমে যে যার অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছতে চেষ্টা করে। আর এই চেতনা যদি কুরআন হাদীস বিমুখ হয়ে শুধুমাত্র নিজেদের তৈরি মুক্তবুদ্ধি সংশ্লিষ্ট হয় তা হয় সমাজ বিধ্বংসী এবং বিপদজনক। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের নিজেদের চিন্তা প্রসূত সমকামিতাকে আইনে পরিণত করে নিজেদেরকে ধ্বংসের নিকটবর্তী করে দিয়ে এবং বিশ্ব সভ্যতাকেও একটি চ্যালেঞ্জের মুখে পতিত করেছে। মানুষের এই নৈতিক অধ:পতনটাকে তাদের নিজেদের মূর্খতার বহিঃপ্রকাশ বলে পবিত্র কুরআনুল করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

'স্মরণ কর লুতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ! তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়।'[৬২] আর এ কারণেই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বব্যাপী এক অপ্রতিরোধ্য মরণ ব্যধি-এইড্স এর প্রসার। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে আক্বল তথা সুস্থ্য বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও মুক্ত চিন্তার পরিবেশ ও মহান আরৱাহ নিশ্চিত করেছেন। মানুষ স্বাধীনভাবে তার মত প্রকাশ করার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ মানব জাতির জন্য নিম্নরূপ স্বাধীনতাগুলো নিশ্চিত করেছেন।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষণ :

ইসলামী শরী'আহ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনের পাশাপাশি মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার লাভের অধিকার, পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার অধিকার, সংগঠন ও সভা সমাবেশ করার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানসহ ইসলামী শরী'আতে এমন কোন খুঁটিনাটি দিক নেই যা বর্ণনা এবং স্পষ্ট ব্যাখ্যা ইসলামী শরী'আত করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্রে কোন নাগরিকের অপরাধ আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটক করা যায় না। শুধুমাত্র সন্দেহ ও অনুমান বশতঃ লোকদের গ্রেফতার করা কিংবা আদালতের বিচার ব্যবস্থা কার্যকর করা ব্যতিরেকে কাউকে কারারুদ্ধ করা ইসলামী আইনে সিদ্ধ নয়। বর্তমানে নযরবন্দী শিরোনামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যা কিছু হচ্ছে ইসলামী আইনে কস্মিনকালেও তার কোন অবকাশ ছিল না। কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশ, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, কোন সাধারণ শাসক তো দূরের কথা খোদ আল্লাহর রাসূল ও তার খর্ব করতে পারেন না। মহান আল্লাহ বলেন -

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

'কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও। এটা সম্ভব নয়, বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।'[৬৩]

মত প্রকাশের স্বাধীনতা :

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ কেবলমাত্র শাসকদের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাক যুদ্ধই করবে না, বরং রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহ ও সমস্যাবলী সম্পর্কেও তারা স্বাধীন মত ব্যক্ত করবে। মু'মিনদের গুণাবলী প্রসংগে কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছেঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।'[৬৪]

কোন এক যুদ্ধে মহানবী (স.) মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন, অমুক অমুক স্থানে অবস্থান নিতে হবে এবং শিবির স্থাপন করতে হবে। একজন সাহাবী জানতে চাইলেন, এই আদেশ কি ওহীর মারফত না আপনার ব্যক্তিগত অভিমত থেকে যিনি বললেন ঃ আমার ব্যক্তিগত অভিমত। সাহাবী আরজ করেন, 'এই স্থান তো উপযোগী নয়, বরং অমুক স্থান অধিকতর সুবিধাজনক হবে। সুতরাং সেই মত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হল।'[৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা :

ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের বিবেক ও ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা রয়েছে। এ ব্যাপারে কুর'আনুল কারীমের সিদ্ধান্ত হচ্ছে-

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নি:সন্দেহে হেদায়েত গোমরাহী থেকে হয়ে গেছে।'[৬৬] সত্য পথ তো তাই যার দিকে ইসলাম মানবজাতিকে আহবান জানাচ্ছে এবং সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরাপনের জন্য ভ্রান্ত ধারণা সমূহকে ছাঁটাই করে পৃথক করে দিয়েছে। এখন আল্লাহর অভিপ্রায় ও মুসলমানদের প্রচেষ্টা তো এটাই যে, সারা বিশ্বে যেন ইসলামের সত্যের আহবানকে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু এই ব্যাপারে কারও উপবল প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। যার মনে চায় তা যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রহণ করবে এবং যার মনে চাইবে না তাকে তা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। কুরআনুল কারীম মানব গোষ্ঠীকে জন্মগত ভাবে সমান মর্যাকায় অভিযুক্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

'হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্র বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাদিক পরহেযগার ।'[৬৭]

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে মানব সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে নবী রাসূলগণের প্রেরণ। আসমানী কিতাব সমূহের অবতরণ এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

'আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুব ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।'[৬৮]

ইসলাম তার রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে বসাবাসকারী নাগরিকদের এই অধিকার দিয়েছে যে, তারা এমন আদেশ অমান্য করতে পারবে যা পালন করলে পাপাচারে লিপ্ত হতে হয়। এই ধরনের আনুগত্যে অস্বীকৃতি ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ নয়, বরং এই ধরণের নির্দেশ পালন অপবাধ

Dhaka University Institutional Repository

কার্যে সাহায্য করার শামিল। কেননা পাপাচারের নির্দেশদাতা খোদ সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে। তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যেতে পারে। আদালত কেবল আনুগত্য অস্বীকৃতিকারীকে আইনগত নিরাপত্তা বিধায় করবে না, বরং পাপাচারের নির্দেশ দাতার যথোপযুক্ত শাস্তিরও ব্যবস্থা করবে। এই প্রসঙ্গে নিম্ন লিখিত হাদীসখানা প্রণিধানযোগ্য সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীতে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।[৬৯]

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমর বিলমা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার' (ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ) এর মৌলিক শর্তের অধীনে নাগরিকগণ 'সংগঠন' কায়েম ও সভা সমাবেশ করার অধিকার লাভ করবে। কুর'আন মজীদে মুসলিম জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এই একটি আয়াতেই পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনাবে।'[৭০]

ইসলামে খিলাফত (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া) যেহেতু কোন বিশেষ ব্যক্তি, দল, বংশ, গোত্র কিংবা শ্রেণীকে নয়, বরং সামষ্টিকভাবে গোটা মুসলিম উম্মাহকে দান করা হয়েছে, তাই খলীফাতুল্লাহ। (আল্লাহর প্রতিনিধি) হওয়ার কারণে প্রত্যেক মুসলমানের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে। তাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত নীতিমালা স্থির করেছে।

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

'যারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে ।'[৭১]

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের তার পছন্দ মাফিক যে কোন স্থানে বসবাস করার; রাষ্ট্রীয় সীমানার ভেতরে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের বাইরে যে কোন অঞ্চলে যাতায়াত করার স্বাধীনতা থেকে রয়েছে। কুরআন মজীদে সাধারণ নাগরিকদের তাদের ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করালে চরম অন্যায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের বিশ্বাস ঘাতকতা এবং তাদের অপকর্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে,

Dhaka University Institutional Repository

وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

'তোমাদেরই একদল লোক তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ।'[৭২]

ইসলামী রাষ্ট্রে শ্রমিক, চাষী এবং অন্যান্য শ্রমজীবিকে কেউ বিনা পরিশ্রমিকে খাটাতে পারবে না। তাদের শ্রমের ন্যায়সংগত পারিতোষিক তাদের দিতেই হবে। তাদের আর্থিক কিংবা দৈহিক ক্ষতিপূরণ করতে হবে। সামর্থের বাইরে তাদের উপর কাজের বোঝা চাপানো যাবে না। সর্বোপরি তাদের সাথে সৌজন্য মূলক আচরণ করতে হবে।

সাথেসাথে কুরআন মজীদে শ্রমিকের উপর এই দায়িত্ব অর্পন করেছে যে, যেন তার চুক্তিকৃত মজুরীর বিনিময়ে উত্তম সেবা দান করে। তার পরিপূর্ণ শক্তি সামর্থ অর্পিত কাজে ব্যয় করতে হবে। তার তহবিলে যে সব আসবাবপত্র অর্পন করা হয়েছে। সেগুলোকে আমানত মনে করে ব্যবহার করবে এবং একে তুচ্ছ মনে করবে চুরি, অবৈধ ব্যবহার কিংবা অন্য কোন পন্থায় বিনষ্ট করবে না। একজন সৎ কর্মশীল ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে -

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ

'কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।'[৭৩]

হযরত শো'আইব (আ.) হযরত মুসা (আ.) কে চাকুরীর শর্তাবলী শোনানোর পরে একজন মালিক হিসেবে তাঁর দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে এই নিশ্চয়তা প্রদান করে ছিলেন। যে তার চাকরকে কোন প্রকার কষ্ট তিনি দিবেন না। কুরআন মজিদে এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়,

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

'আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে।'[৭৪]

মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষণ সম্পর্কে রাসূল (স.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেন, হে মানব সমাজ! তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের জন্য পবিত্র যতক্ষণ না কিয়ামত দিবসে তোমরা আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে, যে এই দিন, এই মাসের সম্মান তোমাদের কাছে স্বীকৃত। অচিরেই তোমরা আল্লাহর সামনে হাযির হবে। সূতরাং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। [৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীনের সংরক্ষণ বা ধর্মীয় চিন্তার স্বাধীনতা :

বাংলা ভাষায় দ্বীনকে সচরাচর আমরা ধর্ম বলে থাকি, যদিও আল-কুরআনে 'দ্বীন' বলতে নিছক ধর্ম বুঝানো হয়নি। আল-কুরআনে 'দ্বীন' মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সমাধানকারী বিধান কে বুঝানো হয়েছে। সেখানে মানুষের সামগ্রিক জীবন দ্বীনের আওতাভূক্ত। মানুষের ধর্মীয় জীবন তার ব্যবহারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অংশ নয়। মানুষ স্বভাবতই কোন না কোন ধর্মের অনুসারি হয়ে থাকে। চাই তা সত্য ধর্ম হোক কিংবা বাতিল ধর্ম হোক। এর বাইরে খুব কম মানুষেরই অবস্থান। এখানে দ্বীন বলতে যে কোন ধর্মকে বুঝানো হয়নি, বরং সে সত্য দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে যা মহান রাব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত তথা ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ

'নি:সন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।'[৭৬] অন্যত্র দ্বীন ইসলামের উপর আরো জোড় দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الخَاسِرِينَ

'যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগস্ত।'[৭৭]

দ্বীনের হিফাজতের উপায়:

মহান আল্লাহ নিজেই এ দ্বীনকে হিফাজত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।'[৭৮] উপদেশ বলতে এ আয়াতে কুরআন এবং দ্বীন যে সকল পন্থা ও উপায় অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে :

১. দ্বীনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা :

আল্লাহ এ দ্বীন প্রবর্তন করেছেন তদানুযায়ী আমল করার জন্য, শুধু দ্বীনের কিছু বাচন ও উক্তি হিফাযত উদ্দেশ্য নয়। কেননা দ্বীন হচ্ছে আক্বীদা-বিশ্বাস ও বাস্তব কর্মের সমন্বয়। আর কাজে পরিণত করা ছাড়া দ্বীনের সুফল পাওয়া যায় না। প্রত্যেক মুসলিম বাস্তব জীবনে দ্বীনকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হলে অচিরেই তার সুফল দেখতে পায়। অতএব, দ্বীনের সুরক্ষার জন্য তদনুযায়ী আমল করা অত্যন্ত জরুরী। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপর সালাত, সাওম, হজ্জ ও যাকাতসহ আরো অনেক আমল ফরয করেছেন। দ্বীন অনুযায়ী আমলের একটি সর্বনিম্ন সীমা রয়েছে যা লংঘন

Dhaka University Institutional Repository

করার অনুমতি কাউকে দেয়া হয়নি। তা হচ্ছে ফরজ ওয়াজিব মেনে চলা এবং হারাম পরিত্যাগ করা। [৭৯] ইসলামের বিধিবিধান মানুষের জীবনে ফলপ্রসূ ও প্রভাবশালী করার জন্য প্রয়োজন আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পন্থায় আমল করা। এভাবে আমল করতে পারলেই তা হবে প্রকৃত দ্বীন। [৮০]

২. দ্বীনের নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালনা করা :

দ্বীনের নির্দেশ অনুযায়ী যাবতীয় কার্য পরিচালনা দ্বীনের হিফাযতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। কেননা দ্বীনই যদি কার্য পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি না হয়, তাহলে সে দ্বীন কিভাবে হিফাযত করা সম্ভব? অতএব দ্বীনকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ ও কিতাব ছাড়া অন্য আইন দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর দ্বীন ও কিতাবের স্থলে মানব প্রবৃত্তি ও মতবাদকে গ্রহণ করা। দ্বীনকে ধ্বংস করার জন্য এর চেয়ে আর বড় কোন হাতিয়ার আছে কি? এবং দ্বীনের বিরুদ্ধে কৃত এর চেয়েও বড় কোন অপরাধ আছে কি? এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

'অতএব তোমরা পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাদের ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অত:পর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।' [৮১] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'যে সব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই কাফের।' [৮২]

৩. দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহবান করা :

দ্বীনের প্রতি আহবান মূলত নবী ও রসূলগণেরই সুমহান কাজ। এ দায়িত্ব পালনের জন্যই তাঁরা জীবনভর সংগ্রাম করেছেন, কষ্ট করেছেন এবং সকল বিপদে-আপদে চরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে দাওয়াত ও আহবানের এ মহান দায়িত্ব পালন ব্যতীত কোন দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা ও প্রসারিত করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায়, অনেকে তাদের নিজ নিজ মতবাদ বাতিল হওয়া সত্বেও অন্যদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন পন্থায় তা প্রচারে লিপ্ত। ইসলামের শত্রুরাও আজ ইসলামকে বিকৃতভাবে প্রচারের জন্য এবং বিশেষ করে একে শত্রুদের বিবৃতি থেকে রক্ষা করার জন্য দাওয়াতী কাজের প্রসার ঘটানো মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফল কাম।'[৮৩]

৪. জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ :

দ্বীনকে হিফাযতের একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। জিহাদ একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। ব্যাপকার্যে জিহাদ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সাথে সম্পর্কিত সকল পর্যায়ের ও সকল প্রকারের কর্মকাণ্ডকেই বুঝায়। এ হিসাবে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত জিহাদের প্রাথমিক পর্যায়। আর বিশেষ অর্থে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ইসলামের শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ও ইসলামকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকেই জিহাদ বলা হয়।

৫. দ্বীন বিরোধী সকল কথা ও কাজ প্রতিরোধ করা :

এটা ও মূলত: জিহাদের অন্তর্গত। দ্বীনের হেফাযতের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় একে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হল। কেননা যদি দ্বীন বিরোধী বাতিল কথা, ভ্রান্ত আক্বীদা, ভ্রষ্ট চিন্তাধারা এবং ক্ষতিকর মতবাদ সমূহকে কোন প্রকার বাদ-প্রতিবাদ ছাড়াই মুসলমানদের সমাজে আঘাত হানার সুযোগ করে দেয়া হয়, তাহলে দ্বীনের মৌলিক ধারণা লোপ পেতে থাকবে।[৮৪] প্রতিটি মানুষই শান্তির প্রত্যাশী। আর এ শান্তি দৈহিক ও আত্মিক, মেধা ও মননের। বিবেক ও বুদ্ধিসহ সকল ক্ষেত্রেই একান্ত কাম্য। মানুষের মধ্যে রয়েছে ইচ্ছার শক্তি; কর্মের শক্তি, মুক্ত চিন্তা করার স্বাধীনাতা, কথা বলার স্বাধীনতা। আদিকাল থেকেই মানব সমাজ ধর্ম পালন করে আসছে। যার যার স্বাধীনতা মোতাবেক বিচার বিবেচনা করেই ধর্ম গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। 'তাকে অমর্যাদা দেয়া বা ইহার বিরুদ্ধে বিষোদগার করা, ইহা দন্ডনীয় অপরাধ।' [৮৫]

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের সম্পদের সংরক্ষণ:

সম্পদ বলতে এখানে মানুষের জীবনের যে সকল বাস্ত ও টাকা পয়সার প্রয়োজন সে সবকেই বুঝানো হয়েছে।[৮৬] সম্পদ ছাড়া পার্থিব জীবন কোন মতেই চলতে পারে না। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও উম্মাহ (জাতি) সকলেরই প্রয়োজন সম্পদের। ব্যক্তি পর্যায় জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র ও বসস্থান, যা ছাড়া জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। জনগোষ্ঠী ও উম্মাহর ক্ষেত্রে ও একই কথা প্রয়োজন। ব্যক্তির দারিদ্রের প্রভাব সমগ্র উম্মাহর উপর পড়ে। এভাবে বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র দেখা দিলে উম্মাহ ও সংকটাপন্ন হয় এবং মান মর্যাদা হারায়। তদুপরি শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের সম্পদের জন্য প্রয়োজন হয়।

ইসলামে সম্পত্তির হিফাযত গুরুত্ব অত্যন্ত প্রকট। ইসলামী শরী'আহ সম্পদ অর্জন ও তা সঠিকভাবে হিফাযতের জন্য নিম্ন বর্ণিত উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে -

১. হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ।
২. কারো সম্পদ জবরদখল করা হারাম ঘোষণা।
৩. সম্পদ বিনষ্ট করা কিংবা অপচয় করা হারাম ঘোষণা।
৪. সম্পদের সুরক্ষার জন্য শরী'আহ কর্তৃক চুরি ও ডাকাতির শাস্তি নির্ধারণ।
৫. বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির জামানত ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান।
৬. সম্পদ রক্ষার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বৈধতা।
৭. ঋণ প্রদানের সময় সাক্ষী রাখার ও এর লিখিত প্রমানাদি রাখা।
৮. অজ্ঞাতে পথে পড়ে থাকা (হারানো প্রাপ্তি) সম্পদ মালিকের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।[৮৭]

আর সম্পদ সংরক্ষণের যাবতীয় পন্থাকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য যে বিষয়টি অতিব গুরুত্বপূর্ণ তা হল চৌর্যবৃত্তি নিষিদ্ধ করণ এবং এর যাবতীয় প্রক্রিয়াকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা। নিম্নে চৌর্যবৃত্তির সংজ্ঞা শর্তাবলী। পরিমাণ ও প্রমাণ উল্লেখ পূর্বক এর বিধান ও দর্শন তুলে ধরা হল :

চুরির আভিধানিক ও পারিভাষিক ব্যাখ্যা :

চুরির আরবী প্রতিশব্দ আল-সিরকাতু (السرقة) । এ শব্দটি আরবী 'আল ইসতিরাক' শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। যার অর্থ গোপনে ছিদ্র করা।[৮৮] আরবীতে ইসতারাকা আস সামযু (استرق السمع) অর্থ গোপনে শ্রবণ করা।[৮৯] এ দিকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

الأمن استرق السمع فاتبعه شهاب مبين.

কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উল্কাপিন্ড।[৯০] অতএব গোপনে চুরি করে শ্রবন করাকে ইসতিবাক্ব استرق বলা হয়। আর সিরকাহ এর শাব্দিক অর্থ গোপনে কোন কিছু নিয়ে যাওয়া। আর ইসতিরাক্ব استراق বলা হয় গোপনে হিফাজতকৃত সম্পদের দিকে যাওয়া, যাতে হিফাজত থেকে অবৈধভাবে অপরের সম্পদ নিতে পারে।[৯১] আরবদের নিকট আল-সারিক السارق ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি সংরক্ষিত স্থানে গোপনে যায়। আর ঐ জিনিষ গ্রহণ করে যাতে তার অধিকার নেই।[৯২] ইংরেজী ভাষায় বলা হয়, Theft Act or instance of stealing. Talking wea the from a person or place iligally secretly.[৯৩]

The clandlesline taking of a thing not entrusted to the taler of belonging to some one else.[৯৪]

উক্ত শাব্দিক অর্থে তিনটি জিনিষ চুরির মধ্যে বিদ্যমান। তা হল পরের সম্পদ লওয়া। গোপনে নেয়া, আর সম্পদ সংরক্ষিত হওয়া।

ইসলামী আইনের পরিভাষায় চুরি বলা হয় প্রাপ্তবয়স্ত লোকের অপরের সম্পদকে গোপনে হরণ করা, যার পরিমাণ দশ দিরহাম, যা কোন স্থানে সংরক্ষক দ্বার সুরক্ষিত।[৯৫] বস্তুতঃ ইসলামী আইনে চুরির সংজ্ঞা শাব্দিক অর্থের পূর্ণটাই বহন করে। তবে শুধুমাত্র চুরি দ্বারাই কিন্তু তার বিধান আরোপ করা বাধ্যতামূলক নয়। বরং এরূপ চুরি হতে হবে যাতে কতিপয় শর্ত পূরণ করে।

চুরির প্রমাণ :

চুরি সাব্যস্ত করার জন্য প্রমাণ কিংবা স্বীকৃতি কিংবা শপথ একান্ত জরুরী। প্রমাণের ক্ষেত্রে দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ হবে বা চোরের মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা বুঝা যাবে। অন্যথায় চোরের নিকট থেকে হলফ বা শপথ নেয়া হবে। তবে জবরদস্তির স্বীকৃতি বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে,

ليس الرجل على نفسه بأيمن أو جوعت أو خوفت أو أولقت.

'যদি ক্ষুধার্ত কিংবা ভীত কিংবা চাপিয়ে দেয়া হয় তখন মানুষ নিজের উপর আমীন থাকে না।' [৯৬]

Dhaka University Institutional Repository

চুরির শর্তাবলী :

চুরির জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে, কিছু শর্ত চোরের ও কিছু শর্ত চুরিকৃত মালের মধ্যে আর কিছু শর্ত স্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর তা হল ইনসাফের স্থান ইসলামী রাষ্ট্র। দারুল হরব শত্রুর দেশ নয়। চোরকে অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেক সম্পন্ন হতে হবে। যেমন হুদুদের সকল শ্রেণীর জন্য যা প্রযোজ্য। চুরিকৃত মাল নিসাব পরিমান হওয়া। চুরিকৃত মালের ও চোরের মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকা; যেমন- পিতা ও সন্তানের সম্পদ। চোর যেন চুরি করতে ক্ষুধা দুর্ভিক্ষের কারণে বাধ্য হয়ে না করে। যেহেতু নবী করীম (স.) বলেছেন-

لا قطع في مجاعة مضطر

'ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।'[৯৭]

চুরিকৃত সম্পদ হালাল ও হস্তান্তরযোগ্য সম্পদ হতে হবে। কেননা সম্পদ চুরির জন্য বিধি বদ্ধ আইন রয়েছে।

চুরির নিসাব :

ইসলামী আইনবিদগণ, ফকীহগণ চুরির নিসাব যাতে হাত কর্তন করা হয় তাতে মতভেদ করেছেন। ইমাম মালেক (র.) এর নিকট চুরির নিসাব তিন দিরহাম। তিনি মহানবী (স.) এর বাণী দ্বারা দলীল পেশ করেছেন : হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, قطع في مجن عنه ثلاثة دراهم অর্থাৎ তিন দিরহাম পরিমাণ মূল্যের মিজান অস্ত্র চুরি করায় হাত কেটেছেন।[৯৮] ইবনে আবী লাইলা (র.) এর নিকট চুরির নিসাব পাঁচ দিরহাম। ইমাম আবু হানিফা (র.) এর নিকট দশ দিরহাম চুরির নিসাব। তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (র.) বলেন : لا قطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم অর্থাৎ এক দীনার কিংবা দশ দিরহামের ছাড়া হাত কাটা যাবে না। [৯৯]

ইসলামী শরী'আহ আইনে চোরের বিধান :

চুরিতে দু'ধরনের সীমালংঘন রয়েছে। অপরের সম্পদের উপর সীমালংঘন এবং সমাজের উপর সীমালংঘন। সেহেতু এর জন্য উপযুক্ত শাস্তি অপরিহার্য। মহান আল্লাহ যথার্থ শাস্তির বিধান হাত কর্তন করা বিধিবদ্ধ এ জন্য কার দিয়েছেন যাতে সামাজিক অধিকার সংরক্ষিত হয় এবং তার কল্যাণসমূহ অবতরণ করতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dhaka University Institutional Repository

'যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও। তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী, আল্লাহ পরাক্রান্ত ও জ্ঞানময়।'[১০০]

আর এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, চোরের হাত সঠিক ভাবে কর্তন করতে হবে। আর প্রথম বারের চুরির জন্য হাত কাটা। অত:পর দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কেটে দিতে হবে। এতে কারো বিরোধ নেই।[১০১]

তৃতীয়বার চুরির শাস্তি :

ইসলামী আইনবিদ ফকীহগণ তৃতীয়বার চুরির শাস্তি সম্পর্কে সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। যেহেতু প্রথম বারে ডান হাত, দ্বিতীয় বারে বাম পা কর্তন করা হয়েছে। সেহেতু তৃতীয়বার চুরি করলে কি শাস্তি হবে তাতে ইসলামী আইনবিদদের দু'টি মত রয়েছে।

প্রথমত : যখন চোর তৃতীয়বার চুরি করবে, তখন তার শাস্তি হল কয়েদখানায় আটক রাখা। আর কোন অঙ্গ কাটা যাবে না। এটা হানাফী ও হাম্বলী আইনবিদদের অভিমত।

দ্বিতীয়ত : মালেকী ও হাম্বলী আইনবিদদের এক বর্ণনা মতে, তৃতীয়বার চুরি করলে ডান পা কর্তন করা হবে। তারপরও যদি চুরি করে, তাকে আটক করতে হবে। তা'যীরী শাস্তি দেয়া হবে। [১০২]

ইসলামী শরী'আহ আইনে চোরের শাস্তির যৌক্তিকতা :

ইসলাম চোরের শাস্তি প্রতিষ্ঠায় যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছে। চুরির কঠোর শাস্তি বিধানে রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রে জন নিরাপত্তা, তাদের শান্তনা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। তাই চুরির শাস্তি হাত কাটা সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ

'যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী; আল্লাহ পরাক্রান্ত ও জ্ঞানময়।' [১০৩]

এ কঠোর শাস্তি নিজের ক্ষুধার ও সন্তানদের ক্ষধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে চুরি করলে প্রয়োগ করা হয় না, কেননা সাবধান নিয়ম আছে যে, বাধ্য হয়ে অপরাধ করার দোষ নেই। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী রয়েছে। তিনি বলেন-

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

'অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই।'[১০৪]

Dhaka University Institutional Repository

আর সম্পদ হস্তান্তর ও বিনিময় পথ হল পরস্পরের সম্মতি স্বেচ্ছায় খুশী ভরে যেন বিনিময় করে। এ জন্য মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদে অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।'[১০৫]

সুতরাং আয়াত একথা সুষ্ঠ বর্ণনা করে যে, পরের সম্পদ ভক্ষণ করা একটি অবস্থা ছাড়া বৈধ নয়। আর তা হল-ব্যবসা যখন তা পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে সংঘটিত হয়। যখন সম্মতি থাকবে না। তখন অপরের সম্পদ হালাল নয়, আর এটাই লেনদেন বিনিময়ের নীতি।

ইসলামী বিধানে চুরির শাস্তি নুতন কোন ব্যাপার নয়। কেননা এরূপ শাস্তির বিধান পূর্ববর্তী সকল বিধানেই প্রচলিত ছিল। তাতে কোন অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা চুরি অপছন্দনীয় অপরাধ, যা সম্পদের উপরে ঘটে থাকে, যাতে পূর্ববর্তী সকল শরী'আতে সকল ঐক্যমতে রয়েছে যে, সম্পদের হিফাজত একান্তভাবেই কাম্য।[১০৬]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে চুরির শাস্তির যে যৌক্তিকতা প্রতিভাত হয়, তার সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল-

১. আল্লাহ তা'আলা চুরির শাস্তিতে হাত কাটার যৌক্তিকাত (جزاءً بما كسبا) 'যা তারা রোযগার করেছে, তারই বিনিময় বাণী দ্বারা বর্ণনা করেছেন।
২. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তি : এ শাস্তি খোদায়ী বিধান মানুষের বিধান নয়। আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী। আর মহাজ্ঞানীর কর্ম-হিকমত থেকে খালি নয়।
৩. আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও কুদরতের বহি:প্রকাশ; আল্লাহ তা'আলা চুরির শাস্তি তার হিকমত ও কুদরত প্রকাশ করার জন্য নির্ধারণ করেছেন যাতে মানবজাতি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুৎ না হয়।
৪. চোরের অপমান ও অসম্মান : নিশ্চয়ই চুরি অপছন্দনীয় মন্দ কাজ। মানব সমাজ চোরের দিক ঘৃনাভাবে তাঁকায়, আর তার কর্ম সম্পর্কে ভর্ৎসনা করে সমাজে তার কোন সম্মান নেই।
৫. এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ : মানুষ প্রকৃতভাবে তার থেকে উপরের জনের নির্দেশের গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর চুরির শাস্তি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ"। فاقطعوا أيديهما অর্থাৎ 'তোমরা উভয়ের হাত কেটে দাও'।
৬. বদনামী থেকে হিফাজত : চুরির শাস্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকেরা বলে যে, অমুক চুরি করেছে। অনুরূপভাবে চোরের সন্তান, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন এ বদনামীর ভাগী হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. দৈহিক ক্ষতি থেকে রক্ষা : দৈহিক ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য মানুষ চুরি করা থেকে বিরত থাকে।

৮. হারাম রোজগার ও ভক্ষণ থেকে রক্ষা : চোর হারাম পন্থা বিনাশ্রমে সম্পদ রোজগার করে। আর এ হারামের রোজগারের দ্বারা হাত কাটা হয়।

৯. লোভ লালসা দমন : লোভ-লালসা ধর্মীয় দিক থেকে উভয়টাই নিন্দনীয়। কেননা তা বড় পাপ যা মৃত্যু ডেকে আনে। আর চোর পরের সম্পদের প্রতি লোভ করে চুরি করে থাকে, তাই এটা নিন্দনীয় অপরাধ।

১০. হারামের দারোওয়াজা বন্ধ : যেহেতু চোর জনগণের সম্পদ চুরি করে তাকে হারাম ও অশ্লীল কাজে ব্যয় করে, ফলে সমাজে যেনা ব্যভিচার, মাদক ও জুয়া বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে ফেৎনা ফাসাদ ও এতে বৃদ্ধি পায়। সে জন্য হাত কেটে দেয়া হয়। ফলে হারাম ও ফাসাদ সমূহের দারোওয়াজা সমূহ বন্ধ হয়ে যায়।

১১. গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর সুরক্ষা: মানুষের হাত ও পা গুরুত্বপূর্ণ সম্মানিত অঙ্গ উভয়টা কাটা হলে মানুষ আতুড় ও বেকার হয়ে যায়। ফলে সে কোন কাজ করতে পারে না। আর শাস্তি দ্বারা অন্যদের উপদেশ দেয়া হয়।

১২. নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা : যেহেতু চুরি সমাজে ফেৎনার সৃষ্টি করে। লোকেরা সুস্থিরভাবে ঘুমাতে পারে না এবং আরাম ও স্থিতিশীলভাবে সমাজে বসবাস করতে পারে না। বরং অস্থিরতা ও বিশৃংখলা নেমে আসে। আর চুরির শাস্তি বিধান শান্তি আরাম নেমে আসে।

১৩. দারিদ্র ও দৈন্যতার হিফাজত : যখন চোর চুরি করে। তখন তার হাত কাটা হলে সে রোজগার থেকে মাহরূম হয়, ফলে দরিদ্রতা ও দৈন্যতা নেমে আসে তার জন্য ও তার পরিপারের জন্য। এমনকি সে সমাজে অপমান ও বিপর্যয়ের সাথে দ্বীনহীন অবস্থায় জীবন যাপন করে।

১৪. সম্পদের রক্ষা : চৌর্যবৃত্তির শাস্তি সম্পদের হিফাজতের জন্য রচিত হয়েছে। কেননা সম্পদ জীবন ধারণ ও সামাজিকতার ভিত্তি স্তম্ভ। আর উভয়ের অবর্তমানে ইহজিন্দেগী অপমান ও বিপর্যয়ের জীবনে রূপান্তর হয়। সম্পদ ভিন্ন জীবন আরামের জীবন হতে পারে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে নানাবিধ বাঞ্চিত জীবন থেকে বঞ্চিত থাকে। যখন চৌর্য্যবৃত্তির শাস্তি প্রয়োগ করা হয়; তখন সমাজে চৌর্যবৃত্তির অপরাধ হ্রাস পায়। ফলে সম্পদ সুরক্ষিত হয়। [১০৭]

১৫. ইসলাম এ শাস্তি বিধান সার্বজনীন করেছে। যাতে সকল চুরি করতে তার হাত কাটা হবে। আর এটাই চুরি বিধান সাম্যতা। ফলে সমাজে মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মধুময় জীবন যাপন করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১) ডঃ এমাজউদ্দীন আহম্মদ: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ২৪তম সংস্করণ (ঢাকা বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, নিউ পূবালী মূদ্রায়ন ১৯৯৬ইং) পৃ. ২৩১-৩০০।

২) আল-কুরআন, ৫৭.২৫

৩) আল-কুরআন, ৪৮:২৮

৪) আল কুরআন, ৫:৩

৫) গাজী শামসুর রহমান : অপরাধ বিদ্যা (ঢাকাঃ পল্লব পাবলিসার্স ১৯৮৪ইং) পৃ:৭২

৬) ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, মৌলিক সমস্যা সমাধান ইসলামী আইন, ইফাবা, জানুয়ারী ২০০৬ পৃ:১০

৭) ড. ফকরী মহাম্মদ ওকাজ, ফাকসাকাতুল অকুবাত ফী আল্-শরী'আহ্ আল্-ইসলামিয়া (জেদ্দাঃ ওকাজ লাইব্রেরী ১৯৯৫ইং) পৃ : ১৫-২৫

৮) আল-কুরআন, ২:১৯৫

৯) আল-কুরআন, ৩:১১৪

১০) আল-কুরআন, ২:১৮৭

১১) মুহাম্মদ আমীন (ইবনে আবেদীন নামে খ্যাত), রদ্দুল মুহতার 'আলা আল-দূর আল-মোখতার, ৪র্থ খন্ড, পৃ:৪

১২) ইসমাইল বিন হাম্মাদ আল-জাহরী : আল-ছিহাহ্ তাজ আল-লুগাত, ৪র্থ খন্ড, ২য় সংস্করণ বৈরুত দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৩৯৯হি.), পৃ. ৭৯

১৩) A.P. Cowic: OXford advance Learner's dictionary of current English (4th edition. oxford University pres 1987, Machip pres 1993 Newyork) p-17.

১৪) Anwar Ahmed quadri: Islamic Jurispradense in the morden world (Tajcompany Newdelhi-1986) p-292

১৫) ইমাম আলাউদ্দীন আবু বকর বিন মাসউদ আল-কাছানী আল-হানাফী ঃ বাদায়ে, আল-ছানায়ে,কি তারতীব আল-শারায়ে, ৭ম খন্ড, প্রথম সংস্করন, পাকিস্তান- ১৪০০ হি. পৃ.৩৩

১৬) আল-কুরআন, ২:২৮২

১৭) আবু দাউদ : সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুল হুদুদ :হাদীস নং ১৭৫৯।

১৮) সাইয়েদ সাবেক : ফিক্হ আল–সুন্নাহ, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

১৯) মুহাম্মদ বিন আহম্মদ বিন জজ্জী আল-গ্লেনাডী আল-মালেকী : কাওয়ানীন আল-আহকাম আল শরী'আহ্ ওয়া মাসায়েল আল-ফরু আল-ফকহীয়াহ বৈরুত, ১৯৭পৃ : ৩৮৩

২০) প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৮৫

২১) ইবনে জজ্জী, কাওয়ানীন আল-আহকাম আল শরী'আহ প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৩

২২) প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৩

২৩) ইবনে আবেদীন, রদ্দুল মুহতার আ'লা আল-দুর আল-মোখতার, ৪র্থ খন্ড পৃ. ৫-৬

২৪) ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ জানুয়ারী ২০০৬, পৃ. ২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

২৫) বহু সংখ্যক বর্ণনাকরী তা বর্ণনা করেন, ইবনে কুদামা, মুগনী : ১০ম খন্ড, পৃ. ১৩৪

২৬) ইবনে কুদামা, মুগনী : ১০ম খন্ড, পৃ . ১২৬,

২৭) আল-কুরআন, ২৪:৪

২৮) আল-কুরআন, ৪:১৫

২৯) আল-কুরআন, ৭:৮০

৩০) আক-কুরআন, ২৪:২

৩১) আল-কুরআন, ৪:২৫

৩২) সালামা শায়বানী, মুগনী আল-মুহতাজ, ১৪ খন্ড, পৃ. ১৪৪, আল্লাম খাত্তাবী, মায়ালিম আল-সুনান, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ.২৭৩

৩৩) মুসনাদী ইমাম আহমদ, ১ম খন্ড, পৃ. ৩০০

৩৪) আল-কুর'আন ৪:১৬

৩৫) ইবনুল আরবী : আরেজাতুল আহওয়াজী, ৬ষ্ঠ খন্ড, (বৈরুত দারুল কুতুব আল-আরবী) পৃ. ২৪১, আলামা কাছানী, বাদায়ে আল-ছানায়ের ৭ম খন্ড, পৃ. ৩৪

৩৬) ড. ফকরী আহমদ ওকাজ ঃ ফালসাফাতুল উকুবাত ফি আল-শরীআতিল ইসলামীয়া ওয়াল কানুন, পৃ.৭৯

৩৭) আলী করায়া, ফিকহ আল-কুরআন ওয়া আল সুন্নাহ পৃ. ১৯১,

৩৮) আল কুরআন, ২৪:২১

৩৯) ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, প্রাগুক্ত পৃ. ১১৬

৪০) সাইয়্যেদ সাবেক, ফিকহ আল-সুন্নাহ, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫

৪১) ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮

৪২) আল-কুরআন, ৫:৩২

৪৩) আল-কুরআন, ২:১৭৯

৪৪) আল-কুরআন, ৫:৪৫

৪৫) লিসানুল আরব, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৩৪১ প্রথম সংস্করণ , মাতবায়ে আমালিয়্যা, রিসালা আল কাসাস ফিশ্ শরিয়াতিল ইসলামিয়া, ডক্টর আহম্মদ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, প্রকাশ কাল ১৯৪৪ খৃঃ মিসর পৃঃ ৩৬

৪৬) A.P. Cowie, Oxford Dictionary, ibid, P-85

৪৭) ইবনে রুশদ : প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৯৪, ইবনে হুমাম : শরহু ফতাইল কাদীর, প্রাগুক্ত, ৯ম খন্ড পৃ.১৩৯,

৪৮) শসছদ্দীন রামলীঃ নিহায়াতুল মুহতাজ, মিশর (মুস্তফা বারী হালবী লাইব্রেরী ১৩৮৯খৃঃ) পৃঃ ২৩৩

৪৯) আল-কুরআন, ৪:৯২

৫০) মুরগেনানী : হিদায়াহ, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৩১

৫১) মুরগেনানী : হিদায়াহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ১৩

৫২) ইবনে রুশদ : বিদাইয়াতুল মুজতাহিদ, ২য় খন্ড পৃ. ৪০৩, ইবনে হুম্মাম : তাকমিলাতুল ফতাইল কাদীর ৮ম খন্ড পৃ. ৩০৫

৫৩) আল-কুরআন, ৫:৪৫

Dhaka University Institutional Repository

৫৪) আল-কুরআন, ৪:৯২

৫৫) আবু দাউদ সূত্র, ড. ইউসুফ হোসাঈন আহমদ, রিসালাতু ফিল মিরাছ, হক প্রকাশনা, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৪

৫৬) আল-কুরআন, ২:১৭৯

৫৭) আল-কুরআন, ৫:৪৫

৫৮) আল-কুরআন, ২:১৭৯

৫৯) আল-কুরআন, ৯:৬০

৬০) আল-কুরআন, ১৬:১২

৬১) আল-কুরআন, ৬:১০৪

৬২) আল-কুরআন, ২৭: ৫৪,৫৫

৬৩) আল-কুরআন, ৩:৭৯

৬৪) আল-কুরআন, ৩:১১০

৬৫) শিবলী নোমানী, সীরাতুন নবী, ১ম খন্ড. পৃ. ২৯৫।

৬৬) আল-কুরআন, ২:২৫৬

৬৭) আল-কুরআন, ৪৯:১৩

৬৮) আল-কুরআন, ৫৭:২৫

৬৯) কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৯৪

৭০) আল-কুরআন, ৩:১১০

৭১) আল-কুরআন, ৪২:৩৮

৭২) আল-কুরআন, ২:৮৫

৭৩) আল-কুরআন, ২৮:২৬

৭৪) আল-কুরআন, ২৮:২৭

৭৫) সালাহউদ্দিন, মৌলিক মানবাধিকার, (ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা), পৃ. ২৭২

৭৬) আল-কুরআন, ৩:১৯

৭৭) আল-কুরআন, ৩:৮৫

৭৮) ড. মোহম্মদ মোস্তফা কামাল, মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ-২০০৬, পৃ. ৩৮০

৭৯) আল-কুরআন ১৫:০৯

৮০) ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, ইসলামী আইন ও বিচার (ত্রৈমাসিক পত্রিকা বর্ষ : ৩ সংখ্যা :৯) পৃ. ২০-২১

৮১) আল-কুরআন, ৪:৬৫

৮২) আল-কুরআন, ৫:৪৪

৮৩) আল-কুরআন, ৯:৬৬

৮৪) ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৮৫) মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০

Dhaka University Institutional Repository

৮৬) ড. মুহাম্মদ মা'দ আল ইয়ূবী,মাকাসিদুশ শরীআহ আল-ইসলামিয়াহ, পৃ. ১২৩

৮৭) ড. মুহাম্মদ মনজুর ইলাহী, ইসলামী আইন ও বিচার (ত্রৈমাসিক পত্রিকা বর্ষ ৩ সংখ্যা ৯ মার্চ-২০০৭। পৃ. ২৫

৮৮) জামাল উদ্দীন ইবনে মানজুর আল-আফরিকী : লিসানুল আরব, ১০ম খন্ড, প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫৫-১৫৬

৮৯) মুহাম্মদ বিন আবী বকর আল-রাজী : মুখতার আল-ছিহাহ (বৈরুত: দারুল কুতুব) পৃ. ২৯৬।

৯০) আল-কুরআন : ১৫:১৮

৯১) আল-ইমাম জাকারিয়া আল-আনসারী: তুফফাহাতু তুল্লাব, ৪র্থ খন্ড (বৈরুত : আল-মুযাচ্ছাছা আল-আরাবীয়া। ২য় খন্ড) পৃ. ৪৩২

৯২) ইবনে মানজুর : লিসানুল আরব : ১০ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

৯৩) A.P. Cowie Oxford Dictionary (Ibid), P.329.

৯৪) Anwar Ahmed Dudri : Islamic Juris Prudence in mordern world (Ibid), P.297.

৯৫) ইবনে হুম্মাম : শরহে ফতহুল কাদীর, ২য় খন্ড (পাকিস্তন, কোয়েটা, রশিদীয়া লাইব্রেরী), পৃ. ১৩০।

৯৬) মুহাম্মদ জুরকানী : শরহ আল-জুরকানী আলা মুয়াত্তাই ইমাম মালেক, ৮ম খন্ড (বৈরুত : দারুল মায়িদা ১৩৭৮হি.) পৃ. ১০৬।

৯৭) সুনানি নাছায়ী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৩।

৯৮) মুহাম্মদ বিন আলী আল-শাওকানী : নাইলুল আওতার, ৭ম খন্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৩১।

৯৯) কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম, শরহি ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২২১.

১০০) আল-কুরআন, ৫:৩৮

১০১) ইবনে কুদামা, মুগনী. ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১০৯-১১০।

১০২) আল-রাজী আল-মালেকী, আল মুনতাকা, ৭ম খন্ড, পৃ. ১৬৭

১০৩) আল-কুরআন, ৫:৩৮

১০৪) আল-কুরআন, ২:১৭৩।

১০৫) আল-কুরআন, ৪:২৯

১০৬) শাহওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৬.

১০৭) ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১-২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী শরী'আহ আইনের প্রায়োগিক ধারা

ইসলামী শরী'আতের সংস্কৃতি ও এর বিভিন্ন দিক

আধ্যাত্মিক জীবনে

নৈতিক জীবনে

বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে

সামাজিক জীবনে

অর্থনৈতিক জীবনে

রাজনৈতিক জীবনে

ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবন

পরিবার পরিচিতি

ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বিয়ের গুরুত্ব

বিয়ের উদ্দেশ্য

একাধিক বিয়ে এবং এ ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা

ইসলামী শরী'আতে মহিলাদের প্রাপ্য অধিকার

তালাক সম্পর্কীয় বিধান

ইসলামী শরী'আহ আইনে সন্তানের গুরুত্ব ও অধিকার

ইসলামী শরী'আহ আইনে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য

স্বামী স্ত্রীর অধিকার

পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের অধিকার

প্রতিবেশীর অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরী'আতে সংস্কৃতি ও এর বিভিন্ন দিক:

সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি হল সমাজ থেকে অর্জিত আচার-ব্যবহার। সমাজে একত্রে বসবাসের ফলে মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। তাদের একে অপরের নির্ভরশীলতায় গড়ে উঠে একটি সমাজ ব্যবস্থা। উৎপাদন যন্ত্র ও কৌশল, বন্টন বিধি, ভোগবিলাস এবং জীবন ধারার প্রক্রিয়াই সংস্কৃতি। নৃ-বিজ্ঞানী টেইলর এর মতে, সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত আচার-ব্যবহার, জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, আইন প্রথা ইত্যাদির জটিল সমাবেশকেই সংস্কৃতি বলা হয়। [১] আল্লামা আবুল হাশিমের ভাষায়, "Culture is the development of the facultics of man both extarnal and internal and is its manifestation in his behaviour and in his immediate material environment''. [২]

ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে ইসলামী অনুশাসনের প্রভাবে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের উৎকর্ষ সাধিত হয়। [৩] ইসলাম একটি পূণাঙ্গ জীবন দর্শন, যাতে মানুষের বৃত্তি সমূহের পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও জড় পরিবেশে যে সংস্কৃতির বহি:প্রকাশ ঘটে তা-ই হল ইসলামী সংস্কৃতি।

উল্লেখিত বিষয়ে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

'আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে, অত:পর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে ।' [৪]

সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে তৈরী মানুষের সম্ভাবনা ও অপরিসীম। তাদের জীবন বিধানের পরিসরও বিরাট। তাই সমগ্র জীবন নিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়। ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি আল্লাহর একাত্ববাদ। আল্লাহ স্রষ্টা মানুষ তার সৃষ্টি। তাই এই সংস্কৃতিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক ছাড়াও মানুষের সমাজ জীবন, খাদ্য আহরণ ও অর্জনের পন্থা, যৌন জীবন, রাষ্ট্রনীতি,শিল্প-বানিজ্য সম্পর্ক এবং এক মানব রচিত পরিকল্পনা রয়েছে। [৫] ইসলামী জীবন সর্বদেশ, কাল ও দর্শন এবং তমুদ্দন থেকে বিনয়ের সাথে যা কিছু সুন্দর তা চিরন্তন, কল্যাণকর তাকে সাদরে বরণ করে নিতে উদাত্ত আহবান জানিয়েছে। তবে সে সব ভাল জিনিস গ্রহন করে তাকে ইসলামের ভাবধারায় সমৃদ্ধ ও তৌহিদবাদ দ্বারা সঞ্জীবিত করার নির্দেশনা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাই তা বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও দেশের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন জাতি, দেশ ও ভাষা হল সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু এই সংস্কৃতির মূলনীতি ইসলামী জীবন দর্শন ও মানবতার উপর নির্ভর করে। জাতি, দেশ, বর্ণ ও ভাষা এ সংস্কৃতির মূল ভিত্তি নয়। ইসালামী জীবন দর্শনের মূল্যবোধগুলোই ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি, যার উপর নির্ভর করে তার বিরাট সৌধ ও শাখা-প্রশাখা।[৬] পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلام

'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহন যোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।'[৭]

এখানে দ্বীন অর্থ হল আল্লাহ পাকের ফিতরাত, যার ছাঁচে মানুষের প্রকৃতি গঠন করা হয়েছে। যে সকল অমোঘ প্রকৃতির নিয়ম মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে সে সমষ্টির নাম দ্বীন বা জীবন দর্শন। ইসলামের দৃষ্টিতে তাই দ্বীনের বিরোধীতা অর্থ নিজ প্রকৃতির বিরোধিতা। এরূপ বিরোধীতা করে নয় বরং এর সাথে সুসংগতি রক্ষা করে নিজের ইহকাল ও পরকাল সাফল্যময় করে তোলা যায়।

সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতি যেমন ব্যাপক, তেমন আদর্শ ভিত্তিক। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে প্রথম হল তাওহীদবাদ। মানব জীবনে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা, মানুষের সামাজিক জীবনে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সর্বজনীন নীতির প্রবর্তক। সর্বজনীন বিচার প্রতিষ্ঠা তাওহীদ বাদের লক্ষ্যণ এছাড়া প্রত্যয় বা চিন্তাধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আইন-কানূন, নীতি, আচার-ব্যবহার যা ইসলাম অস্তিত্ববাচক হিসেবে নিজেই গড়ে তোলে। প্রত্যয় বা চিন্তাধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন-কানূন, নীতি, আচার-ব্যবহার যে গুলো তাওহীদবাদ ও সর্বজনীন নীতির বিরোধী নয় তাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা হয়।[৮] ইসলামের মূল্যবোধসমূহ হল সংস্কৃতির প্রাণ। ইসলাম তাই মানব প্রকৃতির মূল তত্ত্বগুলোর ভিত্তিতে জীবন ব্যবহার বিধান দেয়। সুতরাং ইসলামের প্রভাব ও প্রতিফলন মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রতিভাত হয়।

ইসলামী শরী'আতে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক

আধ্যাত্মিক জীবনেঃ

মানুষ কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে এবং গন্তব্যস্থল কোথায়, মানব মনে স্বাভাবিকভাবে এ সব প্রশ্ন দেখা দেয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Dhaka University Institutional Repository

'হে মানব আমি তোমদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও।'[৯]

আয়াতটিতে আল্লাহর একত্ববাদ ও অদ্বিতীয়ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনিই একমাত্র উপাস্য। তার উপর আর কেউ নেই। কোন শক্তি নেই। তিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। সকল সৃষ্টিই সমভাবে তাঁর দয়া ও করুনা প্রাপ্ত। বিশ্বে যে কোন দেশের যে কোন ধর্মের যে কোন বর্ণের মানুষই শ্রেষ্ঠ উপাদানে তৈরী বলেই আল্লাহ ঘোষনা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ

'আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে অত:পর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচে থেকে নীচে। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেও জন্যে রয়েছে অশেষ পুরষ্কার, অত:পর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কিয়ামতকে'? [১০]

সুতরাং মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে তৈরী অর্থই হল মানুষ সৃষ্টির সেরা এবং তার সম্ভাবনাও অপরিসীম। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীন প্রতিভূ হিসেবে এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে বাস করার সুযোগ সমেত মানুষকে কর্তব্য পালন করতে পাঠানো হয়েছে। বিশ্বাস রাখ এবং কাজ কর, আল্লাহর গুনাবলীর সাথে একাত্ব হয়ে কাজ কর এই হল প্রত্যাদেশ। এই প্রত্যাদেশ অনুযায়ী যখন অপরিসীম সম্ভাবনার মানুষ আল্লাহর পথকে সম্মান করে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালবাসে। ঈমান রাখে এবং আল্লাহর গুণাবলীর সাথে কাজ করে তখনই সে নিজেকে সৃষ্টির সেরাজীব হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে এবং জড় পরিবেশের পটভূমিতে সগৌরবে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করতে পারে। এ সম্পর্কে আল কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার।'[১১] কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্বে অধিকারী মানুষ যখন তার জড় সম্পদ ভোগ লিপ্সার দাসে পরিণত হয় তখন সে নিজকে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত করে। এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম বাস্তব দিকের প্রতি উপেক্ষা করে এবং দুনিয়ার সম্পদ রাজিতে তুচ্ছ জ্ঞান করে। মানুষ দুনিয়ার সম্পদরাজিকে স্বীয় প্রয়োজনে ভোগ করবে কিন্তু নিজেকে ভোগ সম্পদের ভোগ্য বস্তুতে পরিণত করবে না। কেননা, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব বলে আল্লাহপাক ঘোষণা দিয়েছেন, মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রাখার সাধনাই হল আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির

Dhaka University Institutional Repository

মূলত্ব। সুতরাং মানুষের যে সকল বৃত্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট মূল্যবোধ ব্যক্তিত্বের সহজ বিকাশের সহায়ক সেগুলোর পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে তাদের বহিঃপ্রকাশ ইসলামী জীবনে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি।[১২]

নৈতিক জীবনে :

মানুষ জন্মগতভাবেই একটি নৈতিক সত্তা। মহানবী (স.) বলেছেন, 'প্রত্যেক মানব সন্তানই নিজ ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহন করে। [১৩] পৃথিবী থেকে পাপ পঙ্কিলতার দূরীকরণ এবং মানুষের স্বাভাবিক শুভতায় বিশ্বাস এ দু'টির সমবায়ে রচিত ইসলামের নৈতিক ভিত্তি। জন্মগতভাবে নৈতিকতার কারণে মানুষ শান্তিপ্রিয়। মানুষকে নিজের প্রতি সকল সৃষ্টির প্রতি এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়াই ইসলামী নীতিবিদ্যার লক্ষ্য। এ জন্যেই ইসলামের নির্দেশিত সকল আচার অনুষ্ঠানেই মানবাত্মার বিকাশ ও পূর্ণতা সাধন বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

মানুষের প্রকৃতিতে মনুষত্ব ও পশুত্ব এ দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মানুষ্যত্বের দিকটি মানুষকে নিয়ে যায় উপরের দিকে অর্থাৎ উৎকর্ষের চরম শিখরে। অন্যদিক পশুত্বের দিকটি তাকে চালিত করে নিচের দিকে অর্থাৎ অধ:পতনের দিকে। জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত মনের পশুত্ব ও রিপুকে মনুষ্যত্ব শক্তি দ্বারা জয় করা। এদিক থেকেই মানুষকে অভিহিত করা হয় নৈতিক দায়িত্ব সম্বলিত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা বলে। সকল রকমের ভ্রান্তি ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই তাকে বিকশিত করতে হয় তার সুপ্ত শক্তিসমূহকে।[১৪]

মানুষের শক্তি সমূহকে বিকশিত করার সাথে নৈতিকতার প্রশ্নটি জড়িত। এ বিষয়ে কখনও সে পশুত্ব শক্তি দ্বারা চালিত হতে পারে, যা মানুষ তথা সৃষ্টির ক্ষতি সাধন করে। পশু শক্তিতে পরিচালিত হওয়া মানে নৈতিকতা বিরোধী হওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে দূর্নীতি বা নৈতিকতা বিরোধী কাজ তা-ই, যা অপর কারও ক্ষতি সাধন করে। নৈতিকতা বিরোধী কাজই মানুষের প্রকৃতিতে পশুত্বের বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য, কর্ম বলতে কেবল হস্তদাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া কর্ম বোঝায় না। চিন্তা ও অনুভূতি ও অন্তর্ভূক্ত। এ সম্পর্কে আবুল হাশিম বলেন, 'যে কর্ম মানব সত্তারও তার পারিপার্শ্বিক বস্তু জগতে বিরাজমান সক্রিয় প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষতিকর ফল প্রসব করে তা জুলুম ও নৈতিকতা বিরোধী। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক জ্ঞান কতগুলি অবাস্তব ও স্বেচ্ছা উদ্ভাসিত ভাল মন্দের বিচার বুদ্ধি নয়, বরং যে কোন কর্ম স্বভাবত ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্রিক শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধিময় অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। তাই নৈতিকতা বিরোধী। ক্ষতি দৈহিক ও মানসিক প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের হতে পারে। কোন কোন ক্ষতির

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব সুদুরপ্রসারীও হতে পারে। আবার সীমিত হতে পারে।[১৫] সৃষ্টির যে কোন ক্ষতিকারক কর্মই মহান আল্লাহর দেয়া বিধানানুযায়ী জুলুম। শুধু তাই নয়, বরং যে ব্যক্তি জুলুম করে কিংবা জুলুমের সহায়তা করে বা শাক্তি থাকা সত্ত্বেও কোন প্রতিবাদ করে না সেও জুলুমের জন্য সমভাবে দায়ী। যে সব ভোগলিপ্সা মানব জনকে অপরাধ প্রবণ করে তোলে যেমন মাদকাশক্তি, জুয়া, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ নৃত্য,গীত ভাস্কর্য এবং যৌন আবেদন সম্বলিত রূপ প্রদর্শনী ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে নৈতিকতা বিরোধী। কেননা, তা মানব মনের ক্ষতি সাধন করে। অবশ্য মানব মনে রস সঞ্চালনকারী জীবনমূখী, রুচিসম্পন্ন সংগীত ইসলামী সংস্কৃতি বিরোধী নয়। কেননা, এর মাধ্যমে মানুষের মানবতাবোধ তথা জীবন ও জীবনের পরিসমাপ্তির কথা থাকে।[১৬] সুতরাং ইসলাম আপোষহীনভাবে যেমন নৈতিকতা বিরোধী যে কোন ক্ষতিকারক কর্ম ও জুলুমের বিরোধীতা করে। সেই প্রকারের মন গঠনের অনুশীলনী এবং ব্যবহারিক জীবনে তার বহিঃপ্রকাশই হল নৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামের এই নৈতিক পরিকল্পনাই আজকের পৃথিবীর কাঙ্খিত শান্তি দান করতে পারে। যে পরিকল্পনা ও নীতির অনুসরণ করে ইসলাম পাপচারী মরু বেদুঈনদের জীবনের মোড় পরিবর্তন করেছিল এবং তাদেরকে বিশ্বসভ্যতার ধারক ও বাহকে পরিণত করেছিল। ইসলামের নৈতিক ধারনা প্রকৃতির নিয়মের এক অপরিবর্তনীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠত।[১৭] ইসলামের নৈতিক শিক্ষার কার্যকারিতার বিষয় উল্লেখ করে রেভারেন্ড টেলর বলেন, 'মদ্যপান, জুয়াখেলা ও ব্যভিচার যে তিনটি অভিশাপ খৃষ্ট জগতকে ধ্বংসের পথে চালিত করছে। তা একমাত্র ইসলামের নৈতিক শিক্ষাই বিদূরিত করতে পারে।'[১৮]

বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনেঃ

মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি আর আল্লাহ বিশ্বাসীদের বন্ধু আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেন। মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আল্লাহর যে সমস্ত গুণ আত্মস্থ করা প্রয়োজন তার প্রথমটি হল সেই বৈশিষ্ট্য যা। জীবনের জন্য সক্রিয়। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Dhaka University Institutional Repository

'নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে দড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনের এবং মেঘমালায় যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরন করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের।'[১৯]

কেবল মাত্র ঐ সব বস্তুও প্রকৃতির সম্পর্কে তার গবেষণা করা প্রয়োজন। আর প্রয়োজন তার যথার্থ ব্যবহার। এ পথেই অর্জিত হয় শক্তি এবং শক্তিকে নাগালে আনার একমাত্র উপায় জ্ঞান। যে সকল বৃত্তি মানুষকে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানপিপাসু করে সেগুলোর পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও জড় পরিবেশে তার ফলিত রূপই ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি। এ জ্ঞান দু' প্রকার বুদ্ধিলব্ধ এবং বোধলব্ধ। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার অনুসরনে বোধলব্ধ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও ইসলামী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে শিক্ষা বুদ্ধি ও বোধের উৎকর্ষ সাধন করে সেই বিশুদ্ধ শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগ ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি।[২০]

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ

'হে জিন ও মানবকুল, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।'[২১] মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'হে বুদ্ধিমানগণ, কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।' [২২]

সুতরাং ইসলাম শুধু কতগুলো আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম মুক্তিবুদ্ধিও সাহায্যে সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনে উৎসাহিত করে। চিন্তা, বিবেক, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামী বৃদ্ধিভিত্তিক সংস্কৃতির অন্যতম আদর্শ। যার মধ্যে দিয়ে স্রষ্টার প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রকাশ পায়।

সামাজিক জীবনে :

ইসলামী মানবতা শিখায়, সামাজিক জীবন সম্পর্কে ইসলাম দিয়েছে এক বৈপ্লবিক ধারনা। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী সকল মানুষই সমাজভূক্ত এক আদমের সন্তান। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ভাষা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছেদ ভিন্ন হলেও সকল মানুষ একই মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

'হে মানব আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচালিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার।'[২৩]

ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তি সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু এ সাম্য যোগ্যতার নয়, ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার বিকাশের দ্বারা সমাজ জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার ও সুযোগের সাম্য। রক্তাভিজাত্য ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পদের গৌরব অথবা বিশেষ কোন পেশা ইসলামী সমাজ জীবনে মানবিক মর্যাদার মাপকাঠি নয়। চারিত্রিক সততাও কর্তব্যপরায়ণতাই সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করে। এখানে উঁচ নিচুর কোন ভেদাভেদ নেই। মানুষ ও মানবিকতার প্রতি ইসলামের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামের সামাজিক সংস্কৃতির প্রথম সোপান।

ইসলামী সমাজের সাংগঠনিক ভিত্তি পরিবার। পারিবারিক সততা, শান্তি না থাকলে এবং পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না থাকলে সমাজ জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আসতে পারে না। সমাজের সত্যিকারের উন্নতি নির্হিত রয়েছে বদান্যতা, ভালবাসা এবং পরস্পরকে বোঝার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের তথা নিয়ত পরিবর্তনশীল ও সদা বিলীয়মান বস্তুসামগ্রির উপর মানুষের বুদ্ধিসত্তার সাক্ষর অংকনের যে ক্ষমতা তার উন্নতির মাঝেই। মহানবী (স.) বলেছেন, 'মানব সমাজ আল্লাহর পরিবার --। পৃথিবীর সমগ্র মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মৃত্তিকায় গড়া। এই হচ্ছে ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব যা মানুষকে দিতে পারে, সামাজিক চেতনা ও শান্তির আবেহায়াত ইসলামী ভ্রাতৃত্ব অর্থ এখানে সকল মানুষের প্রতি ভ্রাতৃসূলভ সহানুভূতি। সততা , যোগ্যতা ও কর্তব্যপরায়ণতার অনুপাতে মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাদের ব্যক্তিত্ব ঠিক সেরূপ মনোরম থাকবে যেমন আল্লাহ তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।'[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সৎ ও ন্যায়কে যেমন সযত্নে আলিঙ্গন করে, তেমনি, অন্যায়কে ঘৃনা করতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু অন্যায়কারীকে ভ্রাতৃসূলভ সহানুভূতির সাথে অন্যায় পথ হতে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

'আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়।' [২৫]

ইসলামের মনোভঙ্গি আপসমূলক সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার নষ্ট হয়ে যায় এবং উন্নতর সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

'সমান নয় ভাল ও মন্দ। জবাবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।' [২৬] কিন্তু ইসলাম দূর্বল ক্রোধকে কখনও শুদ্ধির ছাড়পত্র প্রদান করে না। তাকে যতই সুভাষনে বিশেষিত করা হোক, নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে দ্বিতীয় গাল এড়িয়ে দিয়ে নতুন অপমান বা অন্যায়কে অভ্যর্থনা করার নীতিকে ইসলাম কখনও গুণ বলে অভিহিত করে না। কেননা, এতে করে মানবিক মর্যাদার অবমাননা করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্যায়কারীর কাছে দূর্বলের ক্ষমার কোন মূল্য নেই। সেই মুসলমানকে ক্ষমা করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, যথার্থ পৌরুষকে অক্ষুন্ন রেখে ক্ষমা করার শক্তি ধারণা করে। কেননা, এ সব ক্ষেত্রে ক্ষমাশীলতা আল্লাহর কাছে অধিকতর মনোরম বলে গৃহীত এবং সুফল ফলাতেও তার ক্ষমতা নিশ্চিত। সুতরাং বিশ্ব মানবের এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও জড় পরিবেশে এর বাস্তবায়নই সামাজিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি।

মোটকথা, দৈহিক ও মানসিকভাবে মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করে, আর সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই বিকশিত হয় তার নৈতিক জীবন। এ জন্যেই তার পক্ষে কাম্য- সামাজিক কল্যাণের লক্ষে তৎপর হওয়া। মানব জাতির মুক্তি, পরিবেশের উন্নতি বিধান এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা ও প্রগতির পথ সুগম করার লক্ষে সংগ্রাম অব্যাহত রাখাই ইসলামে সামাজিক সুনীতির প্রধান লক্ষ।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক জীবনে :

সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণের প্রতি এবং বিভিন্ন সমাজ সদস্যের মধ্যে সুখী সম্পর্ক রচনার প্রতি ইসলাম আদ্যোপান্ত সজাগ। ইসলাম মানুষের জন্য শুধু এক উন্নত ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থাই উপস্থাপন করেনি, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে গঠন করার এক নির্ভুল ও উজ্জ্বল অর্থ ব্যবস্থা ও পেশ করেছে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীবন। আল্লাহ তার 'বরং যিনি স্রষ্টা, পালনকর্তা, ও বিবর্তক তিনিই রব। আল্লাহ মানুষকে তার 'রব' গুণের 'খলীফা' করে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

'তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি 'খলীফা' করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন।' [২৭]

এখানে 'খলীফা' কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির মর্ম উপলব্ধি করা যায়। 'খলীফা' অর্থ প্রতিভূ। আল্লাহ যে নিয়মে জীবের সৃষ্টি পালন ও বিবর্তন নিয়ন্ত্রন করেন সেই নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে তার সৃষ্ট অপরাপর জীবকে পালন করার দায়িত্ব অর্পন করে মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' করেছেন। জীবন ও জগত সম্পর্ক ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা শোষণ বা শাসনের নয় পালনের। এটাই খিলাফতের তাৎপর্য, মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

'আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই।' [২৮]

সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান সবকিছুর উপর নিরংকুশ অধিকার আল্লাহর। এ সবের মালিক মানুষ বা ব্যক্তিসমষ্টিও নয়, রাষ্ট্রও নয়। এগুলোর ভোগের অধিকার রয়েছে কেবল মানুষের। ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী মানুষ জড় সম্পদ অধিকার করবে মালিকরূপে নয়, আল্লাহর 'রব' গুণের প্রতিভূরূপে। এ সম্পদের ব্যবহার করতে হবে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী। ভোগের স্বত্বাধিকার তাদের অর্জন করতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার বিনিময়ে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dhaka University Institutional Repository

'তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরন কর এবং তার দেয়া বিধিক আহার কর। তারই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।' [২৯]

কোন সঙ্গত কারণে যারা শ্রমে অসমর্থ , সামাজিক নিবমানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অন্ন , বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, ব্যবস্থা ও কর্মের সংস্থান মৌল জীবিকোপরণ সমূহের নিবতম প্রয়োজন মেটাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিদের উপর ন্যাস্ত রয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

'আর উপাসনা কর আল্লাহর। শরীক করো না তার সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকিন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও।' [৩০]

এ দায়িত্ব পালনের নাম হল 'হক্কুল ইবাদ'। পবিত্র-কুর'আনে 'সালাত' শব্দটির সাথে 'যাকাত' শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত; যার মর্মার্থ হল 'হক্কুল ইবাদ' আদায় না করলে নামায হয় না, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ ব্যাপারে কুর'আনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা,

404217

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

'সে সেই ব্যক্তি যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। অতএব দুর্ভোগ সে সব নামাযীর যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর ; যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।' [৩১]

সুতরাং বলা যায় যে সমস্ত মূল্যবোধ ও গুণ অর্থের উপার্জন ও ব্যবহার সম্পর্কে এই মানসিকতার উৎকর্ষ সাধন করে তাদের পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও জড় পরিবেশে সেগুলির ফলিতরূপ অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি। [৩২]

রাজনৈতিক জীবনে :

ইসলামী রাজনীতি গোড়ার কথা হচ্ছে আল্লাহর প্রভূত্ব। যার নাম 'হুকুমতে ইলাহিয়া' বা ইসলামী রাষ্ট্র। মহান আল্লাহ বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

'আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং 'তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।'[৩৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন দেশের অধিবাসীই দেশের প্রকৃত মালিক নয়, বরং আল্লাহই হচ্ছেন সমগ্র দেশ ও রাজ্যের মালিক। তিনি দেশ ও এর অধিবাসী তথা সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী নিজ ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য আল্লাহর বিধান অনুসারেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রেরিত আদেশ নিষেধই ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। অন্যান্য নবীর মত হযরত মুহাম্মদ(স.) আল্লাহর 'খলীফা' বা প্রতিনিধি ছিলেন। আল্লাহ প্রেরিত নির্দেশাবলীর আলোকেই তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের নমুনা দিয়ে গেছেন। কোন আইন সভা, কোন শাসন কর্তৃপক্ষ বা কোন বিচার সভা এই নমুনার পরিপন্থী কোন নির্দেশ দিতে পারে না। কারণ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। দ্বীন তাই পরিবর্তনহীন নিত্য। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্র সম্পর্কে -Davide-de-Santillana তে বলেন," Islam is the direct government of Allah' the role of Allah. Whose eyes upon his people , the principles of unity and order which in other societie is called civitas, polis state" In islam is personified by Allah, Allah is the name of the supreme power acting in the common interest, thus the public treasury is the treasury of Allah, the army is the army of Allah, even the public functionaries are the employees of Allah". [৩৪]

ইসলাম মানবতার মঙ্গলের জন্য এমনি চরিত্রেরই বিকাশ ঘটাতে চায় এবং এই চরিত্রের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথার্থরূপে বহন করা সম্ভব। একজন ব্যক্তি অথবা একটি পরিবার যারা সমাজের সদস্য অথবা একজন রাষ্ট্র পরিচালনা অথবা একজন নেতা যিনি শাসনতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধার অধিকারী , এদের সকলের করণীয় হল নিজস্ব দায়িত্বের অন্তর্নিহিত সেই কর্তব্যসমূহ পালন করা। ইসলামী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করবেন জনগণের কল্যাণে। রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি নর-নারী নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনে ও সংঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রকে তার মহান কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা ও সততার সাথে সাহায্য করবেন। কারণ শুধু রাষ্ট্রপতি নন। প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর নব্যুবিয়াতের 'খলীফা'। এখানে কেউ কারও দাস-প্রভূ নয়। এ জন্য

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে কোন বৈষম্য বিরাজ করে না। তবে এ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের কিছুগুণ থাকা চাই। আল্লাহ বলেন,

أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

'আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।' [৩৫]

নিম্নোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিই ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি-

১। অকলংক আদর্শ ; ইসলামী চরিত্র ;

২। জরুরী ইসলামী ও ইসলামী আদর্শ সচেতনতা ;

৩। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা , যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা ;

৪। আদর্শ রাষ্ট্র চালনার মত বুদ্ধিজ্ঞান, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা;

৫। ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা ও শত্রুকে প্রতিরোধ করার উপযোগী সাহস।[৩৬]

ইসলামী রাষ্ট্রে দু' শ্রেণীর নাগরিক থাকে, মুসলমান ও জিম্মি। মুসলমান নাগরিকগণ আল্লাহর বিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে। প্রত্যেক নাগরিকের জীবন ধর্ম, মান, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যক্তিগত মতামত ও বিশ্বাস করার, মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার রয়েছে। এই মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি নাগরিকের প্রতি কতগুলো দায়িত্ব আরোপিত হয়। যেমন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার, শাসক কর্তৃপক্ষের সাথে আন্তরিক সহযোগিতা, প্রয়োজনে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও মঙ্গলের জন্য জান-মাল কুর'বান। এ জন্য আল্লাহপাক বলেন,

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

'আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর কর। নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের।তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়।' [৩৭]

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকের মত অমুসলিম নাগরিক বা জিম্মিরা ও জীবন, ধন, সম্মান, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির অধিকার লাভ করে থাকে।[৩৮] ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বিচারালয়ে উঁচু নিচু, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই সমান, এমনকি রাষ্ট্র প্রধান গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলে সাধারণ অপরাধীর মত আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য এবং সাধারন আসামীর মতই তার বিচার হবে। [৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

শান্তির আকাঙ্খা ও ধৈর্যশীলতা মুশলমানদের জাতীয় জীবনের এক উজ্জ্বল দিক। ইসলাম বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেয়। কুর'আনের ঘোষণা,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লহর উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী ; পরিজ্ঞাত।'[৪০]

সন্ধি ভঙ্গ করলে তার বিধান প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

'তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এমনভাবে যেন হয়ে যাও তোমরা ও তারা সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধোঁকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না।[৪১]

বাকস্বাধীনতা না থাকলে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এভাবে যে সমস্ত মূল্যবোধ ইসলামী রাষ্ট্রীয় আদর্শের সহায়ক সেগুলোর অনুশীলন এবং ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে তাদের প্রয়োগ রাজনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি।[৪২]

এভাবে দেখা যায় ইসলামের প্রায়োগিক দিক জীবনের সর্বত্র রয়েছে। ইসলামের উপযোগীতা সর্বযুগের, সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। ইসলামের প্রভাব ও প্রাণ শক্তি আজ বিশ্বের সর্বত্র অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়েই চলছে। প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী তথা ধর্ম নিরপেক্ষতার সমাজ ও পরিবেশের বাইরে মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামকেই আজ মানব জাতি বেছে নিচ্ছে। এবং ভবিষ্যতে বিশ্বের একমাত্র ধর্ম ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকেই একমাত্র বিকল্প ভাবছে। তাই জর্জ বার্নাডশ এর উক্তিটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "আশ্চর্য প্রাণশক্তির জন্য মুহাম্মদের ধর্মকে আমি সশ্রদ্ধ মনোভাব নিয়ে বিবেচনা করেছি। আমার কনে হয়েছে যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা মানবিক অস্তিত্বের পরিবর্তনশীল সকল স্তরে সমন্বিত করতে সক্ষম যার ফলে তা সকল যুগের কাছে আবেদনশীল। আমি তাকে সেই আশ্চর্য মানবকে অনুধাবন করেছি এবং আমার ধারনায় খ্রীষ্টবিরোধী হওয়া দূরে থাক, তাকে মানবতার ত্রাণকর্তা বলে চিহ্নিত করা উচিত। আমি বিশ্বাস করি যে, তার মত একজন ব্যক্তি যদি আধুনিক বিশ্বের একনায়ক হয়ে আসতেন, তাহলে এমন এক পদ্ধতিতে সকল সমস্যার সমাধান রচনায় তিনি সফল হতেন। যাতে করে বিশ্বে বহু আকাঙ্খিত সুখ ও শান্তি নেমে আসত। মুহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, আগামী টিনের ইউরোপের কাছে তা সরাসরি গৃহীত হবে, যেমন আজকের ইউরোপের কাছে তা ইতিমধ্যেই গ্রহণীয় হতে শুরু করেছে।'[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবন

ক. পরিবার পরিচিতি :

পরিবার হচ্ছে সমাজের একটি চিরন্তন ও শাশ্বত সংগঠন। মূলত: পরিবারই হচ্ছে সমাজের ভিত্তি ও সমাজ গঠনের মৌল অঙ্গ সংগঠন। এখান থেকেই মানব জাতির বিকাশ লাভের সাথে সাথে সমাজের অগ্রগতি ও পরিবারের রূপকাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা অনুযায়ী বৈধ পন্থায় সম্পর্কিত একজন পুরুষ ও একজন নারী এবং তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে গড়ে উঠেছ যে ক্ষুদ্র জনসমষ্টি তাই হচ্ছে পরিবার। অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রীর বন্ধন দিয়েই পরিবারের সৃষ্টি। তাই সমাজবিজ্ঞানী এম,এফ, নিমকফ বলেন, পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীন ভাবে স্বামী স্ত্রী একত্রে বসবাস করে। '[৪৪]

পরিবার নামের এ সংঘটি সংগঠিত হয় বিয়ের মাধ্যমে। রক্ত সম্পর্কের কারণে অথবা জন্মসূত্রে। Encyclopadia Americana তে পরিবার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হল, `The term `Family' usually refers to a group of persons related birth or marriage (ordinarily parents and their children) who reside in the same house hold .' [৪৫]

অতএব বলা যায় পরিবারের অস্তিত্ব লাভ হয় বিয়ের মাধ্যমে, আর বিয়ের মাধ্যমে পরিবারের অস্তিত্ব না থাকলে মানব জাতি এতদিনে বর্তমান এ চরম উন্নতির সোপানে উন্নীত হতে পারত না। [৪৬]

ইসলামে পরিবার :

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যেখানে মানুষের স্বাভাবিক রুচি ও প্রবণতার সাথে সঙ্গতি রেখে এর বিধানগুলো প্রণীত হয়েছে। সে কারণেই পরিবার ব্যবস্থা সম্পর্কিত ইসলামের ধারণা খুবই সুস্পষ্ট। এর খুঁটিনাটি বিষয়াবলীর আলোচনা সিদ্ধান্ত ও সমাধান এখানে স্থান পেয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন।[৪৭] নারী ও পুরুষকে দু'টি ধারায় সৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গড়া হয়েছে মানব সমাজ। নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি তীব্র ও প্রবল আকর্ষণ প্রকৃতিগত করে দেয়া হয়েছে। উভয়ের মধ্যে মিলনই হল তাদের প্রাকৃতিক দাবি। একজনের সান্নিধ্য অন্যজনের জন্য পরম শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্র করে দিয়েছে। তিনি এই বৈধ মিলনকে কেন্দ্র করে সূত্রপাত হয়েছে পরিবারের। এর মাধ্যমে তাদের বংশধারায় সৃষ্টি হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

বহু পরিবার, সৃষ্টি হয়েছে সমাজ। আর এ মিলন যদি হয় বাধাহীন পন্থায় তবে সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।[৪৮]

আল্লাহ মানুষকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, জন্মলগ্ন থেকেই তাকে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। আর পরিবার নিয়ে গড়ে তুলতে হয় সমাজ। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ যে বিধি-বিধান প্রণয়ণ করেছেন, সেগুলোকে অনুশীলন করতে হলে মানুষ একা থাকতে পারে না। সঙ্গী ও সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সেজন্য মানুষকে বাধ্য হয়ে নারী পুরুষের সমন্বয়ে পরিবার গঠন করতে হয়। নারী পুরুষের মাঝে বৈধ পন্থায় সম্পর্ক স্থাপনের নাম হচ্ছে বিয়ে। বিয়েই হচ্ছে একটি পরিবার গঠনের মাধ্যমে অনেক পরিবারের সৃষ্টি হয়। ফলে এভাবে মানব সমাজ জন্ম লাভ করে। সুতরাং আল্লাহর দেওয়া বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী নারী-পুরুষের সঠিক সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে সমাজ ও সভ্যতার সুস্থতা ও নিরাপত্তা। ইসলামের নীতিমালা অনুযায়ী বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে পারিবারিক জীবনের সূচনা হয় দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে। দাম্পত্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের মূল উৎস হচ্ছে পারিবারিক জীবন। এর উন্নতি না হলে গোটা জীবন ব্যবস্থাই অর্থহীন। কেননা, সমাজ জীবনের প্রথম ভিত্তি ও বুনিয়াদ হল পরিবার। সামাজিক জীবন ব্যবস্থায় পারিবারকেই মূল হিসেবে চিহ্নিত করেছে ইসলাম। ইসলামী বিধি ব্যবস্থার সকল কর্মকাণ্ডের সূচনা পর্বের স্থান (Starting place) পরিবার।

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তার পথ চলার জন্য পারিবারিক জীবনের ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পারিবারিক জীবনের আচার অনুষ্ঠান, এর সদস্যদের পরিচিতি, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। এর ভিত্তিতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পারিবারিক জীবনের যে অবকাঠামো বর্ণিত হয়েছে, সে কাঠামোর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন মহানবী হযরত (স.)। আল্লাহর প্রদর্শিত ও মহানবী (স.) কর্তৃক বাস্তবায়িত পারিবারিক বিধি-বিধানের মধ্যে মানব জাতির কল্যাণ নিহিত। এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় পবিত্র কুরআনে। যেমন- আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

'মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেস্তাগণ।'[৪৯]

সর্বোপরি পৃথিবীতে আগত আম্বিয়ায়ে কেরামের সকলেই পরিবার ও পরিজনের সাথে থেকেই দ্বীন প্রচারের আঞ্জাম দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমের ভাষ্য অনুযায়ী সন্দেহাতীতভাবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণিত হয় যে, মানব সভ্যতা বিকাশের প্রথম প্রতিষ্ঠান পরিবার। মহান আল্লাহ হযরত আদমকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

'এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক।'[৫০]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا

'তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অত:পর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন সে গর্ভবতী হল, অতি হালকা গর্ভ।[৫১]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেও জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।'[৫২]

সুতরাং স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মানব জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছে পারিবারিক সূত্রের পথ ধরেই। সে পরিবারের প্রথম বিন্যাস ছিল স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে। মানুষের মধ্যে নারী ও পুরুষের এ আকর্ষণ ও পরস্পরের মিলিত হওয়ার আকাঙ্খা এবং একত্রে বসবাসের প্রবণতা তার মধ্যে চিরন্তন করে দেন। এমনি করে তাদের মধ্যে সন্তান প্রজননের তীব্র আকাঙ্খা সৃষ্টি করেন এবং নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে মানুষের বংশ ধারা। মানুষ এক অপরের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

' হে মানব সমাজ ! তোমরা তোমাদের পালন কর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু' জন থেকে অসণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে যাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।'[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

আর সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরুষ, মহিলা, জাতি ও গোত্রের ভিন্নতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

'হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও।' [৫৪]

আর পরিবার থেকেই সমাজের অধিকাংশ বিধি-বিধান বাস্তবায়ন শুরু হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য একমাত্র পরিবার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্যের কতিপয় দেশে এ প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার ফলে অর্থাৎ পরিবার ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে আজ তারা দিশেহারা। তাই বিশ্বের মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং মানবোচিত গুণরাজির অব্যাহত স্রোতধারার স্বার্থে পরিবারের অস্তিত্ব অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থার বিকল্প নেই।' [৫৫] এ প্রসঙ্গে আল্লামা আবুল হাশিমের চিন্তাধারাটি অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত। তিনি বলেছেন, 'In Islam the family is not merely on economic unit but it is an institution for basic culture of all human values spiritual, moral, intellectual, social and even political. Throughout the course of social evolution the family has retained its status as the basic unit of man's social existence and it shall continue to enjoy the same status even if and when the human race becomes one nation as is contemplated in the Quranic verse 'Man is not created except one nation' It does not require much intuition to see that if there is no peace and happiness in the family there cannot be peace and happiness for man either as an individual, as a nation or as a member of one human nation. It is ovious that the whole can not be its component units be bad. Islam therefore uncompromisingly condemns anything which has a natural tendency to disturb and damage purity, integrity, peace and prosperity of the family.' [৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের মৌলিক ভিত্তি হল পারিবার। আর বিয়ে হল স্বীকৃত বুনিয়াদী পারিবারিক বন্ধন বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিয়ে ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবার গঠন হল অ্রীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। পরিকল্পিত উপায়ে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদি দায়িত্ব সুসম্পন্ন করা সম্ভব। এঁাই ইসলামের কাম্য। কেননা ব্যক্তিগত বিশ্বাসসূচক ধর্মীয় মতবাদ ছাড়াও ইসলামের রয়েছে এশটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানই নয়, বরং একটি পবিত্র সংস্থা। পরিবারই হল সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। বহু সংখ্যক পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে উঠে সমাজ। আর সমাজেরই বিকশিত ও সুসংগঠিত রূপ হল রাষ্ট্র। সমাজকে টিকে থাকার জন্য পরিবার প্রথার বিকল্প নেই। অতএব সমাজ ও সৃষ্টিগত সুস্থতার জন্য পরিবার অপরিহার্য। নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গড়া হয়েছে মানব সমাজ। আর নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর প্রবল ও তীব্র আকর্ষণ প্রকৃতিগত করে দেয়া হয়েছে। উভয়ের মধ্যে মিলনই হল তাদের প্রাকৃতিক দাবি। এ মিলন যদি হয় লাগামহীন পন্থায় তবে সমাজ ও তমদ্দুনে ফিতনা বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়াই অবধারিত। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রদত্ত বিধিও পন্থা অনুযায়ী নারী পুরুষের সঠিক সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে সমাজ ও সভ্যতার সুস্থাতা ও নিরাপত্তা। তাদের উভয়ের মধ্যে খোদায়ী বিধি অনুযায়ী এ সম্পর্ক কেবল বিয়ের মাধ্যমেই হতে পারে। বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাতে সূচনা হয় পারিবারিক জীবনের। বৈধ পারিবারিক জীবন ছাড়া মানুষের দাম্পত্য জীবন কোন অবস্থাতেই সুখের হতে পারে না। স্বাচন্দ্যের হতে পারে না। [৫৭]

এ জন্যই মানব সমাজে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অপরিহার্য। পরিবারকে বলা হয় একটি সংরক্ষিত দূর্গ। পরিবারের সদস্যদের সতর্ক প্রহরায় এ প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গরূপ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে সর্ব প্রকার অযত্ন, অবহেলা, অযাচিত হস্তক্ষেপ, অনাকঙ্খিত অনুপ্রবেশ, নির্যাতন, নিপীড়ন, অভ্যন্তরীণ ও বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলেছে। পরিবারে প্রতিটি সদস্য একে অপরের নিকট থেকে ধর্ম, প্রাণ, মান-মর্যাদা ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করে থাকে। তাই দেখা যায়, যুগ যুগ ধরে মুসলিম পরিবারে যুবক-যুবতী ভাই-বোন, পিতা তার যুবক-যুবতী পুত্র-কন্যা, আর প্রবাসী স্বামীর বিরহ যাতনা কাতর মাতা অনেক জন পদই একত্রে বসবাস করে চলছে। কিন্তু শরী'আত শাসিত এ পরিবারে কখনও কোন বিপর্যয় নেমে আসেনি। এমনকি নৈতিকতার বন্ধনও ছিন্ন হয়নি কখনও। পবিত্রতার এক লীলাভূমি হচ্ছে পরিবার। সমাজ ও রাষ্ট্রেও প্রতিটি ব্যক্তি সংগঠিত হচ্ছে পরিবারে। পরিবার সংগঠিত হচ্ছে সমাজে আর সমাজ সংগঠিত হচ্ছে রাষ্ট্রে। এভাবেই বিশ্ব সমাজ তথা মানব সন্তানদের নিয়ে বিশ্বপরিবার গঠিত হতে পারে। তার পরিবার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের গুরুত্ব :

ইসলামে বিধি নিষেধ দ্বারা জৈবিক উম্মাদনা ও উচ্ছৃখলতার সকল পথ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য একটি পথ খোলা রাখা আবশ্যক। এটাই ইসলামের বিয়ে প্রথা। বিয়ে একটি পবিত্র বন্ধন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী মূলত বিয়ে প্রথাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে থাকে। মানব বংশের স্থায়িত্ব ও সভ্যতা এর উপর নির্ভরশীল। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের গুরুত্ব ব্যাপক। এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে দুররুল মুখতার গ্রন্থের লেখক বিয়ে অধ্যায়ের শিরোনামায় লিখছেন, 'একমাত্র বিয়ে ছাড়া ইসলামী শরীআতে আমাদের জন্য তেমন কোন ইবাদত নেই যা চিরন্তন বেহেশতেও জীবন্ত থাকবে। আর্থাৎ দুনিয়াতে স্থাপিত বিয়ে সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পূণ-মিলন ঘটবে বেহেশতেও যদি উভয়ের নসীবে বেহেশত আসে।[৫৯] আল্লাহ প্রদত্ত আসক্তি ও ভালোবাসার কারণে মানুষের বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এ সম্পর্কের সূত্র হতেই পরিবার হতে গোত্র, অবশেষে জাতি গঠিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

'তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অত:পর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম ।'[৬০] এতে প্রমাণিত হয় যে, ঔরসজাত বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কই মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি। সন্তানের প্রতি মানুষের ভালোবাসা চিরন্তন। এর ধারাবাহিকতা অনন্তকাল ব্যাপী চলতে থাকে। এ ভালবাসার তীব্র তাড়নায় পিতামাতা নিজেদের অপেক্ষা সন্তানের মঙ্গল কামনা করে থাকেন বেশী। সেজন্য তারা তাদের জীবনের শ্রমের ফসল সন্তানের উন্নত জীবনযাত্রার স্বার্থে রেখে যান। এভাবে নারী-পুরুষের মিলন, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ প্রীতি, স্নেহ-বাৎসল্য ও মঙ্গল কামনা পরিবার গঠনের ভিত্তি হয়ে উঠে।

মানুষের স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা :

মানসিক ভারসাম্য ও চারিত্রিক পবিত্রতার প্রধান উপায় বিয়ে। বিয়ে একজন সুস্থ মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন। এ কারণেই অনিন্দ্য সুখের বাসর জান্নাতে বসেও যখন হযারত আদম (আ.) অতৃপ্তিতে ভোগ ছিলেন, তখনই আল্লাহ হযরত হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করেন তার জীবন সঙ্গিনী রূপে। নর ও নারীর যুগল বাঁধনে শুরু হল মাবন জীবন। আর এ ধারা টিকিয়ে রাখতে মহান আল্লাহ বিবাহের নির্দেশ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের গুরুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে মহানবী (স.) একে আদর্শ বলে অবিহিত করেছেন। এ আদর্শ ত্যাগকারীর বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, বিয়ে করা আমার রীতি ও স্থায়ী কর্মপন্থা। অতএব যে ব্যক্তি এ সুন্নাত ও রীতি অনুযায়ী আমন করবে না, সে আমার দলভূক্ত নহে।' [৬১]

ইসলামের প্রতি নিবেদিত প্রাণ সাহাবীগণের কয়েকজন মনস্থ করলেন যে, তারা অধিকাংশ সময় নামাযে কাটাবেন। তাঁরা সফল হবেন, জৈবিক সম্ভোগ চিরতরে ত্যাগ করবেন, একাধিকক্রমে রোযা রাখবেন ইত্যাদি। এসব কথা শুনে মহানবী (স.) খুবই অসুন্তষ্ট হলেন এবং কঠোর ভাষায় তাঁদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, তোমরা কি এ ধরনের কথাবার্তা বলনি? আল্লাহর কসম। আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বন করি, তা সত্ত্বেও আমি রোযা রাখি, রোযা ভঙ্গও করি। নামায পড়ি, শুয়ে নিদ্রাও যাই এবং রমণীদের পাণিও গ্রহন করি। এ হচ্ছে আমার রীতি-আদর্শ। অতএব যে লোক আমার নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। [৬২]

অন্যত্র বিয়েকে ঈমানের পরিপূর্ণতা বিধানের মাধ্যমে আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে, কোন বান্দা যখন বিয়ে করল তখন তো সে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করে ফেলল। অত:পর সে যেন অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।[৬৩] বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে ইসলাম দ্বীনের অর্ধেক বলে আখ্যায়িত করেছে। কারণ শরীরিক, মানবিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ ও পবিত্রতা নির্ভর করে এর উপর।

বিয়ের উদ্দেশ্য :

আল কুরআনে বিয়ের নানাবিধ উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। প্রথমত স্বীয় নৈতিক চরিত্র পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত রাখতে পারা। দ্বিতীয়ত মনের গভীর প্রশান্তি ও স্থিতি লাভ, এবং তৃতীয়ত পারিবারিক জীবন যাপন করে সন্তান জন্মদান। সন্তান লালন-পালন ও ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য মানুষ গড়ে তোলা।[৬৪] প্রথম উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

'এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সাধ বা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায় এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ব্যভিচারের জন্যে নয়।'[৬৫] উল্লেখিত আয়াত দ্বারা জানা যায় যে,

Dhaka University Institutional Repository

নিদিষ্ট কয়েকজন মহিলাকে বিয়ে করা হারাম। সেই মুহাররম মহিলা কয়েকজন ব্যতীত আর সব মহিলাকে বিয়ে করা পুরুষের জন্য সিদ্ধ। দ্বিতীয়ত এসব বৈধ নারী তোমরা গ্রহন করবে মোহর স্বরূপ দেয় অর্থের বিনিময়ে। তৃতীয়ত মোহর ভিত্তিক বিয়ে ছাড়া অন্য কোনভাবে এই বৈধ মেয়েদের সাথে ও জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন না করা, চতুর্থত এভাবে বিয়ে করে নৈতিক চরিত্রের এক দুর্জয় দুর্গ পরিবার রচনা করা যায় এবং অবাধ জৈবিক চর্চার মত চরিত্রহীনতার কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। বিয়ের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারী-পুরুষের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার দাবী পূরণ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

' আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে ।'[৬৬]

বিয়ের তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান লাভ। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে-

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

'তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক।'[৬৭]

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে দু'টি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত কোন বাণিজ্য চুক্তি নয়। অথবা এটা নেহায়েত কোন পার্থিব চুক্তি ও নয়, যেখানে তুলনামূলকভাবে পরস্পরের বিষয়িক স্বার্থ ও কর্তব্যের মূল্যায়ন করা হয়, এ হল একটি পুত পবিত্র সম্পর্ক, অবশ্য নৈতিক হিতৈষণা, আধ্যাত্মিক সমুন্নতি সামাজিক সংহতি, মানবিক স্থায়িত্ব,শান্তি-শৃঙ্খলা, দয়া-অনুকম্পা ইত্যাদির সমন্বয়ে বিবাহের উপাদানগুলো গঠিত হয়ে থাকে। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ এমন একটি চুক্তি, যা সম্পাদিত হয় আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের তাগিদে এবং তারই বিধি ব্যবস্থা অনুসারে। এ হল মহান আল্লাহর অনুমোদন ও তত্ত্বাবধানকৃত এক সুন্দর ও শালীন মানবীয় সম্পর্ক। পবিত্র কুরআনের বর্ণনানুসারে অফুরন্ত আর্শীবাদ ও অপরিমেয় দয়া-অনুকম্পার এক প্রোজ্জ্বল নিদর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

একাধিক বিয়ে এবং এ ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা :

ইসলাম পূর্বযুগে সমগ্র জাযিরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ) জুড়ে বহু বিবাহের নামে নারীর উপর চলছিল অশ্লীলতা ও অত্যাচারের ঘৃন্য ষ্টিমরোলার। সে যুগে বিয়ের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বা সীমা ছিল না। সে কালে একজন পুরুষ তার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী অসংখ নারীকে বিয়ে করত এবং আরো অনেককে দাসী বানিয়ে রাখতে পারত।[৬৮]

ইসলাম অন্ধকার যুগের এই উচ্ছৃঙ্খল নীতি জ্ঞান বিবার্জিত প্রথা অসংখ্য নারীকে বিয়ে করার উপর একটি সুনির্দিষ্ট সীমা রেখা টেনে দেয়। তাও কঠোর শর্তারোপের মাধ্যমে। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম একটি মাত্র বিয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। ইসলামের একাধিক বিয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে যে আয়াতটি উদ্ধৃত করা হয় তা হচ্ছে,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا

'আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশংকা কর যে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই, অথবা তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসীদেরকে।[৬৯] এতেও বুঝা যায় যে, পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার বহু বিবাহের প্রতি নিরুৎসাহিত করে আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ করেন। এখানে সকল অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, পিতৃহীন অসহায় আশ্রিতা মেয়েরা যদি তোমাদের পক্ষে বৈধ হয় তবে তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিয়ে করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ বা দোষের কিছুই নয়। তবে তাদেও সাথে স্ত্রীর উপযুক্ত মর্যাদা, অধিকার ও সম্মানসহকারে সুবিচার এবং তাদের প্রতি স্বীয় কর্তব্য পালন করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে যদি তোমাদের মনে কোনরূপ আশঙ্কা বা সন্দেহ হয় তবে তোমর। তাদেরকে বিয়ে কর না, এর পরিবর্তে অন্যান্য বৈধ রমণীদের মধ্য হতে তোমাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দু'টি, তিনটি অথবা সর্বোচ্চ চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার। [৭০]

এরূপ অবস্থায়ও যদি তোমাদের মধ্যে আশঙ্কা বা সন্দেহ হয় যে একাধিক বিয়ে করে স্ত্রীগণের প্রতি সমতা বিধান ও ন্যায়বিচার করতে পারবে না তাহলে শুধুমাত্র একটি বিয়ে করবে। আর যদি তোমরা একটি স্ত্রীর উপযুক্ত ভরন পোষণ এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে না পার সেরূপ ক্ষেত্রে যে নারী তোমার আয়ত্তাধীন দাসী কিংবা যুদ্ধবন্দি কেবল তাকেই পত্নীত্বে বরণ করে নিবে। এটি

Dhaka University Institutional Repository

অবিচার না করার অধিক নিকটবর্তী। এ কথার অর্থ এই যে, পিতৃহীন আশ্রিতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে কিংবা এশাধিক বিয়ে করলে অন্যায় অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা যেরুপ প্রবল একটি মাত্র বিয়ে করলে অথবা দাসীকে স্ত্রীরুপে গ্রহন করলে তদ্রুপ কোন আশঙ্কাও থাকবে না। মহান আল্লাহ তাই একাধিক বিয়ে করে অন্যায় অবিচারে অভিশপ্ত হওয়ার চাইতে একটি মাত্র বিয়ের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন, এর ফলে পরিবার ও সমাজে অন্যায়, অবিচার, হিংসা বিদ্বেষ, কলহ প্রভৃতি লোপ পাবে। সুতরাং দেখা যায়, ইসলামে একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরী'আত মুতাবিক সকলের সাথে সমান আচরণ করা এবং সকলের অধিকার সমানভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। অন্যথায় এক স্ত্রীকে নিয়েই জীবন নির্বাহ করতে হবে এবং এটিই ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ।[৬৯] পবিত্র কুর'আনুল কারীমের একই সুরার শেষপ্রান্তে বলা হয়েছে,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

'তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্খী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুকেও পড়োনা যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং খোদাভীরু হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।'[৭১]

এ প্রসঙ্গে নহানবী (স.) বলেন, 'যে লোকের দু'জন স্ত্রী এবং সে তাদেও মধ্যে একজনকে অপর জনের উপর অগ্রাধিকার দেয় সে কিয়ামতের দিন তার পড়ে যাওয়া বা ঝুকে পড়া পার্শ্ব টানতে টানতে উপস্থিত হবে।'[৭২]

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, ইসলামে একাধিক স্ত্রী গ্রহনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মানবিক ও নৈতিক ব্যবস্থা মাত্র এবং তাও কঠিন শর্তাধীন করা হয়েছে। আর শর্তটি হচ্ছে (আদল) সুবিচার। সমান মানে ও সমান প্রয়োজনে সবার অধিকার আদায় করা।[৭৩]

ইসলামী বিধান মতে আর্থিক স্বচ্ছলতা বিবাহের পূর্বশর্ত। দাম্পত্য জীবনে প্রবেশের পূর্বেই পুরুষের উচিত তার স্ত্রী ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভরণ-পোষণ করার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করা। তা হলেই দাম্পত্য জীবনে লাভ করবে অনাবিল শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ। স্ত্রী ও সন্তানের ভরন-পোষণ ছাড়াও সন্তানের লেখাপড়া, চরিত্র গঠন, ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়া ইত্যাদির ব্যাপারে পিতাকে লক্ষ্য রাখতে হয় বেশী। এ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জিত না হলে দৈহিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করে অপেক্ষা করা শ্রেয়। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

Dhaka University Institutional Repository

'যারা বিবাহে সমর্থ নয়,তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।'[৭৪]

ইসলামী শরী'আয় মহিলাদের প্রাপ্য অধিকার :

মুসলিম পরিবারে পুরুষদের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ পোষণ ছাড়াও বিয়ের জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা অপরিহার্য। কারণ স্বামী স্ত্রীকে তার নির্ধারিত মোহর অবশ্যই আদায় করতে হবে। মোহরবিহীন বিয়ে ইসলামে বৈধ নয়। মোহর বলা হয় সেই সম্পদকে যা বিয়ের সময় বরের পক্ষ থেকে কনেকে বিনিময় স্বরূপ দেয়ার ওয়াদা করা হয়। সাধারণ কথায় ইসলামী নিয়ম অনুসারে মুসলিম পরিবারের বৈবাহিক চুক্তি সম্পাদনকালে নির্ধারিত এবং বর কর্তৃক স্বীকৃত ও কনেকে প্রদেয় অর্থ বা সম্পত্তিকে দেনমোহর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৭৫]

মুসলিম নারীর সামাজিক নিরাপত্তায় দেনমোহরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ন। বাংলাদেশে ধর্মীয় এ বিধানটিকে 'মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯', 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১', 'মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রিকরণ) আইন ১৯৭৪,' 'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫' ইত্যাদি প্রণয়নের মাধ্যমে আইনগত বাধ্যবাধকতার কাঠামোগত রুপ প্রদান করা হয়েছে।[৭৬]

ইসলামী আইনের মূল উৎস পবিত্র কুর'আনে মোহর সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশী মনে। তারা যদি খুশী মনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।'[৭৭] মোহর যেহেতু স্ত্রীর সম্পত্তি, তাই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলেও ঐ সম্পত্তি স্ত্রীর দখলেই থাকবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

'যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহন করো না।[৭৮]

এমনকি পুরুষ যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়, তবুও অবশ্যই তাকে অর্ধেক মোহর প্রদান করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

' আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে।'[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম স্ত্রীর স্বেচ্ছায় মোহর লাঘবকে অনুমোদন করলেও জোর করে মোহর কমিয়ে নেয়াকে অবৈধ বলে চিহ্নিত করেছে। ইসলাম মোহরকে স্বামী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হিসেবে উল্লেখ করেছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

'এবং তাহারা (স্ত্রীরা) তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি লইয়াছে।'[৮০]

প্রয়োগিক দিক থেকে স্বামী কর্তৃক তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের সীমাহীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোহর স্ত্রীর জন্য একটি রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে মোহরকে বিবাহ বিচ্ছেদকালীন স্ত্রীর নিরাপত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বস্তুত মোহর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঢাল স্বরূপ এবং সমাজে অন্যায় প্রতিরোধ কারী। মোহরের পুরো অংশ আদায়ের পরই স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। কাজেই তালাকের আগেই তাকে মোহর আদায়ের কথা চিন্তা করে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হয়। তবে মোহর আদায়ে একজন পুরুষের পক্ষে যতটা কষ্টদায়ক, একজন মহিলার বেলায় এই তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ তার চেয়েও মর্মন্তুদ। তাই মোহরকে বলা যায় দাম্পত্য জীবনের নিরাপত্তা স্বরূপ। এক্ষেত্রে মোহরের অর্থ পুরোপুরি আদায় হলে নিরাপত্তা বাড়বে। স্ত্রী হিসেবে তিনি এই মোহর অর্থকারী কার্যক্রমে খাটাতে পারবেন অথবা গচ্ছিত রেখে নিজের নিরাপত্তা বিধান সুনিশ্চিত করতে পারবেন ।'[৮১]

মানবাধিকার সংরক্ষণ, নারী পুরুষের আর্থ-সামাজিক সমঅধিকার বাস্তবায়ন এবং মানবিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিতকরণ বর্তমান সভ্য যুগের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে নারীর মোহর ব্যবস্থার পর্যাপ্তও সার্বিক অনুশীলন বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। দম্পতি, পরিবার, সমাজ ও সরকার সকলেরই এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। কেননা, বিবাহিত নারীর নিরাপত্তার নিশ্চিয়তা পারিবারিক কাঠামো সুদৃঢ় রাখে। নিরাপদ থাকে শিশু ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। মোহর মূলত একটি বৈবাহিক চুক্তি। মোহর পরিশোধ না হওয়া বৈবাহিক চুক্তি ভঙ্গেরই নামান্তর। তাই মোহর ব্যবস্থার সুষ্ঠু অনুশীলন সুনিশ্চিত করে নিজেদের পবিত্রতা ও সংহতি রক্ষা করা আজ আমাদেরই পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তালাক সম্পর্কীয় বিধান :

পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার। 'তালাক' হচ্ছে এ বিপর্যয়ের চুড়ান্ত পরিণতি। ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে পারিবারিক জীবনের চুড়ান্ত বিপর্যয় থেকে স্বামী স্ত্রী উভয়কে বাঁচাবার জন্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যখন চরমভাবে ভাঙ্গন দেখা

Dhaka University Institutional Repository

দেয়, পরস্পরে মিলে মিশে শান্তিপূর্ণ ও মাধুর্যমন্ডিত জীবন যাপন একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় পারস্পরিক সম্পর্ক যখন তিক্ত বিষাক্ত হয়ে পড়ে, উভয়ের শুভ মিলনের যখন আর কোন আশাই থাকে না, ঠিক তখনই এ চুড়ান্ত পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা। এ হচ্ছে নিরুপায়ের উপায় মাত্র। কিন্তু তাই বলে 'তালাক' দেয়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ইসলাম বরদাশত করেনি। 'তালাক' ব্যবস্থার সঠিক পন্থা পবিত্র কুরআন ও শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস সুন্নায় সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। যদি বিধিবদ্ধ আইন ও পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি দ্বারা পরিচালিত ইসলামী বিয়ে যথাযথভাবে কাজ না করে তাহলে বুঝতে হবে যে সেখানে অবশ্য কোন গুরুতর বাধা বিপত্তি এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। সেখানে নিশ্চয় এমন কিছু ঘটেছে। যা সালিসি-নিষ্পত্তি বা পূর্ণমিলন দ্বারা অতিক্রম করা সম্ভব নয়, কেবল এ ধরনের পরিস্থিতিতেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার জন্য তালাকে বিধান প্রয়োগ করা যেতে পারে। অবশ্য এ হল সর্বশেষ উপায়। এজন্য ইসলাম 'তালাক' ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য ব্যাপক নৈতিক ও আইনগত নির্দেশনা দান করেছে। ইসলামের মূল লক্ষ্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থায়ী হউক এবং তা বিনষ্টের ঘটনা না ঘটুক। তাই পুরুষকে তাগিদ করা হয়েছে যে, সে যেন কেবল নারীদের খারাপ দিকটাই না দেখে। কারণ, হয়ত তার মধ্যে অনেক ভাল দিকও রয়েছে। আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

'অত:পর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন'।[৮২] এরপর যদি বাস্তবিকই কোন অসহনীয় দোষ দেখা দেয়, তবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে তৎক্ষনাৎ 'তালাক' দেয়ার পরিবর্তে প্রথমে তাকে শাসন করবে। এ পর্যাপ্ত না হলে অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য তার নিকট থেকে নিজের বিছানা আলাদা করে নিবে। এটাও অপর্যাপ্ত হলে সে জন্য শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে মৃদু দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা করবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

'আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চিয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।'[৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর সমঝোতা না হলে স্বামীর পক্ষ হতে একজন এবং স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন করে সালিশি নিয়োগের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তারা মিলিতভাবে বিবাদ মীমংসার চেষ্টা করবে। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে, তারা উভয়ের মীমংসা চাইলে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।'[৮৪]

পবিত্র কুরআনুল কারীমের অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ মীমাংসা উত্তম'।[৮৫]

এই আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী অনুধাবন করা যায় যে, উভয়ের মধ্যে সমঝোতা ও নিষ্পত্তি করে দেয়াই শ্রেয়।'তালাক' যেন ক্ষণস্থায়ী ঘৃণার কারণে না হয় সে জন্য যে তহুরে সহবাস হয়নি সে তহুরে 'তালাক' দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনন্তর তালাকের তিনটি পর্যায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং একই সময়ে তিন তালাকের তিনটি পর্যায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং একই সময়ে তিন তালাকের সাহায্যে এই তিনটি স্তর অতিক্রম করা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ, এরপর বৈবাহিক সম্পর্ক পুনবার স্থাপিত হতে পারে না, তাই এক 'তালাক' দিয়ে বিরত হওয়াকে উত্তম বলা হয়েছে। কারণ যদি কোন সমঝোতার সুযোগ সৃষ্টি হয় তবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া অথবা, নতুনভাবে বিয়ের মাধ্যমে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। এমন ধারাবাহিক প্রচেষ্টাও যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তবেই তালাকের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন-

عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض المحلال إلى الله الطلاق.

'হযরত ইবনে উমর(রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (স.) বলেছেন: হালাল সমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃন্য হলো তালাক।'[৮৬]

এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুর'আনের আরো একটি আয়াত তালাকের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি নতুন বিধান যোগ করেছে। অর্থাৎ ইদ্দত বা অপেক্ষাকাল, এর দু'টি কল্যাণকর দিক রয়েছে। (ক) 'তালাক' প্রাপ্তা নারীর কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার পিতৃত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবে না। (খ) স্বামী তার 'তালাক' প্রত্যাহার করে নিজের তাড়াহুড়ার প্রতিবিধান করার অবকাশ পাবে। যেমন, আল কুর'আনে বলা হয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً

'আর তালাক প্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েজ পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকে আল্লাহ যা তার জরায়ূতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সৎভাব রেখে চলতে চায় তাহলে তাদের ফিরিয়ে নেবার অধিকার স্বামীরা সংরক্ষণ করে।'[৮৭] আর এই তালাক প্রত্যাহারযোগ্য ভাবে দুই বার, তৃতীয়বারে হয় প্রত্যাবর্তন, অন্যথায় বিচ্ছেদ'। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

'তালাকে 'রাজঈ' হল দু'বার পর্যন্ত তারপর নিয়ম অনুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েজ নয় তাদের কাছ থেকে।'[৮৮]

মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً

'আর যখন স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও, অত:পর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও। অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে নিশ্চয়ই তারা নিজেদের ক্ষতি করবে। আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না।'[৮৯]

সর্বোপরি মহান আল্লাহ তালাকের বিধানকে বৈধ রেখেছেন এবং এর বিধানকে কঠোর ও করে দিয়েছেন যাতে করে ভেবে চিন্তে মানুষ তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়। তাই তালাক প্রাপ্তা মহিলার দ্বিতীয়বার পূর্ব স্বামীর নিকট বিবাহের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করে মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Dhaka University Institutional Repository

'তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অত:পর যদি স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পূনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই, যদি আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এ হলো আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারীত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়েছে।'[৯০]

হাদীসের ভাষায় এরূপ বিয়ে কারীকে বলা হয়, محلআর যার জন্য করে তাকে বলা হয়

محلل له

মহানবী (স.) এমন ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি লা'নত করেছেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له

'যে লোক এভাবে হালালকারী হয় এবং যার জন্য হালাল করা হয় এ উভয়ের উপরই নবী করীম (স.) লা'নত করেছেন।'[৯১]

উপর্যুক্ত আলোচনায় বুঝা যায়, তালাক যেমন ইসলামে বৈধ অথচ সর্বাধিক ঘৃণ্য একটি বিষয় তদ্রূপ তাহলীল বা হালালার আশ্রয় নেয়াও একটি বিভৎস পন্থা। আমাদের উচিত 'তালাক' এর ব্যাপাওে কুরআন ও হাদীসের গন্ডির বাইরে না যাওয়া, অর্থাৎ স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক না দেয়া এবং মূর্খ সমাজে প্রচলিত হালালার ন্যায় জঘন্য ও বিভৎস পন্থার দ্বারস্থ না হওয়া।অবশ্য এ জন্য প্রয়োজন দেশে মুসলিম পারিবারিক আইন চালু করা। যাতে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশিত পারিবারিক আইন সম্পর্কে সহজেই জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাহলেই আমাদের পারিবারিক জীবনে উত্থিত নানাবিধ সমস্যা ও অশান্তি দূরীভূত হতে পারে।

ইসলামী শরী'আহ আইনে সন্তানের গুরুত্ব ও অধিকার:

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সন্তান-সন্ততির রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ কর্তৃক মানব জাতিকে প্রদত্ত সকল নিয়ামতের মধ্যে সুসন্তান হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন।'[৯২]

স্বামী স্ত্রীর আবেগ উচ্ছাসপূর্ণ প্রেম-ভালবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করে সন্তানের মাধ্যমেই। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলঙ্ক পুষ্পবিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীতে কত অগণিত মানুষ এমন রয়েছে, যাদের সম্পদের কোন অভাব নেই কিন্তু তা ভোগ করার জন্য কোন আপন জন নেই। হাজার চেষ্টা সাধনা এবং কামনা করেও তারা সন্তান লাভ করতে পারছে না। আবার কত অসংখ্য লোক দেখা যায়, যারা কামনা না করেও বহু সংখ্যক সন্তানের জনক। কিন্তু তাদেও কাছে যথেষ্ট পরিমান সম্পদ নেই। তাই বলতে হয়, সন্তান হওয়া না হওয়া একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

لِلّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

'নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন, নিশ্চয়ই তিনি সর্ব ক্ষমতাশীল।'[৯৩]

মানুষ যত বৈষয়িক ক্ষমতার অধিকারীই হোক না কেন ইচ্ছামত সন্তান জন্মাবার ক্ষমতা তার নেই, অন্যদেও সন্তান দান তো দূরের কথা। যার ভাগ্যে সন্তান নেই সে কোন উপায় অবলম্বন করেও সন্তান লাভ করতে সক্ষম হয় না। বস্তুত সন্তান মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। আর তাই মুসলমানগণ দোয়া করে,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান এবং আমাদেরকে মুত্তাকীনদের জন্যে আদর্শ স্বরূপ কর।'[৯৪]

সন্তান সন্ততির মাধ্যমে মানুষ সমাজে মর্যাদার অধিকারী হয় এবং মৃত্যুও পরও এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। শুধু তাই নয়, মানুষ পরকালীন জীবনেও উপকৃত হতে পারে এমন একটি সম্পদ হচ্ছে নেক সন্তান-সন্ততি। মহানবী (স.) বলেছেন,'মানুষ যখন মারা যায় তার সমস্ত নেক আমল বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি আমলের সাওয়াব তার জন্য চালু থাকে : ১। সদকায়ে জারিয়া, ২। উপকারী ইলম (জ্ঞান), ৩। এমন নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।'[৯৫]

নেকসন্তান রেখে যাওয়াকে আমল বলার কারণ এই যে, সন্তান পিতা-মাতার কারনেই পৃথিবীতে আগমন করে এবং তাদের লালন পালনে সে নেক সন্তান হতে পারে। হাদীসে সন্তান কতৃক দু'আর কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে পিতামাতার জন্য দু'আ করার ব্যাপারে সন্তানকে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে পিতামাতার জন্য সব সময় আল্লাহর নিকট দু'আ করা। সন্তানকে নেক সন্তান তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং ইসলাম দির্দেশিত পন্থায় সন্তান-সন্ততির পরিচর্যা। ইসলাম সন্তান-সন্ততির সুষ্ঠু পরিচর্যায় পিতামাতার প্রতি বহুবিধ অধিকার আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছে। মহানবী (স.) বলেন, তোমরা সন্তানদের ব্যাপারে যত্নশীল হও। অবহেলায় পথভ্রষ্ট সন্তান নিজে যেমন ধ্বংস হয়, তেমনি নিজ পিতামাতা এবং অভিভাবকের জন্যও ধ্বংস ডেকে আনে।[৯৬]

সন্তানের গুরুত্ব:

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তান্তিকসহ বহুবিধ কারণে সন্তানের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুর'আনে সন্তানকে সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

المال والبنون زينة الحياة الدنيا.

'ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দয ।'[৯৭]

মানব সমাজে সন্তান-সন্ততি হচ্ছে সৌভাগ্য বা সুসংবাদ স্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন,

يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحى.

'হে জাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহিয়া।'[৯৮]

মানব সমাজে সন্তান পিতামাতার অবদান। পারিবারিক জীবনে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক অকৃত্রিম ভালোবাসা, নির্ভরতা, উভয়ের স্থায়ী শান্তি ও পরিতৃপ্তির একটি মাধ্যম সন্তান। মানব সন্তানের জন্ম হয়ত বা পারিবারিক জীবন ব্যতীত সম্ভব কিন্তু কিন্তু তার পবিত্রতা বিধান, সুষ্ঠু লালন-পালন, সঠিক পরিচর্যা এবং ভবিষ্যৎ সমাজের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা পারিবারিক জীবন ব্যতীত আদৌ সম্ভব নয়। মানব জাতির সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনায় পবিত্র কুরআনে প্রথম নর-নারীর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পারিবারিক জীবন যাপনের প্রতিই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً.

'হে মানব সমাজ ! তোমরা তোমাদের পালন কর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এবং ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।'[৯৯]

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে উপস্থাপিত এ পারিবারিক জীবনের উদ্দেশ্য শুধু স্বামী-স্ত্রীর আনন্দ উপভোগই নয়, বরং তার মূলে বৃহত্তর লক্ষ হচ্ছে সন্তান জন্ম দান, সন্তানের লালন-পালন এবং সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে তাদেরকে ভবিষ্যৎ সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

সন্তান-সন্ততি যেমন আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত তদ্রুপ পরীক্ষার বস্তুও বটে। কারণ পৃথিবী মানব জাতির জন্য পরীক্ষার বস্তু হিসেবে স্বীকৃত। অনুরূপভাবে আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ আর সন্তান- সন্ততিও পরীক্ষার বিষয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن الله عنده أجر عظيم.

'আর জেন রাখ তোমাদের ধম-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যণের সম্মুখীনকারী। বস্তুত আল্লাহর নিকট রয়েছে মহান সওয়াব।'[১০০]

উক্ত আয়াত থেকে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যেমন করে ধন-সম্পদ আল্লাহর দেয়া নিয়ামত, সন্তান-সন্ততিও অনুরূপভাবে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত, অন্যায় পথে ব্যয় করলে কিংবা যথাস্থানে ব্যয় না করলে যেমন আমানত খিয়ানত হয়, সন্তান-সন্ততিকেও ভুল পথে এবং অন্যায় কাজে নিয়োজিত করলে, তেমনি আল্লাহর আমানত খিয়ানত হবে। তাই আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত সন্তান-সন্ততিকে অবশ্য চরিত্রবানও সুমানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কেননা সন্তান যদি অসৎ প্রকৃতির হয়ে গড়ে উঠে তাহলে এ সন্তান পিতামাতার বিপদের করণ হয়ে দাঁড়াবে।

সন্তানের অধিকারঃ

নয়নপ্রীতিকর, সুসন্তান তথা সমাজ ও মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে সন্তান জন্মদান, সন্তানের লালন-পালন, সর্বোপরি সন্ত ান-সন্ততির সঠিক পরিচর্যা। পিতামাতাকে সন্তান-সন্ততির জন্ম থেকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলা পর্যন্তযাবতীয় অধিকার যথাযথভাবে আদায় করে তাদেরকে মানুষ হিসেবে গড়ে উাার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে। ইসলাম পিতামাতার উপর সন্তানের বহুসংখ্যক মানবিক অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে। জাতিসংঘ সনদে শিশু অধিকার সংবলিত বিশেষ ধারা সংযোজনের বহুকাল পূর্বে ইসলাম সন্তানের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আসছে এবং শিশু সন্তানের পরিচর্যার বিষয়টিকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত করে দিয়েছে। ইসলাম যে সন্তানের জন্মমুহূর্ত থেকেই তার অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে যথাযথভাবে আদায় করার প্রতিও নির্দেশ আরোপ করেছে।[১০১]

সন্তান হচেছ পিতামাতার নিকট আল্লাহর আমানত স্বরূপ। তাদের আকীদা, বিশ্বাস, মন-মগজ, চরিত্র-অভ্যাস, জীবন যাত্রার ধারা ইত্যাদিকে সঠিকরূপে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা

Dhaka University Institutional Repository

পিতামাতারই কর্তব্য। পিতামাতা সন্তানকে এমন গুণের অধিকারী করে গড়ে তুলবেন, যেন সন্তান সমাজের জন্য বোঝা বা ক্রীড়ানক না হয়ে আর্শীবাদ হয়। এ বিষয়ের প্রতিই ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। সন্তানকে নেক ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার জন্য সন্তানের বহুবিধ অধিকার যথাযথভাবে পালনের প্রতি ইসলাম জোরালো নির্দেশ দিয়েছে। সন্তানের গর্ভপূর্বাবস্থা থেকে সন্তানকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সময় পর্যন্ত ইসলাম নির্দেশিত অধিকার সমূহ আলোচিত হল-

উপযুক্ত মা নির্বাচন :

সন্তানের শরীর ও মন কেমন হবে তা অনেকটা নির্ভর করে মায়ের উপর। ইসলাম তাই সন্তান গ্রহণের পূর্বে উপযুক্ত দীনদার মা নির্বাচনে তাকীদ করেছে। মা সন্তানের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠজন ও প্রাথমিক শিক্ষক। মা ভাল হলে তার গর্ভের সন্তান ও ভাল হবে। এ সম্পর্কে রাসুল (স.) এর কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق رساس.

'রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন , 'ভাল সন্তানলাভ করতে হলে ভাল দ্বীনদার সন্তান দেখে বিবাহ কর। কারণ সন্তানের মধ্যে পূর্বপুরুষের স্বভাব প্রকৃতি বিস্তার লাভ করে থাকে।[১০২]

অন্যত্র রাসূল (স.) বলেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لما لها ولحسبها ولجملها فاظفر بذات الدين.

'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, সাধারণত চারটি কারণে কোন মেয়েকে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার সৌন্দর্য, তার বংশ মর্যাদা ও তার দ্বীনদারী বা ধর্মপরায়ণতা। তবে তার ধর্মপরায়ণতাকেই অগ্রাধিকার দিবে।'[১০৩]

এই হাদীসে নারীর সম্পদ, সৌন্দর্য, বংশ গৌরব ধমানুরাগকে এমন বিশেষণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে যার আলোকে তাকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তবে ধর্মানুরাগই সর্বাধিক বিবেচ্য বিষয়। বংশীয় পবিত্রতা এবং সুস্থ সবলভাবে জন্ম গ্রহনের অধিকার শুধু ইসলামই দিয়েছে, এর জন্য বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থাও বর্ণনা করা হয়েছে। রাসুল (স.) এর দু'টি হাদীস এখানে উল্লেখ্য।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا القربة فان الولد يخلق ضاويا.

'রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, নিজ গোত্রে বিবাহ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাক। কারণ তাতে শারীরিক ও মানসিকভাবে দূর্বল সন্তান জন্ম নেয়।'[১০৪]

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম আল-গাযালী (র.) (১০৫৮-১১১১খ্রিঃ) অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, 'অতি নিকটাত্মীয়দের (First cusin) মধ্য থেকে পাত্র পাত্রী নির্বাচন করা সঙ্গত নয়। কারণ সন্তান ক্ষীণকায় ও মেধাহীন হতে পারে।'[১০৫]

অন্যত্র রাসুল(স.) বলেন,

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.

'তোমরা অধিক ভালবাসা ও অধিক সন্তান দানকারীনী নারীদের বিবাহ কর। আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য দিয়ে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব।'[১০৬]

সুতরাং, বলা যায় যে, ইসলাম শুধু জন্মের পর থেকেই সন্তানের প্রতি গুরুত্ব দেয় না। জন্মের পূর্ব থেকেই ইসলাম তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। সন্তান একটি পবিত্র বংশধারায় জন্মগ্রহনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

নবজাতকের আগমনে আনন্দ প্রকাশ:

সন্তান জন্মের পর অভিভাবক ও আত্মীয়দের পক্ষ থেকে আনন্দ প্রকাশ করা ইসলামের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব। ফকীহগণ বলেন, তৎক্ষণাৎ আনন্দ প্রকাশের সুযোগ না পাওয়া গেলে পরে নবজাতক ও তার পিতামাতার জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব। মদীনায় মুহাজির সাহাবীগণের প্রথম সন্তান ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়ার (রা.)। তাঁর জন্ম লাভে আনসার মুহাজির সাহাবীগণ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।[১০৭]

নবজাতকের কানে আযান ও ইকামত দেয়া:

শিশু জন্মগ্রহনের পর তাকে গোসল দিতে হয়। গোসল দানের পর সর্বপ্রথমে তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নাত। এ সম্পর্কে রাসূল (স.) থেকে বর্ণিত নিম্নোল্লিখিত হাদীস খানা উল্লেখযোগ্য,

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له مولود فاذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وعن الحسن بن علي رضي الله عنه لم تضره لم الحصبيان.

'হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, যে নবজাতীকের জন্মের পর তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেয়া হয়, সে নবজাতক শিশু মাতৃকা রোগ থেকে নিরাপদ থাকে।'[১০৮]

Dhaka University Institutional Repository

তাহনীক মিষ্টিমুখ করণ:

তাহনীক অর্থ হল খেজুর অথবা কোন মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য মুখে চিবিয়ে নরম করে শিশুর মুখে তুলে দেয়া যেন রসের কিছু অংশ তার পেটে যায়। মহানবী (স.) বলেন-

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم.

'রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে নবজাতক শিশুদের (দু'আ করার জন্য) পেশ করা হত তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন এবং তাদেরকে মিষ্টিমুখ করাতেন।'[১০৯]

তাহনীকের একটি উপকারিতা হল নবজাতকের মুখে চর্বিত বস্তু দেয়ার পর জিহবা দ্বারা নড়াচড়ার কারণে তার দাঁতের মাড়ি মযবুত হয় এবং আরো একটি বিশেষ উপকার হচ্ছে যে মাতৃস্তন্য মুখে লাগানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় এবং পূর্ণশক্তি দিয়ে মাতৃদুগ্ধ পান করতে অভ্যস্ত হয়।

সন্তানের সুন্দর নাম রাখা:

ইসলামে নাম অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক মুসলিম সন্তানের শরী'আ সম্মত সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা অতি প্রয়োজন। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

'আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম, কাজেই সে নাম ধরেই তাকে ডাক।'[১১০]

শেষ বিচারের দিনের মানুষ তাদের নাম ও পিতার নামে পরিচিত হবে। রাসূল (স.) সে সংবাদ জানিয়ে বলেছেন,

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فاحسنوا أسمائكم.

'নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজ নামে এবং তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমরা তোমাদের সুন্দর নাম রাখ।' [১১১]

অবশ্য সে সুন্দর নামের বিন্যাস হতে হবে রাসূল (স.) ও তার সাহাবী (রা.) গণের সুন্নাহ অনুযায়ী। আমাদের এ উপমহাদেশে প্রচলন না থাকলেও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, মুসলমানদের নামের সাথে পিতার নাম সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

সন্তানের আক্বীকাহ করা:

সন্তান জন্মের পর তার জন্য আকীকাহ করা পিতামাতার দায়িত্ব। মহানবী (স.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويسمى فيه ويحلق رأسه.

Dhaka University Institutional Repository

'প্রতিটি সদ্যোজাত সন্তান আকীকাহর সাথে দায়বদ্ধ। জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে পশু যবেহ করতে হয় এবং তার মাথা কামিয়ে ময়লা দূর করতে হয়।'[১১২]

শিশু দিনে দিনে বড় হয়। আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলতে শেখে। শব্দ ও বাক্যের সাথে পরিচিত হয়। ইসলামের নির্দেশ হল, শিশু সর্বপ্রথমে যে বাক্যটি শিখবে। সেটা যেন হয় কালিমা তায়্যিবা। হাদীস আছে,

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا على شبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله.

'হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা নিজ শিশুদেরকে সর্বপ্রথমে যে কথাটি শেখাবে, সেটি যেন হয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[১১৩]

মাতৃদুগ্ধ পান সন্তানের জন্মগত অধিকার:

'মায়ের দুধের বিকল্প নেই' এ কথাটি সর্বজনবিদিত। চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্রমাগত গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, শিশুর জন্য মায়ের দুধই সর্বোত্তম ও নিরাপদ খাবার। মায়ের দুধে রয়েছে এমন সব উপাদান, যা যে কোন ধরনের সংক্রমন থেকে শিশুকে রক্ষা করতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমানে পুষ্টি ছাড়াও মায়ের দুধ শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। পবিত্র কুরআনে শিশুকে পূর্ণ দুই বছর পর্যন্ত দুধ পান করানোর নির্দেশ দিয়েছে। বলা হয়েছে,

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أين يتم الرضاعة.

'আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চান'।[১১৪]

এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফতি মুহাম্মদ শফী (রা.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ মাআরিফুল কুরআন এ উল্লেখ করেছেন, এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, প্রথমত শিশুদের স্তন্য দান করা মায়ের উপর ওয়াজিব। কোন অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির কারণে স্তন্যদান বন্ধ করলে পাপ হবে। দ্বিতীয়ত স্তন্য দানের জন্য স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে কোন প্রকার পারিশ্রমিক বা বিনিময় পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকে। কেননা, এটা স্ত্রীর স্বীয় দায়িত্ব। তৃতীয়ত পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের সময় পূর্ণ দু'বছর যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয় তবে তা সন্তানের অধিকার। এতে আরো বুঝা যাচ্ছে যে, স্তন্য পানের সময়সীমা দু'বছর, এরপর স্তন্য পান করানো যাবে না। তবে কুরআনের অপর আয়াতের [১১৫] আলোকে ইমাম

Dhaka University Institutional Repository

আবু হানিফা (রা.) (৮০-১৫০ হিজরী) শিশুর দূর্বলতার ক্ষেত্রে ৩০ মাস (আড়াই বছর) পর্যন্ত এ সময় সীমাকে বর্ধিত করেছেন। আড়াই বছর অতিক্রম হওয়ার পর শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দান সকল ইমামের মতে হারাম।[১১৬]

সন্তানের আলাদা (শয্যায়) শয়নের অধিকার:

পিতামাতার উপর সন্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট বয়সে তার জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করা। এ সম্পর্কে রাসূল (স.) এর হাদীস,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرو أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع.

'মহানাবী (স.) ইরশাদ করেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন ৭ বছর হয় তখন তাদেরকে নামাযের জন্য আদেশ কর, ১০ বছর বয়সে তাদেরকে নামাযের জন্য হালকা মার দাও এবং তাদের শয্যা আলাদা করে দাও।'[১১৭]

ইমাম গাযালী (র.) (১০৫৮-১১১১খ্রিঃ) বলেন, ছয় বছর বয়স হলে তাকে আদব শিখাবে, নয় বছর বয়সে তার বিছানা পৃথক করে দিবে এবং তের বছর বয়সে তাকে নামাযের জন্য প্রহার করবে।[১১৮] আলাদা শয্যার ব্যবস্থা পৃথক পৃথক কক্ষে হতে পারে। একই কক্ষের বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে। তবে প্রত্যেকের শয্যা পৃথক হতে হবে।

সন্তানের ভবিষ্যত নিরাপত্তা বিধান:

সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম পিতামাতার প্রতি আরোপ করেছে বিশেষ দায়িত্ব। সন্তান হচ্ছে পিতামাতার নিকট মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র আমানত। যদি পিতামাতার অজ্ঞতা বা অক্ষমতার কারণে শিশুদের দেখাশুনায় মনোযোগী না হয়, তবে অবশ্যই তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.

'মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর।'[১১৯]

নিজেদের পরিবার পরিজনকে ধ্বংস ও আগুনের হাত থেকে বাঁচানোর বিষয়টি নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর মতই সমান গুরুত্ব রাখে। আর এ ধ্বংস থেকে পরিত্রাণের বিষয়টি পরকালের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তদ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ পার্থিব জীবনেও। সন্তান যাতে পার্থিত জীবনে আর্থিক অসুবিধায় পড়তে না হয় সে বিষয়ে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানের চরিত্র গঠন:

সন্তানকে সমাজের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং আদর্শবান করে গড়ে তুলতে হবে। কাজেই সন্তানকে চরিত্রবান করে গড়ে তোলার ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের তথা পিতামাতার সদা সজাগ থাকতে হবে। চরিত্র গঠন বলতে তাদের মধ্যে দুষ্ট চরিত্রের (আখলাকে বাসীমাহ) প্রতি ঘৃনার মনোভাব সৃষ্টি করা বুঝায়। যেমন অহংকার, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, গীবত, চোগলখোরী, মূর্খতা, উদাসীনতা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদির প্রতি তাদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করাতে হবে। সাথে সাথে তাদের মাঝে আল্লাহ্ রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, কুরআন, হাদিস ইত্যাদির প্রতি অসাধ বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং সততা, আমানতদারী, অঙ্গীকার পূরণ করা, দানশীলতা, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার মত মহৎ গুণাবলী শিক্ষা দিতে হবে। মহানবী (স.) বলেন, 'কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন তার জন্য একটি সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তমরূপে তাকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়।'[১২০]

পিতামাতাসহ পরিবারের বড়দের দায়িত্ব শিশু সন্তানদের ভদ্রতা-নম্রতা শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে গর্ব ও অহংকার করতে না দেয়া। ভালো কাজের জন্য সন্তানকে বাহবা দেয়া এবং সম্ভব হলে কিছু উপহার দেয়া প্রয়োজন। এতে ভালো কাজের প্রতি শিশুর আগ্রহ বাড়বে। আর মন্দ কাজের জন্য সাথে সাথে তিরস্কার না করে বুঝিয়ে দেয়া আবশ্যক। তাহলে সন্তাননের মধ্যে খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে।

সন্তানের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা:

ইসলাম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে হলে দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, এবং কাপড়-চোপড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পাত্র থেকে খাবার গ্রহন করতে হয়। মনোদৈহিক রোগ থেকে বাঁচার জন্য অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি পবিত্র মন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাঁদেরকে পছন্দ করেন।' [১২১]

আধুনিক বিজ্ঞান ও পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রমাণিত করেছে। বর্তমান বিজ্ঞান পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। বিশেষত রোগ-প্রতিরোধে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং

Dhaka University Institutional Repository

শিশুকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে পরিবারের তথা পিতামাতার। সন্তানের দৈহিক পরিচ্ছন্নতা এবংপোশাক-পরিচ্ছন্নতা পুরোটাই নির্ভর করে পিতামাতার উপর।

সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা:

স্নেহ, ভালবাসা, আদর, যত্ন ও সোহাগের ক্ষেত্রে পিতামাতার কাছে পুত্র ও কন্যা উভয়েই সমান হকদার, তাদের মধ্যে এক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যবধান করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। হাদীসে আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم.

রাসুলুল্লাহ (স.) তিনবার বলেন, 'তোমরা নিজ সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখবে, তোমরা সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখবে, তোমরা সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখবে।'[১২২]

সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় করা:

সন্তান নিজে কর্মক্ষম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অভিভাবক ও পিতামাতার তত্ত্বাবধানে থাকে। সে কতদিন বেঁচে থাকবে আর বেঁচে থাকলেও পিতামাতার দায় কতটুকু শোধ করবে। সে প্রশ্ন অবান্তর সন্তানের জন্য এ সময় যে অর্থ ব্যয় করা হয়, ইসলামে তা নেক আমল বলে গন্য করা হয়েছে। সন্তানের জন্য ব্যয়কৃত প্রতিটি পয়সা উচ্চ পর্যায়ের সদকা বলে হাদীসে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মহানবীর হাদীস -

دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على أهلك أعظم أجرا الذي انفقته على أهلك.

'মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, দীনার (পয়সা-কড়ি) বিভিন্নভাবে খরচ হয়। তন্মধ্যে যে টাকা পয়সা তোমরা খরচ কর আল্লাহর পথে জিহাদে, যেগুলো খরচ কর গোলাম আযাদের কাজে, যেগুলো সদকা কর গরীব মিসকীনের জন্য আর যেগুলো খরচ কর নিজ পরিবার পরিজন ও সন্তানের জন্য, এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সওয়াবের ব্যয় হল, সেই টাকা পয়সা যেগুলো তোমরা নিজ পরিবার ও সন্তানের জন্য ব্যয় করে থাক।'[১২৩]

সন্তানের সুস্থ্যতা স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি, ও সুচিকিৎসার প্রতি নজর যত্নবান হওয়া:

অভিবাবকদের জন্য সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী। এশটি নির্ধারিত বয়স পর্যন্ত শিশুদের শরীর ক্রমে প্রবৃদ্ধি লাভ করে। এ সময়ে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে ও লালন-পালনে

Dhaka University Institutional Repository

সঠিক যত্নশীল না হলে সমূহ ক্ষতির আশংকা থাকে। স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন ও দায়িত্বহীন আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে বড় ধরনের অপরাধ। হাদীসে বলা হয়েছে,

قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثم أين يوضع من يقوت.

রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, 'মানুষ গুনাহগার ও অপরাধী বিরোচিত হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, যাদের ভরণ-পোষণ তার দায়িত্বে, সেই পোষ্য লোকেরা তার খামখেয়ালীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' [১২৪] আর শিশুর বয়সে রোগব্যাধি বেশী হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) শিশুদের চিকিৎসার জন্য তাকিদ দিতেন। শিশুদের প্রতি 'বদনজর' লাগাকে তিনি সত্য বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আয়েশা দিদ্দিকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ কোন রোগীর শুশ্রুষায় গেলে তাকে নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে ফুঁ দিয়ে দিতেন-

[১২৫] اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما.

রাসূল (স.) অন্যত্র বলেন,

قال النبي الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام.

রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, 'মহান আল্লাহ রোগ ও চিকিৎসা উপায় দান করেছেন। প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা নির্ধারিত আছে। কাজেই তোমরা চিকিৎসা কর কিন্তু হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করো না।' [১২৬]

ইয়াতীম সন্তানের লালন পালনঃ

পিতৃহীন সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইয়াতীম হিসেবে পরিগণিত। এ ইয়াতীমদের লালন-পালনের ভার তার নিকটাত্মীয় স্বজন যেমন পিতা-মাতাকে জবাবদিহি করতে হয়। ইয়াতীমদের ব্যাপারে তদ্রূপ তার নিকটত্মীয়, রাষ্ট্রের ও সমাজের লোকজনকে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে ইয়াতীম ছিলেন। ইয়াতীমদের প্রতি তাই তাঁর মমতাও বেশী ছিল। হাদীসে আছে,

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة وأشار بالأصبيه يعني السبابة والوسطى.

রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, আমি ও ইয়াতীমের লালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকবো-কথাটি নবী করীম (স.) নিজের শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুলীদ্বয়কে একত্রিত করে দেখিয়েছেন। [১২৭]

Dhaka University Institutional Repository

আহকামে শরী'আতের তালীম দান ও শিষ্টাচার শিক্ষাদান:

ইসলাম প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞানার্জনকে ফরয করে দিয়েছে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সন্তানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা ও আখলাক উন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগী করে তোলা ইসলামের মৌলিক নীতি। সন্তানের মধ্যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এবং সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা পিতামাতার নৈতিক দায়িত্ব। অন্যায়, মিথ্যাচার, মদ-নেশা, সন্ত্রাস ও বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচারে যাতে সন্তানেরা লিপ্ত না হয় সে দিকে পিতামাতার নজর দান করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। মহান আল্লাহ হযরত লুকমান (আ.) স্বীয় পুত্রের প্রতি যে উপদেশ দিয়েছিলেন পবিত্র কুর'আনে তা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا بُنَيَّ أَقِمْ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ المُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ.

'হে বৎস, নামাজ কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর।'[১২৮]

মহানবী (স.) আহ্কামে শরী'আতের তালীমে গুরুত্বারোপ করে বলেন,

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك وقاية لهم من النار.

মহানবী (স.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'তোমরা নিজ সন্তানদেরকে শরী'আতের আদিষ্ট বিষয়াদি পালনের এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার হুকুম দিবে। কারণ এটিই হল তাদের জন্য জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকার উপায়।'[১২৯]

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স.) শিষ্টাচার শিক্ষা দানে উৎসাহী করতে গিয়ে বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن.

রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, 'পিতা নিজ সন্তানকে যে উপঢৌকন দান করে, তার মধ্যে সর্বোত্তম উপঢৌকন হল সুন্দর শিষ্টাচার শিক্ষা দান।'[১৩০]

মোটকথা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পিতামাতার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় সন্তানদেরকে নৈতিক ও আদর্শ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শাসন-প্রশাসন, বিচার, বাণিজ্য, যোগাযোগসহ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবকল্যাণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার যোগ্য করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরী'আহ্ আইনে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য:

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার :

মহান আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি মানব জাতি। এই মানব জাতির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে এক অপরের উপর রয়েছে বিশেষ অধিকার। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে-উভয়ের জন্য সম্পূরক সত্তা। এ কারণে কুরআন ও হাদীসে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন হবে অনাবিল আনন্দের, সুখের ও কল্যাণের। আর এই অনাবিল সুখের বিষয়টি মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করে বলেন, 'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পরস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।'[১৩১]

অন্য এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

'তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।' [১৩২]

নি:সন্দেহে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে কখনো কখনো বিরোধ দেখা দেয়া এবং অসচেতনতার কারণে নিজেদের মধ্যে অনাকাঙ্খিত কিছু ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এগুলোর সমাধান কল্পে ইসলামী শরী'আতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলনীতি রয়েছে। দাম্পত্য জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পরিচালনার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের এগুলো মেনে চলা অপরিহার্য। সন্দেহ নেই, এতে গোটা জাতি বিশেষত মুসলিম সমাজ উপকৃত হবে। দাম্পত্য জীবন সংশ্লিষ্ট এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া তাই একান্ত জরুরী। এই প্রেক্ষিতে স্ত্রীর দায়িত্ব ও স্বামীর অধিকার এবং স্বামীর দায়িত্বও স্ত্রীর অধিকার এ দু'টি বিষয়কে নিবে তুলে ধরা হল।

স্ত্রীর দায়িত্ব ও স্বামীর অধিকার :

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সম্পর্ক বজায় রাখতে স্ত্রীর দায়িত্ব ও স্বামীর অধিকার বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে। তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।'[১৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর প্রধানতম দায়িত্ব হল স্বামীর আনুগত্য করা। হাদীদে এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ রয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.

'কোন স্ত্রীলোকের প্রতি তার স্বামী সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় সে যদি মারা যায় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১৩৪]

স্ত্রীকে অবশ্যই সৎ, বিশ্বাসযোগ্য এবং আমানতদার হওয়া আবশ্যক। এমনিভাবে স্বামীর ধন-সম্পদের সংরক্ষণ করার স্ত্রীর অন্যতম দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হিফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হিফাযত করে।' [১৩৫]

স্ত্রীকে এমন এতে হবে যাতে তাকে দেখলেই স্বামীর চোখ জুড়ায়। কুরআন মজীদে এ সম্বন্ধে বিশেষ দু'আ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর।'[১৩৬]

স্বামীর দায়িত্ব ও স্ত্রীর অধিকারঃ

স্বামীর ব্যাপারে যেমন স্ত্রীর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর কিছু দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। স্বামীর প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীর মহর আদায় করে দেয়া, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। ভরণ-পোষণ বলতে আবাস, পোশাক, খাবার ইত্যাদি স্ত্রীর অখন্ডনীয় অধিকারকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট দান করেছেন এবং এ জন্য যে,তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।'[১৩৭]

স্বামীর অপর একটি দায়িত্ব হল স্ত্রীর প্রতি সদাচার করা এবং তার প্রতি আন্তরিকতা ও ভালবাসা পোষণ করা। মহান আল্লাহ বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

'নারীদের সাথে সদভাবে জীবন যাপন কর। অত:পর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর। তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।' [১৩৮]

উল্লেখিত আয়াতে এদিকেও বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে অনেক কিছুকে ছাড় দেয়া অতন্ত জরুরী। আর পরিবারের প্রতি যত্নবান হওয়াও পরস্পরের দায়ীত্ব। এ সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন,

عن ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته.

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি নবী করীম (স.) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের প্রত্যেইই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীর দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা বাদ করা হবে। ইমাম বা শাসক একজন দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘর রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকেও তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। খাদিম তার মুনিবের মাল সংরক্ষণ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং সেও তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' [১৩৯]

মুসলিম পরিবারে পিতামাতার ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার:

ইতোপূর্বে মুসলিম সমাজে সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম কোন ক্ষেত্রেই একতরফা হক ধার্য করেনি। পিতামাতার উপর যেমন সন্তানের হক রয়েছে, তেমনি সন্তানের উপরেও পিতামাতার হক রয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক হল পরস্পরের পরিপূরক। ইসলামে পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক পারস্পরিক কর্তব্য ও অঙ্গীকার দ্বারা নিবিড়ভাবে সুসঙ্গবদ্ধ, কিন্তু বয়সের পার্থক্যটা কখনও কখনও এত বিরাট হয়ে দাঁড়ায় যে, তা পিতামাতাকে শারীরিক দিক থেকে দূর্বল ও মানসিক দিক থেকে পঙ্গু করে ফেলে। এর প্রায় সাথে সাথে আসে অসহিষ্ণুতা শক্তির অবক্ষয়, অত্যধিক স্পর্শকাতরতা এবং সম্ভবত ভুল ধারণা। এর পরিণাম পিতামাতার কর্তৃত্বের অপব্যবহার কিংবা আন্তঃপুরুষ বিচ্ছিন্নতা ও অস্থিরতা পর্যন্ত গড়াতে পারে। [১৪০] সম্ভবত এসব বিষয় বিবেচনা করে ইসলাম কতিপয় মৌল শর্তের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং পিতামাতার সন্তানের সম্পর্ক রক্ষার মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সারা জীবন ধরে

Dhaka University Institutional Repository

পিতামাতা ভালোবাসা, কোমল অনুভূতি এবং বৃদ্ধ বয়সে অধিকতর সেবা শুশ্রুষা প্রাপ্য। পবিত্র কুর'আনে পিতামাতা ও সন্তানের পরস্পরের পরিপূরক সম্পর্ককে অতি সংক্ষেপে ইহ্সান এর ব্যাপকতম ধারণার মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে, যা সত্য, ন্যায় ও সুন্দরকে পরিস্কারভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে। [১৪১]

পিতামাতার লালন পালন ও ভরণপোষণের জন্য সন্তানেরাই বাধ্য, পিতামাতার জীবনকে যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন অনুভূত হলে সর্বোতভাবে সাহায্য করা সন্তানের পক্ষে একটি অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য। আল-কুর'আনে বারবার আল্লাহর প্রতি দায়িত্বের সাথে সাথে আদম সন্তানকে পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً

'আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তার সাথে অপর কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর।' [১৪২]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। আর মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরে নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে।' [১৪৩]

একই বিষয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً

'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপণীত হয়, তবে তাদের 'উহ' শব্দটিও বলা না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে পালনকর্তা তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর। যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।' [১৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

'সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ বাৎসল্য আর পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি শ্রদ্ধা এক চিরন্তন স্বাভাবিক নিয়ম। ইসলাম এ স্বাভাবিক নিয়মকে চিরজীবন্ত করে রাখতে চায়। পারিবারিক পর্যায়ে এশটি শিশু তার শিশুকালে যেরূপ সেবা যত্নে প্রতিপালিত হয়, বয়স্কদের তাদের সন্তানদের থেকে সেরূপ আদর যত্ন পাবার স্বাভাবিক এবং মানবিক অধিকার রয়েছে। আর এ অধিকারগুলোই উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

নবী করিম (স.) বলেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك – قال ثم من قال أبوك.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক, লোক রাসূল (স.) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেন : তোমর মা, লোকটি বললেন, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন তোমার মা, লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন তোমার মা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? রাসূল (স.) বললেন: তারপর তোমার পিতা।' [১৪৫]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বহু হাদীসে পিতামাতার প্রতি সদাচরণ ও সদ্ব্যবহারের ফযীলত ও সুফল বর্ণনা করেছেন। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল,

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد.

' হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (স.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স.) বলেছেন, পিতার সন্তুষ্টিতেই মহান প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসুন্তুষ্টিতেই মহান প্রতিপালক আল্লাহর অসুন্তুষ্টি নিহিত।' [১৪৬]

রাসূল আকরাম (স.) বহু হাদীসে উল্লেখ করেছেন, পিতামাতার নাফরমানী ও অবাধ্যতা কবীরা গুনাহ, মহাপাপ এবং পরিণতি খুবই খারাপ এবং এর শাস্তি ভয়াবহ। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) এর হাদীস-

عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات وأدات البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুগীরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (স.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন পিতামাতার নাফরমানী করা, প্রাপকের প্রাপ্য আটকে রাখা। যা গ্রহণ করা জায়েয নয়, তা তলব করা। এবং কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া। আর তিনি তোমাদের জন্য অপসন্দ করেছেন। অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করা ।' [১৪৭] অন্য এক হাদীসে মা, বাপের ফরিয়াদ কবুল হওয়ার সম্পর্কে রাসূল (স.) থেকে বর্ণিত আছে,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده.

হযরত আবু হুরায়বা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন: তিনটি দু'আ অবশ্যই কবুল হয়, এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। মাযলুমের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের ব্যাপারে পিতার দু'আ।' [১৪৮]

সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ বাৎসল্য আর পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি শ্রদ্ধা এক চিরন্তন স্বাভাবিক নিয়ম। ইসলাম এ স্বাভাবিক নিয়মকে চির জীবন্ত করে রাখতে চায়। পারিবারিক পর্যায়ে একটি শিশু তার শিশুকাল যেরূপ সেবা যত্নে প্রতিপালিত হয়, বয়স্কদের তাদের সন্তানদের থেকে সেরূপ আদর যত্ন পাবার স্বাভাবিক ও মানসিক অধিকার রয়েছে। আর এ অধিকার গুলোই উপরিউক্ত আয়াতে এবং হাদীস সমূহে বর্ণিত আছে। যেমন, ক) তাঁদেরকে সন্তান সন্ততি কর্তৃক শ্রদ্ধাভরে সম্বোধন করতে হবে। কোন প্রকার বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞাসূচক শব্দ উচ্চারণ করা যায় না। নম্রভাবে তাঁদের সাথে কথা বলতে হবে।

খ) তাঁদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। তাঁদেরকে ধমক দেয়া যাবে না এবং তাঁদেরকে বৃদ্ধ বয়সে পরিত্যাগ করা যাবে না।

গ) পিতামাতার প্রতি নম্র, ভদ্র, আনুগত্য ও অবনত আচরণ করতে হবে।

ঘ) পিতামাতার প্রতি শুধুমাত্র নম্রভাবে আচরণ করলেই চলবে না, তাঁদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর নিকট মুনাজাত করতে হবে। এ মুনাজাতের মধ্যে তারা শিশুকালে সন্তানের প্রতি যেরূপ স্নেহ মমতা প্রদর্শন করেছিলেন তার স্বীকৃতি এবং কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে। আর এই মুনাজাত শুধু একবার দু'বার করলে চলবে না, বারবার করতে হবে এবং প্রতিদিনই নামাযের পর করতে হবে। এ মুনাজাতের মাধ্যমে পিতামাতার প্রতি অধিকতর দায়িত্ব সচেতন হতে হবে। [১৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানের উপর পিতামাতার অধিকার এত বেশী যে, তাঁদের অনুমতি ছাড়া এমনকি জিহাদেও যোগদান করতে ইসলাম অনুমতি দেয়নি। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (স.) এর নিকট এসে বললেন, আমি আপনার কাছে জিহাদ ও হিজরত করার শপথ গ্রহন করতে চাই। আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা রাখি। নবী করীম (স.) বললেন, তোমর পিতামাতার কেউ কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ, বরং উভয় (জীবিত আছেন) তিনি বললেন, এরপর ও তুমি আল্লাহর আছে প্রতিদান আশা কর? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, পিতামাতার কাছে ফিরে যাও, তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং তাঁদের খিদমত কর। [১৫০]

পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করা, তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাঁদের মনে কষ্ট দেয়া ও তাদের সাথে নাফরমানী করা নি:সন্দেহে অত্যন্ত বড় অপরাধ। এমনকি যারা এরূপ করে তদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকে। তবে যদি পিতামাতা ভিন্নধর্মী হন এবং সন্তানদেরকে ইসলাম হতে বিছিন্ন করতে চান তা হলে সেরূপ পিতামাতার আল্লাহ বিরোধী নির্দেশ পালন করতে সন্তান বাধ্য নয়। তবে পিতামাতা যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন, তাঁদের সাথে অবশ্যই সদ্ব্যবহার করতে হবে। কোনক্রমেই রূঢ় ব্যবহার করতে পারবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহর কড়া নির্দেশ হল,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ.

'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পাড়াপাড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহ অবস্থান করবে। যে আমার অভিমূখী হয়, আর পথ অনুকরন করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করব।' [১৫১]

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আরো একটি প্রধান উপায় হল, তাঁদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচারণ করা। নবী করীম (স.) পিতামাতার সাথে সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মুরব্বী আত্মীয় হোক অথবা আত্মীয় সকলের সাথেই সুন্দর ব্যবহার করা কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা হল,

عن بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن البر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স.) কে বলতে শুনেছি, শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার হল পিতার বন্ধুদের প্রতিও সদ্ব্যবহার করা।' [১৫২]

সর্বোপরি পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা প্রতেক মানুষের ইমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে রাসূল(স.) নিম্নোক্ত হাদীস খানা মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি অধিক উৎসাহ প্রদান করে। যেমন- 'পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী পুত্র যখন রহমতের দৃষ্টিতে তার পিতামাতার দিকে তাকায় তখন আল্লাহ তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজ্জের সাওয়াব লিখে দেন। সাহাবীগণ আরজ করেন, যদি সে প্রতিদিন একশত বার করে তাকায়? বললেন, যদি সে ইচ্ছা করে একশত বার তাকাতে পারে। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড় এবং পূত পবিত্র।' [১৫৩]

ইসলামী শরী'আহ আইনে কোন ক্ষেত্রেই এক তরফা হক ধার্য করেনি। পিতা-মাতার উপর যেমন- সন্তানের হক রয়েছে, তেমনি সন্তানের উপরেও পিতা-মাতার হক রয়েছে। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক হল পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। ইসলামে পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, পারস্পারিক কর্তব্য ও অঙ্গীকার দ্বারা নিবিড়ভাবে সুসংবদ্ধ। কিন্তু বয়সের পার্থক্যটা কখনও কখনও এত বিরাট হয়ে দাঁড়ায় যে, তা পিতামাতাকে শারীরিক দিক থেকে দূর্বল ও মানসিক দিক থেকে পঙ্গু করে ফেলে। এসব বিবেচনা করে ইসলাম কতিপয় মৌল শর্তের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক রক্ষার মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ তার প্রতি দায়িত্বের সাথে সাথে আদম সন্তানকে পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

'আর উপাসনা কর আল্লাহর। শরীক করোনা তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতামাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর।' [১৫৪]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

' আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছে যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।' [১৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ বাৎসল্য আর পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি শ্রদ্ধা এক চিরন্তন স্বাভাবিক নিয়ম। ইসলাম এ স্বাভাবিক নিয়মকে চিরজীবন্ত করে রাখতে চায়। এরই প্রেক্ষিতে পবিত্র কুর'আনে 'ইহসান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর অর্থ সদ্ব্যবহার, সুন্দর ব্যবহার, প্রেমময় সদাচরন, উপকার ইত্যাদি। পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশাবলীর সাথে এটা যে একটি উত্তম কাজ। এ সম্পর্কে মহানবী হযরত মহাম্মদ (স.) বলেন,

عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين.

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (স.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী করীম (স.) কে জিজ্ঞেস করেছি, কোন্ আমন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দীয়? তিনি বললেন, সময়মত সালাত আদায় করা। তিনি (আবদুল্লাহ) জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কোনটি? নবী করীম (স.) বললেন, অতঃপর পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করা।' [১৫৬]

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা অতীব জরুরী ও অশেষ সওয়াবের কাজ। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জঘন্য পাপ। মহান আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদের বহু আয়াতে এবং মহানবী (স.) বহু হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর অপরিসীম ফযীলতের কথা বর্ণনা করেছেন। বস্তুত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ মু'মিনের অন্যতম গুণ।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বহু হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। এক হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন অতিথি সম্মান। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে। সে যেন হয়ভাল কথা বলেন অন্যথায় নীরব থাকে।' [১৫৭]

পবিত্র কুর'আনে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে যত্নশীল হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

Dhaka University Institutional Repository

'এবং যারা বজায় রাখে এ সম্পর্ক যা বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালন কর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর হিসাবের আশঙ্কা রাখে।' [১৫৮]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

'আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।' [১৫৯]

এছাড়াও বহু হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, আত্মীয়তা রক্ষা করলে রিযক বদ্ধি পায়। সচ্ছলতা আসে, অভাব-অনটন দূর হয়। আয়ূ বাড়ে এবং অপমৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)এর একখানা হাদীস এখানে উল্লেখ করা হল,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن يسأله في أثره فليصل رحمه.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যাক্তি এতে আনন্দ পায় যে, তার রিযক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।' [১৬০]

পারিবারিক জীবনের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হল চাকর-বাকর, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজের সকল সদস্যই একটি সমান ভিত্তির উপর দন্ডায়মান। ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের যে একমাত্র মাপকাঠি স্বীকার করে, তা হল পরহেযগারী, পূণ্যশীলতা এবং আল্লাহর পথে সৎ কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

'হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার।' [১৬১]

প্রতিবেশীর অধিকার:

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে থাকে। মানুষ পরস্পর নির্ভরশীল, এ জন্যে এক মানুষ অন্য মানুষের পাশাপাশি বাড়ি নির্মাণ করে যাতে বিপদে-আপদে,

Dhaka University Institutional Repository

সুখে-দু:খে ও হাসি-কান্না ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুর পর কাফন-দাফন পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারে একে অপরের সাহায্য ও সহযোগীতা করতে পারে। ইসলামী সমাজে পাশাপাশি বাড়ির মানুষকে প্রতিবেশী বলা হয়। ইসলাম প্রতিবেশীর হক আদায়ের প্রতি খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের প্রতিগুরুত্ব আরোপ করে মহান আল্লাহ বলেন-

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً

'আর আপাসনা কর আল্লাহর। শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন,প্রতিবেশী। অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক গর্বিত জনকে।'[১৬২]

প্রতিবেশী যাতে সব সময় নিরাপদ ও শান্তিতে থাকতে পারে এবং কোন রকম কষ্ট না পায়, সেদিকে একান্তভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ জন্যে নিজেকে যেমনি সংযমী হতে হবে, তেমনি প্রতিবেশীর অশান্তি সৃষ্টিকারী এবং যে কোন প্রতিবন্ধকতারও প্রতিরোধ করতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন-

والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه.

'আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়! আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল, সে ব্যক্তি কে? নবী করীম (স.) বললেন, যার অত্যাচার হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।'[১৬৩]

প্রতিবেশীর অভাব-অনটনে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং প্রতিবেশী অভাবগ্রস্ত হলে তার অভাব মোচন করা অপর প্রতিবেশীর কর্তব্য। এক প্রতিবেশীর পাশে অপর প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকলে তাকে খাদ্য দিতে হবে। মহানবী (স.) বলেন,

عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه.

'হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি পেট ভরে আহার করে, আর তারই পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। সে ব্যক্তি(প্রকৃত)ঈমানদার নয়।'[১৬৪]

প্রতিবেশীকে সবসময় সম্মান করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.

Dhaka University Institutional Repository

'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান প্রদর্শন করে।'[১৬৫]

বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের সময় প্রতিবেশীর বাড়িতে তাদের সন্তানদের জন্য উপঢৌকন পাঠিয়ে দেওয়া, প্রতিবেশীর সাথে সাক্ষাত হওয়া মাত্র সালাম ও কুশল বিনিময় করা, প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করা এবং কাপন-দাফনের ব্যবস্থা করা প্রতিবেশীর কর্তব্য। মহানবী (স.) বলেন,

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسوله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس.

'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটি। ক. সালামের জবাব দেওয়া, খ. রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, গ. জানাযায় অনুগমন করা,ঘ. দাওয়াত কবুল করা এবং ঙ. হাঁচি প্রদানকারীর হাঁচির জবাব দেয়া।' [১৬৬]

সর্বোপরি মানুষ হিসেবে প্রতিবেশীরও দোষ-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। কোন প্রতিবেশী যদি ভুলক্রমে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলত্রুটি করে ফেলে তাহলে তা গোপনে রাখা উচিত। মহানবী (স.) বলেন,

من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

'যে ব্যক্তি অপর কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।' [১৬৭]

প্রতিবেশী মুসলিম, অমুসলিম, আত্মীয়-অনাত্মীয় যে কোন শ্রেণীরই হোকনা কেন, যার যতটুকু অধিকার রয়েছে এতটুকু আদায় করা অবশ্যই কর্তব্য। এজন্য রাসূল (স.) অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিবেশীর হক আদায় করতে বলেছেন। মহনবী (স.) বলেন,

قال ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.

'মহানবী (স.) বলেন, জিবরাঈল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর হক আদায় সম্পর্কে উপদেশ দিয়েই চললেন, আর থাকলেন না, এমনকি আমার মনে হলো যে, শ্রীঘ্রই হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী করার নিদেশ দান করবেন।[১৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১) E.B. Taylor, Primitive Culture, Vol-1, London , 1981, P.7

২) Abul Hashim, The Creed of Islam, Islamic foundation Bangladesh, Dhaka-1980, P.133

৩) ইসলামে দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামী সংস্কৃতি এম.এম. পিকথল, (অনু সানাউল্লাহ নুরী) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ১০২

৪) আল-কুর'আন ৯৬ পৃ. ৪-৫

৫) ড.হাসান জামান, আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাক-১৯৮৩,পৃ.৯৬

৬) ড.হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.৭

৭) আল-কুর'আন ৩, ১৯

৮) ড. হাসান জামান, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৩

৯) আল-কুর'আন, ৪৯: ১৩

১০) আল-কুর'আন, ৯৫:৪-৮

১১) আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

১২) Abul Hashim , Op.cit, P.135

১৩) আলী উদ্দিন মুহাম্মদ, মিশকাতুল মাসাবিহ, কলিকাতা ১৩৫০ হিজরী পৃ. ২১

১৪) ডা. আমিনুল ইসলাম , মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী , ঢাকা-১৯৮৪, পৃ. ৫২

১৫) Abul Hashim, Op.cit, P.136

১৬) Abul Hashim, Op.cit, P.136

১৭) ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা , সাহিত্য কুটির, ঢাকা ও বগুড়া, ১৯৮৪, পৃ.৩৮

১৮) উদ্বৃত: ড. রশীদুল আলম প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

১৯) আল-কুর'আন, ২:১৬৪

২০) শাহেদ আলী, ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা , ঢাকা-১৯৬৭, পৃ.১৩-১৪

২১) আল-কুর'আন, ৫৫:৩৩

২২) আল-কুর'আন, ২:১৭৯

২৩) আল-কুর'আন ৪৯:১৩

২৪) আল-কুর'আন ৩:১১০

২৫) আল-কুর'আন ১৬:২২৫

২৬) আল-কুর'আন ৪১:৩৪

২৭) আল-কুর'আন ৬:১৬৫

২৮) আল-কুর'আন ৩:৫

২৯) আল-কুর'আন ৬৭:১৫

৩০) আল-কুর'আন ৪:৩৬

৩১) আল-কুর'আন ১০৭:২-৭

Dhaka University Institutional Repository

৩২) শাহেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

৩৩) আল-কুর'আন ৬:৫৭

৩৪) David de Santillana, Law and Society, the Legacy of Islam,London,1931, P.286

৩৫) আল-কুর'আন ২১:১০৫

৩৬) মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৭ পৃ. ৫৮

৩৭) আল-কুর'আন ৪:৫৯

৩৮) Kazi Ayub Ali, An Introduction to Islamic Culture, P.18

৩৯) Kazi Ayub Ali, Op.cit, P.18

৪০) আল-কুর'আন ৮:৬১

৪১) আল-কুর'আন ৮:৫৮

৪২) শাহেদ আলী, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৯

৪৩) George Barnard Shaw, The Genuine Islam, Singapore Vol-1, 1936,

৪৪) M.F. Nimkoff, Marriage and the Family, Boston,1947.p.6

৪৫) Encyclopaedia Americana, Vol-ii, Crolier ircorporate 1980,P.2

৪৬) অধ্যাপক আবুল কাশেম ভূইয়া, যুগ জিজ্ঞাসা ও পরিবার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ.৯

৪৭) আল-কুরআন, ৫১:৪৯

৪৮) ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ১০

৪৯) আল-কুরআন, ৬৬: ৬

৫০) আল-কুরআন, ২:৩৫

৫১) আল-কুরআন, ৭:১৮৯

৫২) আল-কুরআন,৩০:২১

৫৩) আল-কুরআন, ৪:১

৫৪) আল-কুরআন, ৪৯:১৩

৫৫) ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, প্রগুক্ত, পৃ. ১৫

৫৬) Abul Hashim, As I see it, Islamic Forndation Bangladesh, Dhaka,1980, P.62

৫৭) আবদুস শহীদ নাসিম, ইসলামের পারিবারিক জীবন, বর্ণালী বুক সেন্টার, ঢাকা-১৯৯৭, পৃ .১৩

৫৮) মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, আসাহ্-হাল মাতাবী, করাচী -১৯৩০, ১ম খন্ড, কিতাব আল নিকাহ, পৃ. ৬২১।

৫৯) মুহাম্মদ আযীযুর রহমান, নু'মানী, ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা -১৯৯৭, পৃ.৩৫।

৬০) আল-কুরআন, ২৫:৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

৬১) আবু বকর আহমদ ইবনল হুসাইন ইবনে আলী আল বায়হাকী, আস্ মুনানুল কুরবা, দার আলকুতুব আল ইসমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯৪, ৭ম খন্ড পৃ.৭৭।

৬২) অলি আল দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৭।

৬৩) আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল হাকীম নিশাপুরী, আল-মুসতাদরিক, দারিয়াতুল মা'আরিফিল উসমানিয়া, হায়দারাবাদ-১৩৪৫ হি., ২য় খন্ড, পৃ.১৬২।

৬৪) মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, প্রগুক্ত, পৃ.৯০-৯১

৬৫) আল-কুরআন, ৪:২৪।

৬৬) আল-কুরআন, ৩০:২১।

৬৭) আল-কুরআন, ২:২২৩।

৬৮) আহমদ মনসুর,বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স.), তাসনিম পাবলিকেশন্স ঢাকা-১৯৯৫,পৃ. ৩১।

৬৯) আল-কুরআন, ৪:৩।

৭০) আহমদ মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮।

৭১) আল-কুরআন, ৪:১২৯।

৭২) উদ্ধৃতঃ আল্লামা ইফসুফ আল-কারযাভী, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান (অনু. মাও. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম) খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ২৫২-২৫৩।

৭৩) মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৬।

৭৪) আল-কুরআন ২৪:৩৩।

৭৫) ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের অধীন রেজিষ্ট্রিকৃত সরকারী নিকাহনামা ফরমে মোহরকে দেনমোহর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৬) The Dissolution of Muslim Marriages Act. 1939 (Vii of 1939) , The Muslim Family laws Ordinamce. 1961(viii of 1961) , The Muslim Marriage and Divorce (Ragistration) Act. 1974 (Lxll of 1974) , The Family court ordinance, 1985 (xviii of 1985)

৭৭) আল-কুরআন, ৪:৪

৭৮) আল-কুরআন, ৪:২০

৭৯) আল-কুরআন, ৪:২৩৭

৮০) আল-কুরআন, ৪:২১

৮১) শাহীন আখতার, নারী ও আইন, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি, ঢাকা -১৯৯২, পৃ .৯

৮২) আল-কুরআন, ৪:১৯

৮৩) আল-কুরআন, ৪:৩৪

৮৪) আল-কুরআন, ৪:৩৫

৮৫) আল-কুরআন, ৪:১২৮

৮৬) সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, হাদীস নং ২০১৮, ইবন মাজাই কিতাবুত তালাক, হাদীস নং ২৯৭৭।

৮৭) আল-কুরআন, ৪:২২৮

৮৮) আল-কুরআন ৪:২২৯

৮৯) আল-কুরআন, ৪:২৩১

Dhaka University Institutional Repository

৯০) আল-কুরআন, ৪:২২৯

৯১) উদ্ধৃত: মাও: মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪-৪১৫।

৯২) আল-কুরআন, ১৬:৭২।

৯৩) আল-কুরআন, ৪২:৪৯-৫০

৯৪) আল-কুরআন, ২৫: ৭৪।

৯৫) ইমাম আল নব্বী , শারহে মুসলিম, দার আল ইয়াহ্ ইয়া আত-তিরাস আল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ২য় সংস্করণ-১৯৭২, ৩য় খন্ড, হাদীস নং ১৩৮৩, পৃ.২২৫।

৯৬) হাদীস।

৯৭) আল-কুরআন, ১৮: ৪৬

৯৮) আল-কুরআন, ১৯: ০৭

৯৯) আল-কুরআন, ৪: ৫৮

১০০) আল-কুরআন, ৮: ২৮

১০১) সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামে শিশু পরিচর্যা, ঢাকা-১৯৮০, পৃ.১৯।

১০২) সুনাম ইবন মাজাহ ও মুসনাদে দায়লামী, সুত্র ড. হাবীবুল্লাহ মোখতার, ইসলাম আউর তরবিয়্যতে আওলাদ (উর্দু), দারুত তাসরীফ, ১৯৮৮, পৃ.৫২।

১০৩) আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, বশীর হোসাইন এন্ড সন্স, কলিকাতা-১৯৭৩, ২য় খন্ড, কিতাব আল নিকাহ, পৃ.৭৬২।

১০৪) ড. মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

১০৫) ইমাম গাযযালী ,এহইয়াও উলুমুদ্দীন (অনু.মাওলানা ফজলুল করিম, ঢাকা-১৯৬১) পৃ.২২।

১০৬) সুনাম আবু দাউদ, নাসাঈ ও মুস্তাদরাকে হাকিম, মিশকাতুল মাসাবীহ, দেওবন্দ পৃ.২৬৭।

১০৭) আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাওযীয়া, রচিত 'তুহফাতুল মাউদূদ " এ বিস্তারিত বলা হয়েছে। (ড. মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭)

১০৮) সুনানে বায়হাকী, হযরত হাসান ইবন আলী (রা.) সূত্রে বর্ণিত।

১০৯) সহীহ মুসলিম, দেওবন্দ, মুখতার এন্ড কোম্পানী, সন ১৯৮৬, ২য় খন্ড, পৃ.২০৯।

১১০) আল-কুরআন, ৭: ১৮০

১১১) সুলাইমান ইবনুল আশআস ইবনে ইসহাক আল সিজিস্তানী, আবু দাউদ, এম.এম সাইদ এন্ড কোং, করাচী-১৩৮৭ হি, ২য় খন্ড, কিতাব আল আদব, পৃ-৩৩৬।

১১২) আল সিজিসতানী , প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, আকীকাহ অধ্যায়, পৃ.৩৬।

১১৩) সুনানে বায়হাকী, মুস্তাদরাকে হাকিম, প্রাগুক্ত,পৃ.১৬৩।

১১৪) আল-কুরআন, ২:২৩৩

১১৫) "তার দুধ পান এবং দুধ ছাড়ানোর সময় হল ত্রিশ মাস/আড়াই বছর" আল-কুরআন, ৪৬ :১৫।

১১৬) মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), আফসীরে মা' আরিফুল কুরআন, (ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০) ১ম খন্ড পৃ. ৬৯।

১১৭) আবু দাউদ সিজিসতানী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, কিতাব আল সালাত, পৃ.৮৬

Dhaka University Institutional Repository

১১৮) ইমাম গাযযালী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০১৪।

১১৯) আল-কুরআন, ৬৬ : ৬

১২০) দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সম্পাদনা পরিষদ, কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা-১০০০।

১২১) আল-কুরআন, ২: ২২২

১২২) আবু দাউদ, ইবন হিব্বান, সাহাবী হযরত নুমান ইবন বাশীর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। (ড. মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮)।

১২৩) সহীহ সুমলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ.৩২২।

১২৪) সুনান আবু দাউদ, সহীহ মুসলিম গ্রন্থেও এ মর্মে হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম নববী , রিয়াদুস সালিহীন, নয়াদিল্লী, সলীম বুক ডিপো, পৃ.১৪৪।

১২৫) ওয়ালী উদ্দীন আল-খতীব, মুহাম্মদ, 'মিশকাতুল মাসবিহ' কলিকাতা, এম বশীর হাসান এন্ড সন্স, তা. বি.পৃ.৩৮৯

১২৬) মিশকাত, প্রাগুক্ত পৃ.৩৮৮,

১২৭) ইমাম নববী, জামি তিরমিযী, রিয়াদুস সালিহীন, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৪-১৩৫।

১২৮) আল-কুরআন, ৩১: ১৭

১২৯) ড. মোখতার, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫১।

১৩০) মিশকাত, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৩

১৩১) আল-কুরআন, ৩০:২১

১৩২) আল-কুরআন, ২:১৮৭

১৩৩) আল-কুরআন, ২:২২৮

১৩৪) সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃ, ২১৯

১৩৫) আল-কুরআন, ৪:৩৪

১৩৬) আল-কুরআন, ২৬:৭৪

১৩৭) আল-কুরআন, ৪:৩৪

১৩৮) আল-কুরআন, ৪:১৯

১৩৯) মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র.) সহীহ বুখারী কিতাবুল জুম'আ, ১ম খন্ড, পৃ, ১২২

১৪০) Hammuda Abdalati, Islam in Focus, Al-madina printing and publication co, Jeddah-1973, P.120

১৪১) Ibid, P.121

১৪২) আল-কুরআন, ৪: ৩৬

১৪৩) আল-কুরআন ৩১:১৪।

১৪৪) আল-কুরআন, ১৭: ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

১৪৫) সহীহ বুখারী, অধ্যায়, আচার-ব্যবহার, অনুচ্ছেদঃ উত্তম ব্যবহার পাওয়ার কে বেশী হকদার। বুখারী, দেওবন্দ, ১৯৮৫ খ্রি. ২য় খন্ড, পৃ. ৮৮:২-৮৮৩।

১৪৬) তিরমিযী (র.), জামে তিরমিযী, মাকতাবা রশীদিয়া দিল্লী, ২য় খন্ড, পৃ.১২।

১৪৭) বুখারী (র.) সহীহ বুখারী, দেওবন্দ, ২য় খন্ড, পৃ.৮৮৪।

১৪৮) তিরমিযী, (র.), জামে তিরমিযী, মাকতারা রশীদিয়া, দিল্লী ২য় খন্ড, পৃ.১২।

১৪৯) Abdel Rahim Omran, Family planning in the legacy of Islam, New york, 1992, P.13.

১৫০) ইমাম নববী, প্রাগুক্ত, পৃ.২২০।

১৫১) আল-কুরআন ৩১: ১৫

১৫২) তিরমিযী, জামে তিরমিযী, মাকতারা রশীদিয়া, দিল্লী ২য় খন্ড, পৃ.১২।

১৫৩) ইমাম অলি আল দীন মুহাম্মদ, মিশকাত আল মাসাবিহ, এম, বশীর হাসান এন্ড সন্স, কলিকাতা, তা, বি ১ম খন্ড,পৃ.৫১৮

১৫৪) আল-কুরআন, ৪:৩৬

১৫৫) আল-কুরআন, ৩১:১৩

১৫৬) সহীহ বুখারী,অধ্যায়, আচার-ব্যবহার, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহরবাণী 'ধার্মিক মানুষকে তার পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি'। বুখারী, দেওবন্দ, ছাপা ১৯৮৫খ্রি., ২য় খন্ড, পৃ., ৮৮২

১৫৭) সহীহ বুখারীঃ অধ্যায়ঃ আচার ব্যবহার, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত,পৃ.৯০৬

১৫৮) আল-কুরআন, ১৩.২১

১৫৯) আল-কুর'আন, ৪.১

১৬০) সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ আচার-ব্যবহার, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮৫

১৬১) আল-কুরআন, ৪৯-১৩

১৬২) আল-কুরআন, ৪.৩৬

১৬৩) সহীহ বুখারী, কিতাবুল আবদ, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮৯

১৬৪) বায়হাকী, সূত্রঃ ওলী উদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, মিশকাতু আল-মাসবীহ, আরবী, পৃ.৪২৪

১৬৫) ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ (র.), প্রাগুক্ত, ১ম খান্ড পৃ.১১৯

১৬৬) সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ.২৯২

১৬৭) ইমাম মুহাম্মদ (র.) মুওয়াত্তা, অনূদিত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগষ্ট-১৯৮৮, পৃ.৬০৭

১৬৮) আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, সহীহুল বুখারী, ১৯৮৫, পৃ.৮৮৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সুশাসন নিশ্চিত করণে ইসলামী শরী'আহ আইন

সুশাসনের ধারণাগত পরিচিতি
রাষ্ট্রের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সমূহ
সার্বভৌমত্ব
সার্বভৌমত্ব প্রয়োগে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব
সরকার
ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ
কুর'আনের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের রূপরেখা
ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের গুণাবলী
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাসূল (স.) এর ভূমিকা
সুশাসন ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় খোলাফায়ে রাশেদীন
হযরত উমরের (রা.) সুশাসন
হযরত উমরের (রা.) প্রশাসনিক ব্যবস্থা
গণতন্ত্রের ধারণা
ইসলামে গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতায় রাসূল (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদীন
ইসলাম ও গণতন্ত্র
ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই ইসলামী পদ্ধতি
সুশাসনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভূমিকা ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ
সুশাসনের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্টাবলী ও আধুনিক বিশ্ব

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসনের ধারণাগত ও পরিচিতি :

শাসন শব্দটির সাথে 'সু' বিশেষণবাচক শব্দ যুক্ত হয়ে "সুশাসন" একটি বিশেষ প্রত্যয় হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে। সুশাসন একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুশাসন শব্দটি অপশাসন ও অপরাজনীতির বিপরীত শব্দকেই বুঝায়। ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দ হল (Good governance)[১] পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুশাসনের ব্যাখ্যা করতে গেলে দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী সর্বোপরী ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা জরুরী।

দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সুশাসন :

প্রাচীন চীনের দার্শনিক কনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯খ্রি. পূর্ব) শাসন কাজে শক্তি প্রয়োগের চেয়ে শাসকের সদর্থক গুণাবলীর প্রভাবের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তার শিষ্য মেনসিয়াস (খ্রি.পূ. ৪র্থ শতক) বিস্তৃত করে বলেছেন যে,শাসক জনগণের 'পিতা ও মাতার' মতো এবং তার দায়িত্ব হলো, জনগণের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান নিশ্চিত করা। তিনি তা না করতে পারলে শাসক হবার নৈতিক অধিকার হারাবেন। বলা বাহুল্য, সুশাসন সংক্রান্ত ভাবনায় এই মেনসিয়াসই অগ্রগণ্য। উল্লেখ্য, 'কম শাসনই ভালো শাসন' (Less government is the best government) ধারনার জন্যে পশ্চিম দুনিয়াকে কৃতিত্ব দেয়া হলেও আসলে ধারণাটির প্রথাম স্রষ্টা ছিলেন প্রাচীন চীনের লাওসে (৬০৭-৫১৭খ্রি. পূ.)। সুশাসনের ক্ষেত্রে গ্রীক পন্ডিত প্রবর দার্শনিক সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটোর মতে, রাষ্ট্র যতদিন দার্শনিক শাসকদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে, ততদিন আইনের কোন প্রয়োজন থাকবে না। কারণ দার্শনিকগণ সর্বজ্ঞানী। তিনি বলেন, 'যখন শাসক হবেন ন্যায়বান, তখন আইন নিস্প্রয়োজন। আবার যখন শাসক দুর্নীতিপরায়ণ হন তখন আইন হবে নিরর্থক।' পরে অবশ্য তিনি এমত পাল্টাতে বাধ্য হন। রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধান এবং আইনের যে প্রয়োজন আছে, তা তার পরবর্তী গ্রন্থ 'লজ' (The Laws) এ তিনি স্বীকার করেছেন।[২]

এরিস্টটল- এর মতে, রাষ্ট্র একটি Human organisation মানুষের প্রয়োজনে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের উন্নততর জীবন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে রাষ্ট্র সক্রিয় থাকবে। সামাজিক প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের উন্নততর রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। মানুষের আদর্শ জীবন যাপনের জন্য রাষ্ট্র একটি প্রয়োজনীয় সংস্থা। অর্থাৎ নাগরিকগণ যাতে সুষ্ঠু, সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে এজন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

To establish sovereignty.(সমাজে আইনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা)

To establish equality for all.(সকলের জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা)

Promote to good life.(উত্তম জীবন প্রতিষ্ঠা করা) [৩]

সামাজিক বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এর দৃষ্টিকোণ থেকে শাসন এবং সুশাসনের বিশেষণ করতে গিয়ে বলতে হয়, সামাজিক বিজ্ঞানের (Social Science) অন্যতম প্রধান। উন্নত ও সৃজনশীল শাখা হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিষয়ক বিজ্ঞান। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে মানুষ একই সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। সমাজ ও রাষ্ট্রের সভ্য হিসেবে মানুষের সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এর উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। রাষ্ট্রের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে নাগরিকের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিদ্যমান। George Catlin এর মতে, 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের কার্যাবলী ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য।' [৪]

রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেমন সমাজ বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল তেমনি সমাজবিজ্ঞানও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবন ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সুবিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করে। মানুষের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দারস্ত হতে হয়। Prof. Gettell বলেন, সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রচিন্তার জগতে বিশেষ করে আইনি মতবাদের ক্ষেত্রে যে বহুল ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে তা সমাজবিজ্ঞানের নির্ধারিত পথেই সম্পন্ন হয়েছে। [৫]

মধ্য যুগের রাষ্ট্রচিন্তায় মুসলিম মনীষীদের অবদান এবং মুসলিম শাসনামলে সুশাসনের যে ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল তা তাদের দার্শনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ফুটে উঠে। যদিও রাষ্ট্র দর্শনের পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণ রাষ্ট্রচিন্তার যে ইতিহাস রচনা করেছেন তার মধ্যে তাঁরা প্রাচীন গ্রীস, রোম ও খ্রীষ্টীয় যাজকদের রাষ্ট্র দর্শন আলোচনায় চলে গেছেন। ৪৭৬ খৃীষ্টাব্দে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে এয়োদশ শতাব্দীতে সেন্ট টমাস একুনাইসের আবির্ভাব পর্যন্ত সুদীর্ঘ সাতশত বৎসরের যে ব্যবধান তাকে তাঁরা ইতিহাসের অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্য পরিচালিত হওয়ার ফলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাশ্চাত্য পন্ডিতদের এই অভিমত ঠিক নয়। গবেষণার ফলে মুসলিম চিন্তানায়কদের যে জ্ঞানভান্ডার আবিস্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, মুসলমানরাই প্রথম প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্য ও দর্শনকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তাঁর সঙ্গে নিজেদের সুক্ষ্ম চিন্তা ও মননশীলতাকে মিশ্রিত করে এমন এক অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানলোকের সৃষ্টি করেন যা যে কোন যুগের পন্ডিতদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক না করে পারে না। পশ্চিমী পন্ডিতগণ ইতিহাসের যে অংশটিকে অন্ধকার

Dhaka University Institutional Repository

যুগ বলে অভিহিত করেছেন তা মোটেই অন্ধকার ছিল না, বরং তা ছিল জ্ঞানবিজ্ঞানের এক অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণ যুগ। মুসলিম রাষ্ট্রদর্শনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার এইচ.কে সেরওয়ানী (H.K. Sherwani) যথার্থই বলেছেন, 'গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, ইতিহাসের এই যুগ অন্ধকারত ছিলই না, বরং অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই তাকে ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ বলে আখ্যায়িত করা যায়। [৬] এই ধ্রুব সত্যটাকে প্রমান করার জন্যে এখানে মুহাম্মদ আল ফারাবী, হুসেন ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ ও ইবনে খালদুনের রাষ্ট্র দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

মুহাম্মদ আল ফারাবী :

মুহাম্মদ আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০) তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, দার্শনিকের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে স্রষ্টা সম্পর্কে যথার্থ সত্য উদ্‌ঘাটন করা এবং এই কাজ তাঁকে যদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে করতে হয় তাহলে তাঁকে ' কাজেকর্মে স্রষ্টারই অনুরূপ হতে হবে' (To become in action Like God) এদিক দিয়ে তিনি প্লেটোনিক মতবাদেরই প্রতিধ্বনি করেন। তিনি দর্শনের মাধ্যমে প্রত্যাদেশের চুড়ান্ত সত্যকে প্রমান করার চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, 'ফালসাফা' ও শরিআহ'র মধ্যে অর্থাৎ দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে মূলত: কোন বিরোধ নেই। তবে একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে তিনি দর্শনের চেয়ে প্রত্যাদেশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

আল ফারাবী সরকারের শ্রেনী বিভাগের ব্যাপারে পেটোর সঙ্গে ঐক্যমত পোষন করেন। প্লেটোর উচ্চাভিলাষতন্ত্র (Timocracy), ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) গণতন্ত্র (Democracy) এবং স্বৈরতন্ত্র (Thranny) প্রভৃতি অসম্পূর্ণ বা আদর্শবিচ্যুত রাষ্ট্রগুলিকে তিনি যথাক্রমে 'মাদিনা ফারামা' 'মাদীনা নাযালা', 'মদিনা জামাইয়া' ও 'মাদীনা তাঘালুব' বলে অভিহিত করেন এবং এক্ষেত্রে সেগুলিকে তিনি মাদানীয়া জাহেলীয়া' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্লেটোর মতই আদর্শ দার্শনিক শাসকের কথা কল্পনা করেন। তাঁর কাছে আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন, প্লেটো কল্পিত আদর্শ দার্শনিক শাসক। তিনি হযরতের নাম উল্লেখ না করলেও সুস্পষ্টভাবে ঘোষনা করেন যে, 'একবার মাত্র প্লেটোনিক দর্শন সামগ্রিকভাবে ইসলাম জগতে সার্থক হয়ে উঠেছিল মানবিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন ধারায়'।[৭] একথা বলে তিনি যে রাসূলুলাহর (স.) প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে সিনাঃ

আবু আলী হুসেন ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭খ্রী.) পাশ্চাত্য জগতে 'এভিসিনা' (Avicena) নামে পরিচিত। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার সহিত নিজেকে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত রাখেন। রাষ্ট্র চিন্তায় ইবনে সিনার সবচেয়ে বড় কীর্তি হল এই যে, তিনি দর্শনের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি যে একক ব্যক্তি তা ঠিক বলা যায় না। কারণ আলকিন্দি, আল ফারাবী, ইবনে রুশদ প্রমুখ অমর মনীষীও এ ব্যাপারে আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কেউ ইবনে সিনার মত পরিপূর্ণ সাফল্য লাভে সক্ষম হন নাই। ইবনে সিনা দর্শন ও ধর্মতত্ত্বকে দুটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবেগণ্য করেন এবং তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে স্বীকার করেন যে, সত্যের যথার্থ মর্মোদ্‌ঘাটনে বিশ্বাস (Faith) ও যুক্তির (Roason) সমান প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি যেসব মন্তব্য ও উক্তি করেছেন তার মধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা, জ্ঞানের গভীরতা ও ঈমানের বলিষ্ঠতা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি সর্বপ্রথম প্লেটোনিক দর্শনের "ইসলামী সংশ্লেষন (Islamic Synthesis) প্রণয়ন করেন এবং এরিষ্টোটলীয় দর্শনের সঙ্গে ইসলামী ভাবধারার মিলন সেতু রচনা করেন। বস্তুতঃ তিনিই গ্রীক দর্শনের সবচেয়ে শক্তিশালী ইসলামী ভাষ্যকার। [৮]

ইবনে রুশদঃ

দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে রুশদ (Ibn Rushd or Averroes, (১১২৬-১১৯৮খ্রী.) মুসলিম স্পেনের কর্ডোবায় জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা ও পিতাসহ উভয়েই কর্ডোবার নামকরা ফকীহ বা আইনজীবী ছিলেন। মধ্যযুগীয় মুসলিম মনীষীদের মধ্যে যিনি ইউরোপীয় চিন্তাধারার উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেন তিনি হচ্ছেন মুসলিম চিন্তাজগতের অনন্য সাধারণ প্রতিভা মোহাম্মদ ইবনে রুশদ বা এভেরুজ। তাঁর মাধ্য সেই এরিষ্টোটলের সিদ্ধান্ত ও সূত্রগুলো রেনেসাঁর যুগ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

ইবনে রুশদের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে অতীতে বহুদিন পর্যন্ত "দ্বৈত সত্য তত্ত্বের" যে ধারনা প্রচলিত ছিল অধুনা তা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কি প্রাচ্য কি প্রাতীচ্য সর্বত্রই পন্ডিতগণ এখন স্বীকার করেন যে, তিনি এক ও অভিন্ন সত্যের কথাই প্রচার করেন এবং সে সত্য হচ্ছে মূলত: 'শরী'আহ' সত্য। 'তাহাফুত আততাহাফুত' গ্রন্থে আল গাযালীর বিরোধীতা করে তিনি যা বলতে চান তাতে তিনি 'ওহি' ও 'রিসালাতের' সত্যকে অস্বীকার করেন নি। এমনকি তাকে 'দর্শনের সত্যের'

Dhaka University Institutional Repository

সহিত এক পংক্তিতে ও সংস্থাপন করেন নি। আদর্শ রাষ্ট্রে ও সংবিধানে তিনি 'শরী'আর' বিধানকেই চূড়ান্ত বিধান বলে স্বীকার করে নেন।

আল-গাযালীর সহিত তাঁর মূল পার্থক্য হল এই যে, আল-গাযালী যেখানে দর্শনের মধ্যে 'শরী'আর' বিধানের অস্বীকৃতি বা বিরোধীতা খুঁজে পান সেখানে ইবনে রুশদ খুঁজে পান দ্ব্যর্থহীন সমর্থন।[৯]

ইবনে খালদুন :

ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০০ খ্রী.) তাঁর রাষ্ট্র দর্শনে রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মুসলিম মনীষীদের মধ্যে প্রধানত: যে কারণে অমরত্ব লাভ করেছেন তা হল এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম একথা প্রমাণ করেন যে, যথার্থ ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিহার্য। আমরা সাধারণভাবে জানি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভল্টেয়ার 'মন্টেশু' জীবন প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীগণ সর্বপ্রথম ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ও বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু ইতিহাস নিজেই এর জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য যে, এ পথেও প্রথম পথিক এইসব ইউরোপীয় মনীষীগণ নন, বরং চতুর্দশ শতকের মুসলিম মনীষী ইবনে খালদুনই হচ্ছেন এ পথের প্রথম পথিক। ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইবনে খালদুন রাষ্ট্রচিন্তার অন্যান্য তত্ত্ব সম্পর্কেও অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর সমকালীন খ্রীষ্টীয় পন্ডিতগণ প্রায় সকলেই রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ইবনে খালদুনই মধ্যযুগের প্রথম চিন্তাবিদ যিনি রাষ্ট্রীয় উৎপত্তির সকল কাল্পনিক ও ভ্রান্ত তত্ত্বকে প্রত্যাহার করে ঘোষণা করেন যে, মানব জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। এরিষ্টোটলের মূল বাণীরই প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেন যে, "মানুষ স্বভাবত: একটি সামাজিক জীব" এবং সমাজ ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়।

ইবনে খালদুনের মতে, মানুষের এই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাঁর উৎস থেকে সমাজের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সমাজে সকল মানুষ শুধুযুক্তি ও শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় না। কিছুসংখ্যক লোক পশুসুলভ প্রবৃত্তিকে অধিক প্রাধান্য দেয় এবং এই প্রবৃত্তির তাড়নায় সমাজে নানা রকম অন্যায়-অবিচার, অকর্ম-কুকর্ম করারও প্রয়াস পায়। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য এই অন্যায় কারীদেরকে দমন করার আবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এই প্রয়োজনের ফলশ্রুতি হিসেবেই রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তাঁর মতে রাষ্ট্রীয় শান্তির মূল অনুপ্রেরণা আসে গোষ্ঠী সংহতি (Group Solidarity) থেকে। এই গোষ্ঠী সংহতিকে তিনি 'আসাবিয়া' বলে অভিহিত করেছেন।[১০] ইবনে

Dhaka University Institutional Repository

খালদুন যাকে 'আসাবিয়া' বলে অভিহিত করেছেন তার প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক উইন রোজেন্থাল বলেন, 'ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ কতকগুলি সমভাবাপন্ন মানুষের সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্বে রক্ত ও পারিবারিক ঐতিহ্যের বন্ধন, সংহতি ও পারস্পরিক দায়িত্বশীল কিংবা অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির যে অনুভূতির সূচনা করে তা ঐক্যবদ্ধ কর্ম প্রয়াসের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে এবং রাষ্ট্র ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চলচ্ছক্তি (Drivmg force) হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ইবনে খালদুন একেই 'আসাবিয়া' বলে অভিহিত করেন এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এর মূল লক্ষ্য। খোদ সংঘের প্রয়োজনের মতই এই শক্তির প্রয়োজন। কারণ এই শক্তি ছাড়া মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সংঘ নিতান্তই অকিঞ্চিতকর। [১১]

ইবনে খালদুন বিশ্বাস করেন যে, 'আসাবিয়া' বা গোষ্ঠী সংহতি ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন নীতির ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে। নবী বা রাসূলগণ যে ধর্মীয় মিশন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন তার মধ্যে যে প্রচন্ড ঐক্য বিধানকারী ক্ষমতা নিহিত থাকে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইবনে খালদুন মনে করেন যে, এই সংহতি বা ঐক্য বিধানকারী ক্ষমতা শুধু ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতেই গঠিত হয় না। তা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ বা আধা-ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ভিত্তিতেই গঠিত হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে 'মূলক্' বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই এই সংহতির মূল লক্ষ্য। এরূপ ক্ষেত্রেও অবশ্য ধর্মের ভূমিকা থাকতে পারে, তাবে তা নিতান্তই গৌণ। আধুনিক বিশ্বে আমরা যে জাতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে পরিচিত তা কেবল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার। এই ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ভিত্তিতে গঠিত সংহতির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে : এই সব রাষ্ট্রকে ক্ষমতা ভিত্তিক রাষ্ট্র (Power state)বলে অভিহিত করা হয়। [১২]

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সুশাসনঃ

যদি মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম সভ্যতার রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্মীয় নীতিও আদর্শ নিয়ে তাত্ত্বিক বিশেষণ করা হয় তাহলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সুশাসন সম্পর্কিত একটি সুস্পষ্ট ধারনা বেরিয়ে আসবে যার মাধ্যমে সুশাসন ভিত্তিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের ভূমিকা ও কার্যকারীতা বুঝা যাবে। রাষ্ট্র সম্পর্কিত দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানীদের ধারণায় গবেষণা ভিত্তিক বিশেষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ ধারা শুরু হয়েছে মানব জাতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে।

মানব সৃষ্টির ধারা শুরু হয়েছিল আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে, আর এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আদি মাতা, হযরত হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করে মানব সন্তান সৃষ্টির প্রাকৃতিক ধারা আজও

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান। বিশ্বব্যাপি এই ধারায় মানব জাতির বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার সামান্যতম ব্যতয়ও ঘটেনি। মানব জাতির বিস্তৃতির সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থারও বিস্তৃতি ঘটে এবং মানব জাতি নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে এবং ভালভাবে বসবাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তার ভিত্তিতেই সমাজের খুদ্র প্রতিষ্টান গোত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থা হতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পর্যন্ত সকল প্রকার ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বোধ কেবল আধুনিক কালেরই সৃষ্ট নয়। প্রাচীনতম কাল থেকেই এর প্রয়োজনীয়তা সর্বস্তরের মানুষের নিকট তীব্রভাবে অনুভূত। প্রাচীন ইতিহাসের দার্শনিক চিন্তাবিদগণও এ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ও গভীর চিন্তা বিবেচনা ও আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন। প্রাচীনকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ব্যক্তিত্ব এ্যরিষ্টটল বলেন, রাষ্ট্র একটি স্বভাবগত কার্যক্রম। মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই সামাজিক, যে মানুষ সমাজ বহিভূর্ত জীবন যাপন করে, যার জীবন কোন নিয়ম শৃঙ্খলার অধীন নয় নিঃসন্দেহে বলা যায়, সে হয় মানবেতর জীব, না হয় মানব প্রজাতি উর্ধ্ব কোন সত্তা।[১৩] প্লেটো ও প্রাচীন প্রখ্যাত দার্শনিকদের একজন। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনতা ব্যতিরেকে উন্নত মানের জীবন লাভ করা কোন ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। কেননা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে রাজনীতি তথা রাষ্ট্রীয় তৎপরতার দিকে। মানুষ তার এ স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে কখনো মুক্ত হতে পারে না।[১৪]

ইতিহাস দার্শনিক আল্লামা ইবনে খালদুন মানব সমাজের অপরিহার্য প্রয়োজনের দৃষ্টিতেই রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত করেছেন। আর এই দৃষ্টিতেই তিনি দার্শনিক প্ররিভাষায় বলেছেন 'মানুষ স্বভাবতই সামাজিক'। শেষ পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্র ও সরকার উদ্ভাবনের পক্ষে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।১৫ একালের চিন্তাবিদগণও এ ব্যাপারে কোন উপেক্ষাই প্রদর্শন করেননি।

সারওয়ার বদাভী লিখেছেন, 'রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম কাঠামোই হচ্ছে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। সমাজের প্রত্যেক রাজনৈতিক সংগঠন সংস্থাই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অপরিহার্য করে তোলে। অনেকে তো রাজনীতির বাস্তবতা রাষ্ট্রীয় চিন্তায় খুজে বেড়িয়েছেন এবং রাষ্ট্র ব্যতীত সামষ্টিক রাজনীতির কোন পরিচয় মেনে নিতে তাঁরা প্রস্তুত নন।'[১৫]

ইসলাম অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে মানব জীবনে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা বাধ্যতা মূলক বলে পেশ করেছেন। স্বয়ং রাসুলে করীম (স.) এর জীবন বৃত্তান্তও সেই প্রয়োজনীয়তাকে অত্যধিক প্রকট করে তুলেছে। রাষ্ট্র সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারনার পর বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা ও তত্বের ভিত্তিতে সুশাসনের যে সজ্ঞা পাওয়া যায় তাতে পশ্চিমা দুনিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যকে দৃষ্টান্ত হিসেবে না

Dhaka University Institutional Repository

এনে যদি ইসলামের দৃষ্টান্তকে সামনে নিয়ে আসা যায় তাহলে সুশাসনের ক্ষেত্রে একটি পরিস্কার ধারনা জন্ম নিবে। কেননা, সুশাসকের গুণাবলী বা তার করণীয় কি হবে ইসলাম আজ থেকে প্রায় দেড়হাজার পূর্বে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছে। একজন সুশাসকের গুণাবলী ও তার করণীয় কি হবে তার দিক নির্দেশনা ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর ভাষায় উল্লেখ্য। খলিফা নির্বাচিত হবার পর তিনি বলেছিলেন, "O People be hold me chared with the cares of government. I am not the best among you. I need all your advice and all your help. If I do well support me, if I mistake counsel me. To tell the truth to a person commissioned to rule is faithful allegiance. To conceal it is treason. In my sight the powerful and weak are like and to both I reglect the lows of Allah and the prophet I have to no more right to your obedience।"[১৬] দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা ভিত্তিক সুশাসনের ক্ষেত্রে এর চেয়ে উন্নত কোন দিকনির্দেশনা পাওয়া মুশকিল। সাম্প্রতিক সমাজ উন্নয়ন গবেষক ও কর্মীগণ সুশাসনকে টেকসই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্টানাদিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও চর্চা নিশ্চিত করণের জন্য জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে জোড় তৎপরতা চলছে।

মেকিয়াভেলী বলেন, রাষ্ট্রই হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং তার উপর উচ্চতর ক্ষমতা থাকতে পারে না। তার বিশ্বাস চুড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব, নিরাপত্তা ও সম্প্রসারণের জন্য যা কিছু অনুকূল তাই করতে পারে। তিনি শাসককে রাষ্ট্রের স্বার্থে কঠোর ও নিষ্ঠুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এতে ধর্ম ও নৈতিকতা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি শাসককে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সুদৃঢ় করণের জন্য Double standard of morality অবলম্বনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে নিজের কার্য সিদ্ধি করা। শাসক আন্তরিকতা, সততা, মানবতা ও ধার্মিকতার পুরা ভান করবে। [১৭]

রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গ্রহনযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক ড. গার্নার (Dr.Garner) তিনি বলেন, রাষ্ট্র হল বিপুল বা সামান্য জনসমষ্টি। যারা একটি সুনির্দিষ্ট ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। যারা বহি:শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন অথবা স্বাধীনতার কাছাকাছি এবং যাদের একটি সুগঠিত সরকার রয়েছে যার প্রতি সংখ্যাধিক জনসাধারণ স্বভাবজাত আনুগত্য স্বীকার করে। [১৮]

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত এবং একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে স্থায়িভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে বুঝায় যাদের একটি সুগঠিত সরকার আছে। জনগণ সেই সরকারের প্রতি স্বভাবজাত আনুগত্য প্রদর্শন করে।

রাষ্ট্রের উপাদান বা বৈশিষ্ট্য সমূহ (Elements of the state) :

সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের সংজ্ঞাগুলোকে সুক্ষ দৃষ্টিতে বিশেষণ করলে তার চারটি মৌলিক উপাদান প্রতিভাত হয়। যথা:

১। জনসমষ্টি (Population)

২। নির্দিষ্ট ভূখন্ড (Definite Territory)

৩। সরকার (Government)

৪। সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)

উল্লেখিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শান্তি, শৃঙ্খলা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় রাষ্ট্র গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ উপাদান হল সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ হল absolute and unlimited power of the state. এ ক্ষমতার বলে একদিকে রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার অতি উর্ধ্বে অবস্থান করে। অপরদিকে অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। রাষ্ট্রের এই অমোঘ ও চুড়ান্ত ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা কতৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের অযোগ্য। সরকার সদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার কোন পরিবর্তন ঘটেনা, বরং সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা বিদ্যমান থাকলেই রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা যায়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলো অঙ্গরাজ্য (provinc) রয়েছে। অঙ্গরাজ্যগুলোর জনসমষ্টি, ভূখন্ড ও সরকার রয়েছে। কিন্তু সরকারের কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। এ ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। সুতরাং কোন অঙ্গরাজ্য রাষ্ট্র নয়। তেমনি জাতিসংঘ (UNO), ওআইসি (OIC), কমনওয়েলথ (Commonwealth) প্রভৃতি সংস্থাও রাষ্ট্র নয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনা দৃষ্টে বলা যায়, রাষ্ট্র গঠনের জন্য কোন একক উপাদান বা বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট নয়, বরং চারটি উপাদানের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। সেই সাথে চতুস্থ উপাদান সহযোগে রাষ্ট্র গঠিত হলে তা দীর্ঘ স্থায়ী ও সুদৃঢ় আকার লাভ করে।

সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা :

ইসলাম অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে মানব জীবনে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীতা বাধ্যতামূলক বলে পেশ করেছেন। স্বয়ং রাসূলে করীম (স.) এর জীবন বৃত্তান্ত ও সেই প্রয়োজনীয়তাকে অত্যধিক প্রকট করে তুলেছে। রাসূলে করীম (স.) এর জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এ ব্যাপারের যাবতীয় শেবাহ্-সন্দেহ দূর হতে বাধ্য। আধুনিক মতবাদে রাষ্ট্রের উপাদান বা বৈশিষ্ট্যসমূহ ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য তবে, সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে ইসলামের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর এ ধারণার কারণেই ইসলাম মানব সমস্যার সকল প্রকার সমাধান একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের আলোকে প্রদান করে থাকে, যা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং নিরপেক্ষ। এই সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে কুর'আনুল কারীম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে,

إِنْ الْحُكْمُ إِلا لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

'আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।'[১৯]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

'আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আলাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন, তাদের পৃবৃত্তির অনুসরন করবেন।'[২০] উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের আলোকে বলা যায় যে, যে সরকার আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশভাবে গৃহীত নয়, বরং আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারোর জনগণের, কোন ব্যক্তির, কোন বংশের বা কোন শ্রেণীর সার্ব-ভৌমত্ব স্বীকৃত, তা কখনই ইসলামী সরকার হতে পারে না।

আল্লাহর শুধু সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেই হবে না, আল্লাহর একক আইনকেও পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে হবে। আল্লাহর কালাম কুর'আন মজীদ এবং কুর'আনের বাহক রাসূলের সুন্নাতকে আইনের তারই আইনকে দেশের আইনরূপে স্বীকৃতি দিতে ও জারি করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকারকারী রাষ্ট্র বা সরকার ও ইসলামী পরিচিতি লাভ করতে পারে না। কেননা আল্লাহর

Dhaka University Institutional Repository

সার্বভৌমত্বের বাস্তবতা তো আল্লাহর আইন পালনের মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহর আইন পালনে অনীহা দেয়ালে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি সম্পূর্ন অর্থহীন হয়ে যায়। [২১]

কুর'আনের দৃষ্টিতে সার্ব-ভৌমত্ব একমাত্র আলাহর। সার্বভৌমত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই নয়, তার মোকাবিলায় মানুষের স্থান ও মর্যাদা শুধু সেই সার্বভৌম আল্লাহর দাসত্ব করা, একান্ত অনুগত দাস হয়ে জীবন যাপন করা। তিনিই মানষের দাসত্ব ব্যবস্থা নাযিল করেছেন তাঁরই মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে। রাসূল (স.) আল্লাহর আইন বিধান অনুসরন ও কার্যকর করণের মাধ্যমেই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়িত করেছেন। এই বাস্তবায়ন পদ্ধতি-ই হচ্ছে রাসূলের সুন্নাত। কুর'আন মজীদের বহু সংখ্যক আয়াতে এ কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে।

আল্লাহর পরে হুকুম দেয়ার অধিকার আল্লাহ দিয়েছেন তাঁর নিজ মনোনীত নবী রাসূলগণকে। কুর'আনে এ পর্যায়ে বহু আয়াত রয়েছে। একটি আয়াতে হযরত দাউদ (আ.) কে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেছেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

' হে দাউদ আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায় সম্মতভাবে রাজত্ব কর।'[২২]

এ আয়াতে প্রথম কথা, হযরত দাউদ (আ.) নিজে সার্বভৌম নন, তিনি সার্বভৌমের 'খলীফা', প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত এবং তাঁরই নিয়োজিত। আয়াতে তাঁকে লোকদের মধ্যে হুকুম চালাবার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন। কিন্তু তা নিরংকুশ নয়। সেজন্য দুটি শর্ত স্পষ্ট। একটি, তিনি নিজেকে আল্লাহর নিয়োজিত 'খলীফা' মনে করেবেন, 'খলীফা' হিসেবে হিসেবেই হুকুম চালাবেন, নিজে সার্বভৌম হিসেবে নয়। আর দ্বিতীয়, তিনি নিজ ইচ্ছা ও আদেশ অনুযায়ী হুকুম চালাতে পারবেন না, তা চালাতে হতে পরম সত্যতা সরকারে। (আলহাক্ক) শব্দটির অর্থ প্রায় তাফসীর লেখকই (আল আদল) সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা, যা কেবলমাত্র আল্লাহর বিধান ভিত্তিক বিচার ও শাসন কার্যেই সম্ভব। মানুষের ইচ্ছামত হুকুম দেয়া বা বিচার করার সুবিচার ও ইনসাফ হতে পারে না, একথা উপরোদ্ধৃত আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন, 'খেয়াল খুশির অনুসরন করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।' [২৩]

পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থেও নবী ও রাসূল এবং যারা মুসলমান ছিলেন সবাইকে একই নির্দেশ দিয়ে, মহান আল্লাহ তার সার্বভৌমত্বের বাণী প্রচার এবং গ্রহন করতে বলেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ

'আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। [২৪]

নবী-রাসূলদের পরে প্রত্যেকটি মানুষই আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালনে বাধ্য। কেননা তাদেরকে পৃথিবীতে তার 'খলীফা' বা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

' তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন।'[২৫]

এ আয়াতে একবচনে 'খলিফা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, বরং বহুবচনের শব্দ 'খালায়েফ' খলীফাগণ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে তো অকট্যভাবে প্রমাণিত হল যে, পৃথিবীতে আল্লাহর 'খলীফা' একজন নয় কোন এক ব্যক্তি নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ আলাহর 'খলীফা' নয়, বরং প্রত্যেকটি মানুষই আল্লাহর 'খলীফা'। এই মানুষগণই আল্লাহর 'খলীফা'বা প্রতিনিধি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে নিজেকে সকল হুকুমদাতা, সকল বিচারকের তুলনায় অধিক উচচমানের হুকুমদাতা, সর্বোচ্চ বিচারক হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন তা কুর'আনের নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

'আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন।'[২৬]

আল্লাহর হুকুম দান মৌলিক, অন্যদের হুকুম দান আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতা ভিত্তিক। আল্লাহর বিচার সর্বাধিক নিরপেক্ষ,অন্যদের বিচার আল্লাহ বিধানের ভিত্তি গ্রহণের মুখাপেক্ষী । আল্লাহর বাণী,

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

'তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী ।'[২৭]

আল্লাহ মানুষের জন্য বিধান নাযিল করেছেন কিন্তু সেই বিধান মত মানব সমাজের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় ব্যাপার বাস্তবায়িত করা আল্লাহর কাজ নয়। সেজন্য তিনি প্রথম দিন থেকেই মানুষের নিকট নবী-রাসূল পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। নবী-রাসূলগণের কাজ হচ্ছে, একদিনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার সাধারণ ও ব্যাপক আহবান জানাল এবং অপরদিকে আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে বাস্তবায়িত করা। এ কারণে আল্লাহ নিজেই তাদেরকে হুকুম দেয়ার অধিকার দান করেছেন। নবী-রাসূলগণ এ উদ্দেশ্যে আলাহ কর্তৃক নিয়োজিত। কাজেই আল্লাহর বিধানের

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিতে নবী-রাসূলগণ যখন কোন হুকুম করেন, তখন তা সেই সব লোকের জন্য অবশ্য পালনীয় হয়ে যায়, যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্বেই ঈমান এনেছে। তাই আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا

'আল্লাহ ও তার রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ অমান্য করে যে, প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।'[২৮]

নবী-রাসূলগণের যেমন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক হুকুম দেয়ার অধিকার আছে-যা আল্লাহই দিয়েছেন, অনুরূপভাবে নবী-রাসূলগণের অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নেয়া সমষ্টিক দায়িত্বসম্পূর্ণ ব্যক্তিদেরও হুকুম করার বিচার-ফয়সালা করার অধিকার রয়েছে, আল্লাহ নিজেই এ অধিকার দিয়েছেন। তবে তা কোন অবস্থায়ই স্বত:স্ফুর্ত বা নি:শর্ত নয়; তা একান্ত ভাবে আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের শর্তাধীন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের।'[২৯]

এ আয়াতে সর্বপ্রথম নির্দেশ হচ্ছে- আল্লাহর আনুগত্যের, তারপর রাসূলের আনুগত্যের, তারপর সামষ্টিক দায়িত্ব সম্পূর্ণ লোকদের। আদেশটি যেহেতু স্বয়ং 'আল্লাহর' তাই তিনি একক ও মৌলিকভাবে আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হয়েও রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা আল্লাহর আনুগত্য বাস্তবায়িত হতে পারে না, রাসূলের আনুগত্য না করলে। রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহরও আনুগত্য বাস্তবভাবে হওয়া সম্ভব। তাই আল্লাহর আনুগত্যের বাস্তব উপায়ই হচ্ছে রাসূলের আনুগত্য করা, অন্যথায় আল্লাহর আনুগত্য হতে পারে না। অত:পর মানুষের নিকট আনুগত্য পাওয়ার ও চাওয়ার মৌলিক অধিকার কারোরই নেই। সে আনুগত্য অবশ্যই শর্তাধীন হবে। অর্থাৎ রাসূলের অনুপস্থিতিতে মানব সমাজের নিকট আনুগত্য চাওয়ার ও পাওয়ার অধিকার কেবলমাত্র সেই সব সমষ্টিক দায়িত্ব সম্পূর্ণ ব্যক্তিদের, যারা নিজেরা আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহর বিধান ও রাসূলের বাস্তব অনুসরন সুন্নাত অনুযায়ী হুকুম দেবে। যারা তা করবে না, তাদের কোন অধিকারই থাকতে পারে না। মানুষের নিকট আনুগত্য চাওয়ার ও পাওয়ার।

Dhaka University Institutional Repository

এই ব্যাখ্যার বাস্তব রূপ আমরা পাই রাসূলে করীম (স.) এর ইন্তিকালের পর মুসলিম জনগণ কর্তৃক। 'খলিফায়ে রাসূল' হিসেবে নির্বাচিত হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) এর প্রথম নীতি নির্ধারনী ভাষণে। তার সেই নীতি দীর্ঘ ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন ,'আমি ভাল করলে তোমরা আমার সাহায্য করবে। আর মন্দ করলে আমাকে ঠিক করে দেবে। তোমরা আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ আমি নিজে আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য করতে থাকব। আর আমিই যদি নাফরমানী করি, তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করতে বাধ্য নও।' [৩০]

রাসুলে করীম (স.) এর নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ মসজিদে নববীতে উপস্থিত থেকে প্রথম'খলীফার'এই ভাষণ শুনেছিলেন। রাসূলে করীম (স.) এর অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের সরকার বা প্রশাসন ব্যবস্থা কি হবে তার সুষ্ঠু নীতি নির্দেশ এই ভাষণে ধ্বনিত হয়েছে এবং তা সকল সাহাবী কর্তৃক সমর্থিত ও হয়েছে।

বস্তুত রাষ্ট্র ও প্রশাসনে নাগরিকদের আনুগত্যেই হচ্ছে মূল ভিত্তি। যেখানে এই আনুগত্য নেই, সেখানে ভৌগলিক এলাকা ও জনতা ইত্যাদির উপস্থিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একটি রাষ্ট্র ও সরকার গড়ে উঠতে ও চলতে পারে না। হযরত আবুবকর (রা.) সেই আনুগত্যের কথাই বলেছেন, চেয়েছন, তবে তা নিরঙ্কুশ যেমন নয়, তেমনি নি:শর্তও নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে সরকার ও জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পূর্ণ হয়। আর এ জন্যই ইসলাম নাগরিকদের গঠনমূলক সমালোচনা করার শুধু অধিকারই দেয়নি, বরং তা করা প্রত্যেকটি নাগরিকের দ্বীনী কর্তব্য বলেও ঘোষিত হয়েছে, যেখানে পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতন্ত্র শুধুমাত্র নাগরিক অধিকার বলে ঘোষণা করেছে।

সার্বভৌমত্ব প্রয়োগে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব :

কুরআনুল কারীমে মানব সৃষ্টির ইতিহাস উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, মানুষ যখন সৃষ্টি হয়নি সেই সময় মানব সৃষ্টির সংকল্প প্রকাশ করে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

'আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেস্তাদিগকে বললেন: আমি পৃথিববীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি।'[৩১] আল্লাহর ঘোষিত এই 'খিলাফত' ব্যক্তি বিশেষের জন্য বা কোন মানুষের জন্য ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। অতঃ পর তিনি যে, 'আদমকে' সৃষ্টি করলেন, তার সমস্ত বংশধর-সমস্ত মানুষই 'খলীফা' রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। কেননা আল্লাহর ঘোষণা শ্রবন করে ফেরেশতাগণ 'খলীফা' সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করে বলেছিলেন,

Dhaka University Institutional Repository

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

'তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে।'[৩২]

ফেরেশতাদের এ আশংকা নিশ্চয় প্রথম সৃষ্ট ব্যক্তি আদম (আ.) এর ব্যাপারে ছিল না। তা ছিল আদমের বংশধরদের ব্যাপারে।

এ থেকে সুষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহর 'খলীফা' বানানোর ঘোষণাটি কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য ছিল না, ছিল সমগ্র মানব বংশের জন্য, মানব বংশের প্রতিটি সন্তানের জন্য। প্রতিটি মানুষ চায় সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক সবাই আল্লাহর 'খলীফা' বা প্রতিনিধি। দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহর 'খলীফা' বলে ঘোষণার ফলে দু'টি কথা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

১. মানুষ আল্লাহর 'খলীফা'- আল্লাহর মহান নাম ও উচ্চতর পবিত্র গুণাবলীর বাস্তব রূপায়ণে

মানুষ আল্লাহর 'খলীফা', সে তার অস্তিত্ব দ্বারাই মহান আল্লাহর অসীম কুদরতের প্রমাণ ও প্রকাশ করেছে। মানুষ এ দুনিয়ার নানা জিনিস উদ্ভাবন করবে। নানা শিল্পকর্ম তৈরী করবে। আবিষ্কার করবে নবোদ্ভাবন করবে, দিন- রাত কাজ করবে এবং এই সব মানুষ তার দুঃখ হালকা করবে, অনুর্বরকে উর্বর করবে, বিরান স্থানকে আবাদ করবে, স্থলভাগকে জলভাগে ও জলভাগকে স্থলভাবে পরিনত করবে। গাছপালা রোপন করবে, শ্যামল শোভামন্ডিত বাগান রচনা করবে, পশু পালন করবে, তার বংশ বৃদ্ধি করবে। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন, যেন মানুষ আল্লাহর সুন্নাতকে এখানে কার্যকর করবে। তাঁর সৃষ্টি কুশলতাকে উদ্ভাসিত করে তোলে, তাঁর হিকমতের তত্ত্ব-রহস্যকে উদঘাটিত করে; তাঁর বিধানের সঠিক কল্যাণ মানুষ গ্রহণ করে। বস্তুত এ দুনিয়ায় আল্লাহর অসীম-বিস্ময়কর শক্তির ও ব্যাপক গভীর,সূক্ষ্ম জ্ঞানের বাস্তব নির্দশনই হচ্ছে মানুষ। মানুষকে তিনি সর্বোত্তম মানে ও কাঠামোর সৃষ্টি করেছেন, মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

' আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম আবরনে।' [৩৩]

আর মানুষ তো এই সব দিক দিয়েই পৃথিবীতে আল্লাহর 'খলীফা' প্রাকৃতিক স্বাভাবিক ব্যাপারাদির ক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহর 'খলীফা' , তাই পৃথিবীকে আবাদ করা , আবর্জনা জঞ্জাল মুক্ত করা, এখানে বসবাসের বিপদ সংকুলতা দূর করার দায়িত্ব মানুষের উপরই অর্পিত। আর এ দুনিয়ায় সুষ্ঠু ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

করেই আল্লাহর লক্ষকে বাস্তাবায়িত করবে মানুষ। সারকথা মানুষ এ দুনিয়ায় প্রাকৃতিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতার বলে আল্লাহরই প্রতিনিধি।

২. সেই সাথে মানুষ এ দুনিয়ার মানুষের সামষ্টিক ব্যাপারাদিতে নেতৃত্ব ও প্রশাসকত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর 'খলীফা'। অর্থাৎ দুনিয়ার মানুষের আল্লাহর 'খলীফা' হওয়ার ব্যাপারটি শুধু উপরে উল্লেখিত ব্যাপার সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, মানুষ দেশ শাসন ও জনগণকে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রেও আল্লাহর 'খলীফা'। কেননা মানুষ যখন দুনিয়ার স্থানসমূহের ব্যবস্থাপনা জন্তু-জানোয়ারের রক্ষণাবেক্ষণ ও যাবতীয় ব্যাপারাদি সুচারুরূপে সম্পাদনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল কিয়ামতের দিন এইসব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন মানুষ তাদের নিজেদের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসিত হবে অবিবার্যভাবে। মানুষের ব্যক্তিজীবন, সমাজ, রাষ্ট্র ,সরকার ,প্রশাসন, শিক্ষা, অর্থনীতি ও বিচার ইনসাফ সম্পর্কে, জিজ্ঞাসিত না হয়ে পারে না, আর জিজ্ঞাসিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে , এ সব ব্যাপারে তাদের কঠিন দায়িত্ব রয়েছে। অতএব এ সব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান কর্তৃব্য। আর এ কর্তব্যের কারণেই তারা এ ক্ষেত্রে ও আল্লাহর 'খলীফা'। [৩৪]

ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এ মৌলিক নীতিতে কোন বিতর্ক নেই। তবে এ নীতির বাস্তব প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রেই বিতর্ক দেখা যায়, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের রূপায়ণ সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত সরল এবং সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন; যখন আমি আল্লাহর কিতাবে কোন সমস্যা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত পাই, তখন আমি তা মানতে বাধ্য। যদি আমি আল-কুরআনে কোন নির্দেশ না পাই। আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসে তা অনুসন্ধান করি এবং তা গ্রহন করি। যখন আমি আল্লাহর কিতাব বা রাসূলের হাদীসে কোন নির্দেশ পাই না। তখন আমি সাহাবীদের মিলিত নিদ্ধান্ত অনুসরন করি। তাঁদের মধ্যে মতভেদ থাকলে যে সিদ্ধান্ত আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়, তাই গ্রহন করি এবং যে সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মনে হয় না ,তা আমি প্রত্যাখান করি। কিন্তু সবগুলো মত প্রত্যাখান করে গর্হিত কোন মত গ্রহন করিনি।' [৩৫]

আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ব্যবহারিক অর্থ হল আল-কুর'আন ও সুন্নায় প্রতিফলিত ইসলামী নীতির সার্বভৌমত্ব যদি কোন বিষয়ে আল-কুর'আনের বা সুন্নার কোন সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায়, তবে ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ইসলামী আদর্শে প্রগাঢ় পান্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিগণই কিয়াস এবং ইজতিহাদ করবেন, তবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ইজমায় অংশগ্রহন করতে পারেন। [৩৬] সর্বোপরি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সারকথা হল, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাসূলের চুড়ান্ত নেতৃত্ব স্বীকার করা এবং আল্লাহর কুর'আন ও রাসূলের সুন্নাহ ভিত্তিক শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার (Government):

রাষ্ট্র গঠনের অত্যাবশ্যকীয় আরেকটি উপাদান হল সরকার, সরকার এমন একটি সংগঠন যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূখন্ড যে রাজনৈতিক সংগঠনের সংস্পর্শে রাষ্ট্রে পরিণত হয়,তাই হল সরকার (Government). সরকার রাষ্ট্রের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং সেই সাথে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখে। সরকার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি রাষ্ট্র ও জনগণের মুখপাত্র হিসেবে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে জনকল্যাণমূলক কার্যাদি সম্পাদন করে, বিধায় জনগণ স্বভাবগতভাবে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। সরকার তার তিনটি অপরিহার্য অঙ্গসংগঠন যথা: আইন বিভাগ (Legislature), শাসন বিভাগ (Exceutive) ও বিচার বিভাগ (Judiciary), এর মাধ্যমে যাবতীয় কার্য পরিচালনা করে। [৩৭]

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র ও সরকারকে এক করে দেখেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিক আলোচনায় রাষ্টকে জনকল্যানের মাধ্যম হিসাবে মনে করে থাকেন। আর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ন উপাদান হলো সরকার। রাষ্ট্রের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বার্জেস বলেছেন; The establishment of good government , the development of national life and the perfection of humanity , these are the triple ends of the state. [৩৮] জনসমষ্টি এবং নির্দিষ্ট ভূখন্ডের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব নিয়ে কোন প্রকার মতভেদ নেই বিধায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি কিন্তু সার্বভৌমভৌত্বের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ থাকায় এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং ইসলাম সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে আল্লাহর একক অধিকারকে কখনো খর্ব করেনি এবং এ নিয়ে দ্বিমতও পোষণ করেনি। সর্বশেষে সরকার (Government) এর ব্যাপারে ইসলাম কি দিক নির্দেশনা দিচ্ছে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

সরকার -এর নাম শুনলেই কিছু লোকের চোখের সম্মুখে অত্যাচারী সরকার ও শাসকদের ভয়াবহ ও বীভৎস চেহারা ভেসে উঠতে পারে, তা কিছুমাত্র বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কেননা বিশেষ করে প্রাচ্য দেশীয় নাগরিকগণ সাম্রাজ্যবাদী বা ঔপনিবেশিক শাসকদের নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন নিষ্পেষন নিতান্ত অসহায়ভাবে ভোগ করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত। 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়' কথাটিতে যা বুঝায়, এক্ষেত্রে ও তা পুরোপুরি প্রযোজ্য। কেননা তারা অসহায় নাগরিকদের প্রতি কোনরূপ দয়া অনুগ্রহ দেখতে পায়নি, তারা দেখেছে কিভাবে সহায় সম্বলহীন মানুষগুলোকে

Dhaka University Institutional Repository

দূর্বল পেয়ে তাদের উপর অমানবিকভাবে পীড়ন চালানো হয়েছে। তাদের দেহের শেষ রক্তবিন্দুও শুষে নিয়েছে। লুটে নিয়েছে তাদের ঘরবাড়ি, ভাঙ্গা-চোড়া হাড়ি-পাতিলও। তাদের উপর দাপট চালাবার জন্য তারা তাদেরই মত অন্যান্য শক্তিধর অত্যাচারী লোকদের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলেছে, যেমন এই নিপীড়িত অসহায় লোকগুলো কারোর নিকট ফরিয়াদও না জানাতে পারে। কিন্তু ইসলাম এই ধরনের কোন অত্যাচারী নির্মম সরকার কখনই গঠন করেনি। বরং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত সরকার সর্বোত্তম, সর্বাদিক মানবতাবাদী ও সর্বাধিক কল্যাণকামী হয়ে থাকে, ইতিহাসে তা-ই হয়েছে। ইসলাম মহান আল্লাহর দেয়া আইন-সমূহই জনগণের উপর জারি করেছে। নিজেদের মনগড়াভাবে রচিত আইন নয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপঃ

ইসলাম কেবল জান্নাতের পথ দেখায়নি, বরং ইসলাম মানুষকে সর্বাধিক পার্থিব উন্নতির পথও দেখিয়েছে। মুসলমানের প্রার্থনা কেবল এটা নয় যে, মরণের পরে পরলোকে সে মঙ্গল লাভ করুক। তার প্রার্থনা "ফিদ্দারায়ন খায়রান" ইহ-পরলোকে মঙ্গল, 'রব্বানা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানোতাউ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানা' হে আমাদের রব্ব (প্রভূ), তুমি আমাদিগকে পৃথিবীতে কল্যাণ এবং পরলোকে কল্যাণ দান কর (কুরআন) রাসূলুলাহ (স.) কেবল একটি ধর্ম স্থাপন করেন নি, তিনি একটি রাষ্ট্র ও একটি জাতিরও ভিত্তি স্থাপন করেন। "By a fortune absolutely unique in history Muhammad is the threefold founder of a religion, a state and nation" (Bosworth Smith, life of Muhammad) [৪০]

ইসলাম মানুষের জন্য রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীতার কথা উদাত্ত কণ্ঠে প্রকাশ করেছে। ইসলাম উপস্থাপিত রাষ্ট্র ও সরকারের কিছু রূপরেখা কুর'আন মজীদের আয়াতের ভিত্তিতে তুলে ধরা হল-

কুর'আনের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের রূপরেখা :

কুর'আনের ঘোষণানুযায়ী ইসলামী প্রশাসক কেবল জনসমষ্টির লাগালের ধারাই লাগাম ধরে না যেমন ইচ্ছামত অশ্ব বা উট চালানো হয়, প্রশাসক মানুষকে সেদিকেই চালিয়ে নেবে, নিজ ইচ্ছামত প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ মানতে মানুষকে বাধ্য করবে, স্বীয় নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকরণ ও প্রভূত্বের লালসা চরিতার্থ করবে তা কখনই হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি সামর্থদান করলে তারা নামায কায়েম করবে। যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।'[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতটি স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তা ও কর্মচারীদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হচ্ছে-

১. সালাত কায়েম করা ব্যাপকভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে গোটা সমাজকে সর্বকল্যানের আধার মহান আলাহর সাথে সংপিক্ত করে দেয়া ।

২. যাকাত আদায় ও বন্টনের পূর্নাঙ্গ ব্যবস্থা গ্রহন এবং এরই ভিত্তিতে সমাজ-সমষ্টির জৈবিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ ও সুসংবদ্ধকরনের কাজ করবে।

৩. কল্যানময় কার্যাবলী প্রকাশ ও প্রচার এবং সামষ্টিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠা।

৪. সকল প্রকারের অকল্যাণ, ক্ষতিকর, অনিষ্টকারী, বিপর্যয় ও বিকৃতি উদ্ভাবক কার্যাবলী নিষিদ্ধকরণ। জুলুম, নিপীড়ণ, শোষণ ও মিথ্যার অপনোদন করা। শত্রু ও আক্রমণ প্রতিরোধ করা[৪২]

এইরূপ একটি রাষ্ট্র ও সরকার একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। যেখানে সকল মানুষের স্বভাব সম্মত যোগ্যতা প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। সাথে সাথে নিরাপত্তাদান করবে সকল প্রকার সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকের। আর এরূপ একটি সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ব্যতীত মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধন আদৌ সম্ভব নয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের গুণাবলী:

ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয় এমন একটি রাষ্ট্রকে যে রাষ্ট্র ইসলামী নীতি বা কুর'আন, সুন্নাহ ও শরী'আহ এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। অন্যভাবে বলা হয়, যে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ প্রশাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও রীতি-নীতির পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা হয়। সেখানে সে রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদেরও ইসলামী অনুশাসনের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হতে হবে। আর এইরূপ ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার গুরু দায়িত্ব যাদের উপর ন্যাস্ত থাকবে তাদের মধ্যে আদর্শ, নিষ্ঠা, ধর্মপরায়ণতা, বিশেষ যোগ্যতা ও কার্যদক্ষতা থাকা একান্ত জরুরী। মহানবী (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে সহজ সরল জীবন ধারা অনুসরণ পূর্বক ইসলামী সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়নীতির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে তারা সদা সংকল্প থাকবেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান ও মসলিস-উশ-শুরা থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি দায়িত্বশীল পদ একটি আমানত। সুতরাং রাষ্ট্র প্রধান ও মজলিস-ই-শুরার সদস্য হিসেবে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আমানতদার ও যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচন করা হয়। এখানে বংশ মর্যাদা, সাদা-কালো,

Dhaka University Institutional Repository

উঁচু-নীচু ইত্যাদির প্রতি নজর দেয়া হয় না। রাষ্ট্র প্রধানকে তার কৃত কর্মের জন্য আল্লাহ ও জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

ইসলামী শরী'আয় রাষ্ট্র প্রধানদের দু'ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

প্রথমত: আইন গত যোগ্যতা। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদের অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। মহান মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের তারপর যদি তোমা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহরে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পন কর যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক।' [৪৩]

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদের পুরুষ হতে হয়, প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হয় এবং সর্বপুরি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হয়।

দিতীয়ত : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদের আইনগত যোগ্যতার পাশাপাশি নৈতিক যোগ্যতার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। নেতৃত্বের উন্নত শিখরে আরোহণ করতে হলে নৈতিক যোগ্যতা অপরিহার্য। এর মধ্যে রাষ্ট্র প্রধানকে খোদাভীরু ও মোত্তাকী হওয়া জরুরী। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই- সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার।'[৪৪]

রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব একটি পবিত্র দায়িত্ব এজন্য রাষ্ট্র প্রধানকে বিশ্বস্ত, আস্থাশীল, বিচক্ষণ এবং জনগণ কর্তৃক কাঙ্খিত হওয়া অত্যাবশ্যক। এছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানকে হতে হয় আল্লাহর স্বরণকারী ও ন্যায়বিচারের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নকারী।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাসূল (স.)-এর অবদান:

রাসূলে করীম (স.) -এর জীবনে ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানতে পারা যায়, তিনি মদীনায় উপস্থিত হয়েই একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। একজন রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্র পরিচালকের ন্যায় তিনি যাবতীয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি যুদ্ধকালে একটি সুসংবদ্ধ সৈন্য বাহিনী গঠন করেছেন। বিভিন্ন গোত্রপতি বা রাষ্ট্র -প্রধানদের সাথে নানা ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছেন। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলেছেন ও

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা করেছেন। সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। একটি সুসংগঠিত সমাজ পরিচালনার জন্য যা যা করা অপরিহার্য, তিনি তার প্রত্যেকটি কাজই সুষ্ঠুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। বিচার বিভাগ সুসংগঠিত করে তার সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তার নির্মিত মসজিদই ছিল এই সমস্ত কাজের কেন্দ্রস্থল। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি যাবতীয় দায়িত্ব এই মসজিদেই পালন করেছেন। রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করেছেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট পত্রাদিও প্রেরন করেছেন। সে পত্রাদি যেমন আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছেন, তেমনি তার বাইরের ব্যক্তিদের নিকটও। তিনি যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তিনি নিজেই সে রাষ্ট্রটি ক্রমাগতভাবে দশটি বছর পর্যন্ত পরিচালনা করেছেন। তার অন্তর্ধানের পরও সেই রাষ্ট্র শুধু টিকে থাকে তা-ই নয়, তা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। এ পর্যায়ে উত্তরোত্তর উন্নতি অগ্রগতি ও লাভ করে প্রবল শক্তি ক্ষমতাও অর্জন করে। ফলে তার রূপায়ন সম্পূর্ণতা পায় যদিও তার নিজের হাতেই তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা সম্পূর্নতা লাভ করেছিল। রাসূলে করীম (স.) এর জীবনেতিহাস বিশোষণ করলেই জানতে পারা যায়, তিনি নবুওয়্যাত লাভ করার পরই একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সরকার গঠনের জন্য চেষ্টানুবর্তী হয়েছিলেন। কার্যত তিনি তা করেছিলেনও। তবে তা দু'টি পর্যায়ে সুসম্পন্ন হয়। তার প্রথম পর্যায় ছিল মক্কায়এবং দ্বিতীয় পর্যায় মদীনায়।[৪৫] সরকারের তিনটি অপরিহার্য অঙ্গসংগঠন যথা- আইন বিভাগ (Legislatare) শাসন বিভাগ (Executive) ও বিচার বিভাগ (Judiciary) এর মাধ্যমে তার যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকে। আমরা যদি খোলাফায়ে রাশেদার-সরকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় আসহাবে রাসূলের দৃষ্টান্তগুলো পর্যালোচনা করি তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী সরকারের ভূমিকা সমূহ আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।

সুশাসন ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় খোলাফায়ে রাশেদীন:

রাজনীতি বিজ্ঞানের ইতিহাসে রাষ্ট্রের ধারণা প্রাচীন হলেও সুনির্দিষ্ট লিখিত সংবিধানের আলোকে জনগণের নিকট জবাবদিহীর ভিত্তিতে জনকল্যানমূলক রাষ্ট্রের নমুনা প্রাচীন নয়। নি:সন্দেহ রাসূল (স.) প্রতিষ্ঠিত মদীনা কেন্দ্রিক রাষ্ট্রটিই এ ধরনের প্রথম রাষ্ট্র। কারো খেয়াল খুশী চরিতার্থ করা কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তি প্রদর্শনের জন্য এ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়নি, বরং একটি অনুপম আদর্শ বাস্ত বায়নের মাধ্যমে জনগণের সার্বিক কল্যাণ বিধান এ রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এটি প্রকৃত অর্থেই ছিল একটি গণঅধিকার সম্পন্ন এবং জনমত ভিত্তিক কল্যাণকর রাষ্ট্র। ব্যক্তি স্বাধীনতা , সাম্য, সুবিচার, সমতা বিধান, সমদৃষ্টি ও নিরপেক্ষতা ছিল এ রাষ্ট্রের স্থায়ী নীতি। এ রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল আল্লাহর নিকট জবাবদিহির অনুভূতি ও জনকল্যাণ।

Dhaka University Institutional Repository

পরকালীন ভীতি এবং জনগণের সমালোচনা করার অধিকার রাষ্ট্র পরিচালকদের দূনীতি পরায়ন, হওয়ার ক্ষেত্রে পধান প্রতিবন্ধক ছিল। অতীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রীয় দায়িত্বে ছিলেন রাসূল (স.) এবং প্রাদেশিক ও বিভাগীয় দায়িত্বে ছিলেন তারই সাহাবীগণ। আসহাবে রাসূল (স.) রাসূলের (স.) ওফাতের পর পর্যায়ক্রমে উত্তর আফ্রিকা, রোমান সাম্রাজ্য পারস্য ও মধ্য এশিয়াসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রসারিত হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে এ রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রিয় দায়িত্ব পালনসহ বিভন্ন প্রাদেশিকও বিভাগীয় দায়িত্বে রাসূলের (স.) সাহাবীগণই নিয়োজিত ছিলেন। তারা আল্লাহ ভীতি , জনকল্যাণ, সততা ও নিষ্ঠার সাথে রাষ্ট্রের পরিচালনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা পার্থিব লোভ-লালসা, পরাশক্তির রক্তচক্ষু, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের কোন পরওয়া করেননি। তাদের শাসননীতি ও ব্যক্তি চরিত্র আজও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।[৪৬]

কুর'আন মাজীদে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্যক্রম পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল (স.) রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে গন্যমান্য মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি এ মর্মে সাহাবীদেরকেও জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সাহাবীগণ বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন পরামর্ম ব্যতীত কোন গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করতেন না। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে হতে বিজ্ঞ ও খোদাভীরু সাহাবীগণ কেন্দ্রীয় শূরার সদস্য ছিলেন। প্রাদেশিক শূরার স্থায়ী কোন কাঠামো না থাকলেও গভর্ণরবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সাহাবীদের পরামর্শ নিতেন। আর এ নির্দেশ মহান আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।'[৪৭]

হযরত আবু বকর (রা.) এর ইরা অভিযান, রিদ্দার যুদ্ধ ও ইয়ামামার যুদ্ধের পূর্বে শূরার পরামর্শ গ্রহন করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) কাদিসিয়ার যুদ্ধে তিনি স্বয়ং নেতৃত্ব দিবেন কিনা সে বিষয়ে পরামর্শ গ্রহন করেছিলেন। শূরার সদস্য হওয়ার জন্য পূর্ণ আল্লাহভীতি এবং জ্ঞানের গভীরতাই ছিল প্রধান যোগ্যতা। সদস্যবৃন্দ মতামত ব্যক্ত করার ব্যাপারে ছিলেন স্বাধীন। তৎকালীন রাষ্ট্রের মজলিশে শূরা এবং আজকের মন্ত্রণা পরিষদ এক জিনিস নয়। কারণ আজকের মন্ত্রণা পরিষদের মূলভিত্তি জবাবদিহির অনুভূতি। আল্লাহ ভীতি ও জ্ঞানের গভীরতা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে প্রতারনণা , চাটুকারীতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের পদলেহনই এর মূল বৈশিষ্ট্য।

Dhaka University Institutional Repository

আসহাবে রাসূল (স.) পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক, রাষ্ট্রের কেন্দ্রিয় দায়িত্ব বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের সাথে আলোচনা করে যার প্রতি অধিকাংশ জনগণের আস্থা রয়েছে তাকেই প্রদান করা হতো। রাসূলের (স.) ওফাতের পর যখন খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে সংকটাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন অধিকাংশের মতানুযায়ী হযরত আবুবকর (রা.) প্রতি খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তার মৃত্যুশয্যায় প্রভাবশালী সাহাবী ও গোত্রপতিদের সাথে পরামর্শ করে হযরত উমারের (রা.) খিলাফতের ফয়সালা তিনিই করে যান। তিনি যাদের সাথে পরামর্শ করে ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিলেন, আবদুর রহমান ইবনে, আউফ (রা.) , হযরত উসমান (রা.) , আলী (রা.), সাঈদ ইবনে যায়দ (রা.), উসাঈদ ইবন হুদাইর (রা.) প্রমুখ। হযরত উমার (রা.) ও মৃত্যুর পূর্বে আবদুর রহমান ইবনে, আউফের (রা.), নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। জনগণের মতামত যাচাই করে পরবর্তী 'খলীফা' নির্বাচনই ছিল এ কমিটির মূল কাজ। হযরত উসমানের (রা.) শাহাদাতের পর অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতেই হযরত আলী (রা.) 'খলীফা' মনোনীত হয়েছিলেন। 'খলীফাগণ' খোদাভীতি, পান্ডিত্য ও যোগ্যতা বিচার করে শূরার পরামর্শক্রমে প্রাদেশিক গভর্ণর ও বিভাগীয় পরিচালকদের নিয়োগ দিতেন। সাহাবা পরিচালিত রাষ্ট্রেও গণতন্ত্রের মূলভিত্তি ছিল জনগণ ও রাষ্ট্র পরিচালকদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, সৌহার্দ্য ও ভালবাসা। এক্ষেত্রে গভর্ণর সাধারন জনগণের মতামতের শ্রদ্ধা করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। রাসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে রাষ্ট্র পরিচালানা করতে চায়, সে যেন গোটা জাতিকে ধ্বংশ করে দেয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভাগের পরিচালকগণ আলাহ ও জনগণের নিকট নিজেকে অত্যন্ত স্বচ্ছ রাখতেন এবং সাধারণ জনগণ ও খলিফা বা গভর্ণরদের সম্মুখে যাতে সমালোচনা করতে পারে তা নিশ্চিত করা হত। [৪৮]

সাহাবীগণের রাষ্ট্রের গণতন্ত্র ও আজকের প্রচলিত গণতন্ত্র এক নয়। তাদের গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের সততা , স্বচ্ছতা ,জনগণের প্রতি ভালবাসা এবং সমালোঃনার অধিকার প্রদান প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছিল। ফলে এ গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটি সুন্দর জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু আজকের প্রচলিত গণতন্ত্র অনেকাংশেই স্বৈরতন্ত্রেরই নামান্তর । সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ব্যক্তি বা দল হয়ে উঠে ক্ষমতা দখলকারী ও চরম স্বেচ্ছাচারী । জনগণের নিকট তাদের স্বচ্ছতা কিংবা জবাবদিহিতার কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং প্রচলিত গণতন্ত্রে পিষ্ট হয়ে সাধারণ জনগণ আজ ক্লান্ত সাহাবীগণ পরিচালিত রাষ্ট্রে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত হত। জীবন মান সম্ভ্রম ও ধন সম্পদের সংরক্ষণ, বিবেক-বিশ্বাস ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, সুবচারের নিশ্চয়তা , বাকস্বাধীনতা , অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিভাদের অধিকার, নিবিঘ্নে জীবন যাপন ও জীবন ধারনের অধিকার সাধারণ জনগণ ভোগ করত।

Dhaka University Institutional Repository

আজকের উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি সংবিধিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু শাসকদের পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে সে বিধান আজ ভূলুণ্ঠিত। বৃহৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানরা আজ চরম নির্যাতিত । আসাম, গুজরাট ও কাশ্মীরে সহস্রাব্দের ভয়াবহতম গণহত্যার শিকার হয়েছে সংখ্যালঘু মুসলমানরা। সভ্যতার ধ্বজাধারী যুক্তরাষ্ট্র , যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়া বিশেষ আইন করে সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিতাড়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গদের উপর নির্যাতন কারো অজানা নয়। এছাড়া ও থাইল্যান্ডের সংখ্যালঘু কন্ট্রা, ভারতের মুন্ডা, যুক্তরাষ্ট্রের রেডইন্ডিয়ানসহ বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে সংখ্যালঘুরা চরম বৈষম্যের শিকার। তাই আজ বিশ্বের মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের মাঝে সাহাবীদের সংখ্যালঘু নীতি ইতিবাচকভাবে আলোচিত হচ্ছে। [৪৯]

রাষ্ট্রে পক্ষপাতমুক্ত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সাহাবীদের আরেকটি সফলতা, সকলের প্রতি সুবিচার এবং বঞ্চিত ও অত্যাচারিতের অধিকার প্রদান তাদের বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি ছিল। তাদের বিচার ব্যবস্থায় 'খলিফা' গভর্ণর সাধারণ জনগণ ও অমুসলিম সকলেই সমান ছিলেন। কাযীগণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে'খলিফা' কিংবা গভর্ণরদের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। একবার জনৈক ইয়াহুদী আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীর (রা.) একটি বর্ম চুরি করে কুফার বাজারে বিক্রি করেছিল। বিরাট রাষ্ট্রের 'খলিফা' হওয়া সত্বেও আলী (রা.) ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে সরাসরি কোন পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহন না করে নিয়মানুযায়ী কাযীর দরবারে অভিযোগ দায়ের করেন। কাযী তার অভিযোগের পক্ষে দুইজন স্বাক্ষী হাজির করার নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা.) তার দুই পুত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনকে (রা.) স্বাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করেন। কিন্তু বিচারক অভিযোগকারীর নিকটত্মীয় বলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহন না করে মামলা খারিজ করেন। এ ঘটনায় অভিভূত হয় অভিযুক্ত ইয়াহুদী নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করে ইসলামের কাফিলায় শরীক হন। [৫০]

প্রত্যেক সাহাবীই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে জনসাধারণকে সমালোচনা করার অবাধ অধিকার এবং যে কোন নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাধ জানানোর সুযোগ দিয়েছেন। হযরত আবুবকর (রা.) খিলাফত গ্রহনের পর প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন , আমি যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পথ থেকে বিচ্যুত হই তাহলে আমার অনুগত্যের কোন প্রয়োজন নেই। তবে তোমরা আমাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে। একবার হযরত উমার (রা.) বিশাল সমাবেশে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি যদি ভ্রান্ত পথে চলি কিংবা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হই তাহলে

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা কি করবে" ? তখনই বিশর ইবন সাঈদ নামের জনৈক ব্যক্তি তরবারী উঠিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, তাহলে হে উমার, তোমার মাথা আমি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব, উমার (রা.) লোকটিকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং আল্লাহর নিকট তার জন্য দো'আ করলেন। [৫১]

হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা.) চরম দূর্দিনে আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে সামগ্রিক কাজ পরিচালনা করেছেন। প্রাদেশিক গভর্ণর ও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীগণের মধ্যেও এই জাতীয় অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল। [৫২]

হযরত উমারের (রা.) সুশাসন :

ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থায় সুশাসনের অতুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)। তার শাসনামলের কতিপয় দৃষ্টান্ত অনুধাবন করতে পারলেই বুঝা যাবে ইসলাম সুশাসনের প্রতি কতটুকু গুরুত্বরোপ করে থাকে। একটি দেশের বা একটি জাতির নেতৃত্ব নেয়া অতীব কঠিন কাজ। আর পৃথিবীর শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সে নেতৃত্ব আরো কঠিন ও দূরূহ। অথচ সে কঠিন ও দূরূহ কাজটিই অতি সহজ ও নিরলসভাবে করে গেছেন মহামান্য সাহাবীগণ। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ফারুক (রা.)। যে শাসন ব্যবস্থা তিনি পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছেন তা কেবল সমসাময়িক রাষ্ট্র নায়কদেরই চমকিত করেনি, বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের অন্তরে জাগরুক থাকবে। ইসলামের ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এর তত্ত্বগত ও তথ্যগত প্রয়োগে এবং সর্বোপরি ইসলামের ভৌগোলিক সীমারেখার প্রসারে তার অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইসলাম তার যে মর্যাদা আছে তা কেবল ইতিহাস গ্রন্থের বর্নণার দ্বারাই নয়, বরং কুরআন ও হাদীসের বহু উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত ও স্বীকৃত। ইসলামের বাণী প্রচার এবং রাসূল (স.) এর নির্দেশ পালনে হযরত ওমর (রা.) ছিলেন উন্মুক্ত।

বলা যায়, ইসলামের বাণী উম্মতের মাঝে ছড়িয়ে দিতে উমার ফারুক (রা.) ছিলেন (সেতুবন্ধনকারী)। ইসলামের সেই আলো পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে পাড়ি দিয়েছিলেন দিগ হতে দিগন্ত। সে আলোর গৌরবময় উত্তরাধিকার আমরাও বহন করে চলেছি। শুধু ধর্মীয় প্রচারই নয়, অর্থনীতি , সমাজনীতি, রাজনীতির যে গাইড লাইন তিনি দিয়ে গেছেন নিয়ামত পর্যন্ত তা মুসলমানদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।

উমরের সমসাময়িক শাসনকাল ছিল ইসলামের সর্বাধিক গৌরবময় সময়। এ সময়-২২ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ইসলামের খিলাফত পরিচালিত হয়। বিজয় হয়েছিল ১০৩৬ টি এলাকা। প্রায় অর্ধ পৃথিবী জুড়ে পত পত করে উড়েছিল ইসলামের ঝান্ডা। স্পেন, তুরস্ক , মিশর, মরক্কো,

Dhaka University Institutional Repository

হিজায, ইরাক, ইরানসহ ইউরোপের অনেক জায়গায় জড়িয়ে আছে উমরের বিজয়গাঁথা গৌরবের কাহিনী। বিশেষ করে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের ইসলামের বিজয় ও প্রসারে, খলীফা উমরের অবদান অনস্বীকার্য। এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা খলীফা উমর কায়েম করে গিয়েছিলেন যেখানে ভৌগোলিক ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার কোন স্থান ছিল না। ইসলামের দাওয়াত ও পয়গাম সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক ও অভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা। এক অনাবিল স্বচ্ছলতা বিরাজ করেছিল গোটা ইসলামী রাষ্ট্রে। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই শান্তিপূর্ণ মহবস্থানে জীবন যাপন করেছিলেন। উমর (রা.) নেতৃত্বাধীন সে সময় রোমান ও পারস্যে ইসলামের পতাকার উড্ডয়নের ফলে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হযরত উমরের (রা.) প্রশাসনিক ব্যবস্থা :

ইসলামের ইতিহাসে খলীফা উমরের শাসন প্রণালী সংস্কার কার্যাবলী এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রায়ই আলোচিত হয়। তার শাসনামলে প্রণীত প্রশাসনিক নীতিমালা, সাংবিধানিক ধারা এবং শাসক ও শাসিত্যের মাঝে মধুর সম্পর্কের ইতিহাস পড়ে দেড় হাজার বছর পরও আমরা বিস্মিত হই, গৌরববোধ করি। শাসক ও শাসিতের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হলে উমর (রা.) প্রথমে শাসিতের পক্ষেই দাঁড়াতেন যতক্ষণ না তার অপরাধ প্রমাণিত হত। শাসকদের বিলাসবহুল জীবনের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। উমর (রা.) প্রায়ই বলতেন, শাসিতের খিদমত করা, ইসলামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জনগণকে অবগত করা, সালাতের ইমামতি করা এবং তাদের সার্বিক কল্যাণ কামনায় দিন-রাত পরিশ্রম করে যাওয়া শাসকর্গের পবিত্র দায়িত্ব। [৫৩]

হযরত উমর (রা.) ছিলেন শাসিতের জান-মাল-ইজ্জতের অতন্দ্র প্রহরী। ইসলামের বীর সেনাপাতি আসর ইবনুল আস এর ছেলে একবার এক মিসরীয়কে বেত্রাঘাত করলে হযরত উমর (রা.) তাকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়ে তোমরা আদম সন্তানদের গোলাম ভাবতে শুরু করেছ। অত:পর তিনি উপস্থিত জনতাকে বললেন, 'তোমাদের কী হল যে, তোমরা কাউকে অপরের ইজ্জতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে করো না ? জনতা আরজ করল, আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইজ্জতের উপরও হামলা চালাবে এ ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত উমর বললেন, 'যারা এমন শিথিল তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভূক্ত হবে না যারা কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের উম্মতের মোকাবেলায় সাক্ষ্য দিবে।' [রুহুলমা'আনী] এতে এটিও বুঝা যায় যে, উমর অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে ছিলেন বজ্রকঠোর আর মজলুমের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সুশাসন ও উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনের যে শ্লোগান ধ্বনিত হয় তা উমর (রা.) এর প্রবর্তিত পরিকল্পনারই পূর্ণাঙ্গরূপ। উন্নয়ন প্রশাসনের যে সব সূচকের কথা আলোচিত হয় তার সবগুলিই উমরের তৎকালীন সংস্কারমূলক পলিসি ও উন্নয়ন ট্রাটেজীতে বিরাজমান ছিল। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন, খাল খনন , পরিবেশে ও পল্লী উন্নয়ন, বনায়নসহ অন্যান্য প্রশাসনিক এককের বিনিমার্ন ও উন্নয়নমূখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ সবের বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য পুস্তক লিপিবদ্ধ আছে। প্রশাসক হিসেবে দুনিয়া জুড়ে উমরের এমন খ্যাতির কারণ একটি তা হল তিনি তার শাসন ব্যবস্থায় অকাট্য অবলম্বন হিসেবে কুরআন ও রাসূল (স.) পেশকৃত সত্যকেই পরম আন্তরিকতার সাথে গ্রহন করেছিলেন। তাই প্রজাসাধারণ থেকে শুরু করে বৃক্ষরাজী, তৃর্ণলতা এমনকি নদী পর্যন্ত তার আজ্ঞাবহ ছিল। হযরত আমর ইবনুল আস মিশরের গভর্ণর থাকাকালে উমরের প্রতি আজ্ঞাবহের এমন একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরা হল।

একসময় নীল নদের অববাহিকা অঞ্চল ছিল জ্বীন সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণে। তারা ফি বছর নীলনদের পানি আটকিয়ে কৃষককুলকে জিম্মি করে রাখত। কিন্তু প্রতি বছর একটি সুন্দরী নারীকে নীলনদে বলীদানের বিনিময়ে পানি ছেড়ে দিত। কালক্রমে সেখানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। কাজেই নওমুসলিম কৃষকগণ সুন্দরী নারী বলীদানের রেওয়াজ চালু রাখবে কিনা এ ব্যাপারে আমর ইবনুল আসের অভিমত জানতে চাইলে আসর ইবনুল আস খলিফার কাছে এক নীতিদীর্ঘ পত্র লেখেন। চিঠিতে বিস্তারিত অবগত হয়ে খলীফা উমর ঐ চিঠিরই অপর পৃষ্ঠায় নীলনদকে খেতাব করে উত্তর দিলেন, হে মিশরের নীলদরিয়া! যদি তুমি তোমার নিজের ইচ্ছায় চল তাহলে তোমার পানি আমাদের দরকার নাই, তোমার পানি তুমি বুকে ধারণ করে রেখে দাও। আর যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছা মোতাবেক চল তাহলে পানি ধরে রাখার অধিকার তোমার নেই, পানি ছেড়ে দাও--। আসর ইবনুল আস খলীফার এ চিঠি নীলদরিয়ায় দেয়ামাত্রই তা পানিতে সয়লার হয়ে গিয়েছিল। উমরের নদী শাসনে আমরা এ শিক্ষাই পাই যে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) এর জন্য নত হয় দুনিয়া তার জন্য অবনত হয়ে যায়। [৫৫]

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের অধিকার ভূলুণ্ঠিত। ধনী-গরীব, উচু-নিচু, রাজায়-প্রজায় ব্যবধান আজ ঘৃন্য পর্যায়ে। কিন্তু ইতিহাস বলছে, মানুষে মানুষে , রাজায়-প্রজায় মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় খলীফায় উমরের ইনসাফ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার জুড়ি নেই। মরুভুমির বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে গিয়ে খলীফা হয়েও নিজে উষ্ট্রের রশি ধরা আর ভৃত্যকে উষ্ট্রের পিঠে সওয়ার করে পথ চলার ঘটনা বিরল। এখনো কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা হয় উমরের সেই দিনগুলির কথা যখন তিনি

Dhaka University Institutional Repository

প্রজাদের দু:খ-দুর্দশা জানার জন্য অন্ধকারে ঘরে ঘরে অনুসন্ধান চালাতেন আর সে দুর্দশা লাঘবে নিজেই আটার বস্তা কাঁধে নিয়ে তা পৌছে দিতেন দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারে। তিনি জানতেন, জীবনোপায়ের বেলায় বাস্তবে মানব জাতির মধ্যে একটি স্বভাবজাত পার্থক্য থাকলেও জীবিকার বেলায় সবার অধিকার সমান। ধনী ও বিত্তবানদের সম্পদ দরিদ্র ও বিত্তহীনদের দু:খ-দুর্দশা বাড়ানোর জন্য নয়, বরং রাসূল (স.) প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এসব সম্পদ অভাবী , গরীব-দু:খীদের দুর্দশা মোচনে ব্যবহার করতে হবে। খলীফা উমরের এ মহান নীতিই আজ জনকল্যাণমূলক অর্থনীতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। [৫৬]

একবার উবাই ইবন কাব (রা.) আমীরুল মুমিনীন হযরত উমরের (রা.) বিরুদ্ধে যায়দ এর আদালতে মামলা দায়ের করেন। নিয়মানুযায়ী যায়দ হযরত উমরকে (রা.) শপথ নিতে ইত:স্তত করছিলেন। তখন উমর (রা) রাগান্বিত স্বরে যায়দান কে বলেন, যদি উমর ও অন্য সাধারণ ব্যক্তি তোমার নিকট সমান না হয় তাহলে কাযীর আসনে বসা তোমার জন্য শোভনীয় নয়। হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) বলতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণ আল্লাহর নিকট আর্জি পেশ করা থেকে বিরত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন শাসনই ন্যায়পরায়ণ হতে পারেবে না।

হযরত উমাইর ইবন সাইদ (হযরত উমরের গভর্ণর) বলেন, একজন গভর্ণর হবেন অত্যন্ত কোমল আবার অত্যন্ত কঠোর। ইসলামের দৃষ্টিতে কঠোরতা অর্থ তলোয়ার বাজি বা চাবুক চালনা নয়, বরং সত্যকে সমুন্নত রেখে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। অনুরূপ অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যাতে দেখা যায় যে, সাহাবা পরিচালিত রাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থার ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ধনী-গরীব, উচু নীচু, খলীফা-গভর্ণর ও সাধারণ জনগণ সকলেই সমান ছিল, বিচারকদের বিচার কার্য খলীফা কিংবা গর্ভনর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচার বিভাগের স্বায়ত্বশাসনের দাবী উঠেছে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার জন্য বিচারক ও আইনবিভাগ আন্দোলন করেছেন। আর রাষ্ট্র নায়কগণ তাদের স্বার্থ চারিতার্থ করা এবং অপকর্মের দায়ভার থেকে মুক্তির জন্য বিচার বিভাগকে পকেটস্থ করে রেখেছেন। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীগণ বিচারবিভাগের উপর কোন হস্তক্ষেপ কিনা খবরদারী কল্পনাও করতে পারতেন না। সুতরাং সামগ্রিকভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সাহাবীগণের দৃষ্টান্ত অনুসরনযোগ্য।

একবার হযরত উমর (রা.) বিশাল সমাবেশে সকলকে বললেন, আমি যদি ভ্রান্তপথে চলি কিংবা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হই, তাহলে তোমরা কি করবে? তখনই বিশর ইবন সাঈদ নামের জনৈক ব্যক্তি তরবারী উঁচিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, "তাহলে হে উমার, তোমার মাথা আমি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব। উমর (রা.) লোকটিকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং আল্লাহর নিকট তার জন্য দু'আ করলেন।' [৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর (রা.) কাউকে গভর্ণর নিযুক্ত করলে জনসাধারণ যেন নির্বিঘ্নে তার নিকট অভাব অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারে সেজন্য তাকে দেহরক্ষী রাখতে এবং ঘরের দরজা বন্ধ করতে কিংবা পর্দা আবৃত করতে নিষেধ করতেন। একবার হযরত উমরের (রা) নিকট অভিযোগ আসে যে, মিসরের গভর্ণর থাইয়ায ইবন গানায উন্নতমানের মিহিকাপড়ের পোশাক পরেন এবং ফটকে একজন দেহরক্ষী নিয়োজিত করেছেন। এতদ শ্রবনে উমর (রা.) সে দিনই মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহকে প্রেরন করে আইয়াযকে ডেকে পাঠালেন। আইয়ায খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন। খলীফা তৎক্ষনাই তার পোশাক খুলে মোটা কাপড়ের পোশাক পরিয়ে এক পাল মেষ দিয়ে আদেশ দিলেন, তুমি গিয়ে মরুভূমিতে মেষ চড়াও। থাইয়ায ও অনুতপ্ত হয়ে তার এই শাস্তি গ্রহন করে মেষ চড়িয়ে বাকী জীবন অতিবাহিত করেন।

সাহাবীগণ জনসাধারণের নির্বিঘ্নে জীবন যাপন ও জীবন ধারনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তারা অনেকেই রাতের আধারে কিংবা ছদ্মবেশে ঘুরে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তাদের অভাব-অনটন ও দু:খ কষ্ট মিটানোর সচেষ্ট থাকতেন। চার খলীফা এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের জীবন ইতিহাসে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণ, নি:স্ব অনাথ ও দু:খীর প্রতিপালন তাদের রাষ্ট্রনীতির অন্যতম নীতি ছিল।

হযরত উমরের (রা.) ভৃত্য আসলাম সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এদিন খলীফা তাকে নিয়ে শহর পরিভ্রমনে বের হলেন। মদীনার তিন মাইল দূরে সারার নামক স্থানে দেখতে পেলেন , এক মহিলা দুলায় খালি হাড়িতে জ্বাল দিচ্ছে আর তার চারপাশে কয়েকটি শিশু কাঁদছে । পাশে গিয়ে খলীফা মহিলাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন করে কোন খাবার নেই। অবোধ শিশুদের প্রবোধ দেয়ার উদ্দেশ্যেই তার এই প্রচেষ্ট। তার এ কথা শুনেই খলীফা বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং পাগলের ন্যায় ছুটে গিয়ে মদীনার বায়তুলমাল থেকে আটা ,ঘি, খেজুর, প্রভৃতি খাদ্য বস্তা বর্তি করে তার পিঠে তুলে দেয়ার জন্য ভৃত্যকে অনুরোধ জানালেন। তিনি নিজেই বোঝা নিয়ে মহিলার সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে খাবার তৈরীতে সহযোগিতা করলেন। রমণীটি অচেনা এই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করে বললেন, আল্লাহর শপথ ! তুমি উমরের চেয়েও খলীফা হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি'। [৫৮]

সাধারণ জনগণ নির্বিঘ্নে জীবন যাপনের জন্য সাহাবীদের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে পেয়েছেন। আরেকবার হযরত উমর (রা.) রাতের আধারে একটি তাবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাবুর ভিতর থেকে নারীর আর্তকণ্ঠ শুনে তিনি তাবুর ফটকে বসা এক বিষন্ন বেদুঈনকে কারণ জিজ্ঞেস করলেন, বেদুঈন জানাল যে, তার স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে, কিন্তু সাহায্য করার মত দ্বিতীয় কোন মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

নেই। এ কথা শুনেই হযরত উমর (রা.) নিজে বাড়িতে ছুটে এসে প্রসূতির সমস্ত সরঞ্জামসহ উম্মে কুলছুমকে নিয়ে তাবুতে উপস্থিত হলেন । বেদুঈনের অনুমতি গ্রহন করে উম্মে কুলছুম তাবুতে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ পর বের হয়ে বললেন, আমীরুল মুমীনীন! আপনার বন্ধুকে সুসংবাদ দিন, একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে, "আমীরুল মুমিনীন" সম্বোধন শুনেই বেদুঈন বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ল এবং খলীফাকে জড়িয়ে ধরল।[৫৯]

নারী ও শিশুর অধিকার সংরক্ষণেও সাহাবীদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। বিবাহে নারীর সম্মতি জিহাদের ময়দানেও শিক্ষা-দীক্ষায় পুরুষের মতই অংশগ্রহন পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি সাহাবীগণ গুরুত্ব প্রদান করতেন। আবু তালহা (রা.) নামক জনৈক ব্যক্তি বিশিষ্ট সাহাবিয়া উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, আবূ তালহা তখনও ইসলাম গ্রহন না করায় উম্মে সুলাইম এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। পরবর্তীতে আবূ তালহা ইসলাম গ্রহন করে উম্মে সুলাইমের সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এক গভীর রাতে উমর (রা) মদীনার একটি বাড়ীতে থেকে নারী কণ্ঠে করুন গীত শুনতে পেলেন। নিকটে গিয়ে দেখলেন এক যুবতী প্রিয় বিরহে এই গান গাইছেন। পরে তিনি জানতে পারলেন, যুবতীর স্বামী বহুদিন যুদ্ধে গেছেন, এখনও ফেরেননি। তখন উমর (রা) ভাবলেন, এভাবে কত বিরহীনিকে তিনি যাতনা দিয়ে অভিশাপ কুড়াচ্ছেন। পরদিন সকালেই ফরমান জারি করলেন, কোন মুজাহিদই চার মাসের বেশী গৃহ ছেড়ে থাকতে পারবেন না।

আজ পাশ্চাত্য নারী অধিকার ও নারী স্বাধীনতার নামে যে বেলেল্লাপনা চলছে সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। তথাকথিত স্বাধীনতার নামে নারী তার সবকিছু হারিয়ে নিছক পণ্য সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। আজ প্রাশ্চত্য নারী সমাজে চরম হতাশা বিরাজ করছে। ইসলামের সোনালী যুগের সোনালী মানুষগুলোর আদর্শ লক্ষ করে এবং ইসলামের অনুপম নীতিতে মুগ্ধ হয়ে দিশেহারা নারীরা ইসলামের দিকে ছুটে আসছে। তাই সম্প্রতি এক জরীপে দেখা গেছে ইউরোপও আমেরিকায় নও মুসলিমের মধ্যে অধিকাংশই নারী ।'[৫৯]

জাহেলী যুগের শিশুদের জীবন্ত প্রোথিত করার বর্বরতম নীতিকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামই শিশুদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ সৌভাগ্যের চাবিকাঠি , বেহেস্তের পতঙ্গ, চোখের প্রশান্তি প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেছে। শিশুশিক্ষা ও শিশুর অধিকার সংরক্ষণের প্রতি ইসলাম যে গুরুত্ব প্রদান করেছে। সাহাবাগণ পরবর্তীকালে রাষ্ট্র পরিচালনার সময় তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। শিশুরাই আগামী দিনের রাষ্ট্রনায়ক । সমাজ সংস্কারক ও দেশরক্ষক। তাদের শিক্ষণ প্রশিক্ষণের উপরই ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের কাঠামো নির্ভর করে। তাই খলীফা চতুষ্টয় ও গভর্ণর

Dhaka University Institutional Repository

সরাসরি শিশুদের তত্ত্বাবধান করতেন। হযরত আবুবকর , উমর , আলী, আমর ইবনুল আস, সালমান ফারসী, সা'দ, আবূ উবায়দা, খালিদ (রা.) প্রমুখ সাহাবীর শিশু তত্ত্বাবধানের বিষয় ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

আজ ইউনিসেফ থেকে শিশু অধিকার ও শিশু শিক্ষা সম্পর্কে কিছু নীতিমালা ঘোষিত হয়েছে। শিশু অধিকার সম্পর্কে ১৯২৮ সালে জেনেভা ঘোষণা এবং ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হবার কথা বলা হয়েছে। সম্প্রতি "শিশুর জন্য হাঁ বলুন" শ্লোগান দিয়ে সারা বিশ্ব তোলপাড় করা হয়েছে এবং শিশুদের প্রতি অগাধ মমত্ববোধ প্রদর্শন করে শিশুশ্রম বন্ধের লক্ষ্যে জাতিসংঘের দূতগণ তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে দায়ী করছে, কিন্তু রাষ্ট্রনায়ক ও বিশ্বমোড়লদের ভন্ডামি ও কপটতায় এসব কিছুই চরমভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। জাতিসংঘ একদিকে শিশুদের জন্য সুন্দর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অপরদিকে জানিসংঘেরই প্রত্যক্ষ মদদে ইরাক, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, সোমালিয়াসহ বিভিন্ন দেশে শিশু নিধন চলছে। টেলিভিশনের পর্দায় বোমায় আক্রান্ত ছিন্ন ভিন্ন ও দগ্ধ শিশুর লাশ কিংবা পঙ্গুত্ব দেখে কেউ শিহরিত না হয়ে পারে না। তাই আজ সাহাবাকিরাম প্রদত্ত শিশু অধিকার এবং তা বাস্তাবায়নের অকৃত্রিম প্রচষ্টার প্রতিফলন দেখার জন্য বিশ্ববাসী ব্যাকুল হয়ে আছে।'[৬০]

সুষ্ঠভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের গুরুত্ব অপরিসীম, ইসলামী রাষ্ট্রে কোষাগারকে বায়তুলমাল বলা হয়। সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ রায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগৃহীত যাকাত, ফরাজ, উশর, বিভিন্ন প্রকার শুল্ক , জিযিয়া এবং যুদ্ধ লব্ধ সম্পদই ছিল বায়তুলমালের প্রধান উৎস। রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সাহাবীগন এই বায়তুলমালকে আল্লাহ ও জনগণের পরম আমানত মনে করতেন। তারা বেআইনীভাবে বায়তুলমাল হতে কিছু গ্রহন করা কিংবা স্বাধীনভাবে খরচ করা পরম অপরাধ মনে করতেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত সাহাবীগণ মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তক্রমে নূন্যতম জীবন ধারনের জন্য বায়তুলমাল হতে ভাতা গ্রহন করতেন। হযরত উমর (রা.) বায়তুলমাল হতে তার জন্য নির্ধারিত ভাতা প্রয়োজন ব্যতিরেকে গ্রহন করতেন না। বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরগণ প্রাপ্ত উপঢৌকনসমূহ বায়তুলমালে জমা করতেন। হযরত আলীর (রা.) খিলাফতকালে জিনিস পত্রের মূল্যবৃদ্ধি পেলেও তার ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রহন করেননি। ফলে তাকে পায়ের হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝ বরাবর উচু তালিযুক্ত ইযার পরতে হত। শীতবস্ত্র বলতে তার ছিল একটি মাত্র পুরাতন চাদর। একবার কয়েকজন গোত্রপতিসহ আহনাফ ইবনে কাইস খলীফা স্বয়ং কোমরে কাপড় গুজে ছুটোছুটি করছেন। তিনি আহনাফকে দেখে হাঁক

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে বললেন, আহনাফ, দৌড়ে এস বায়তুলমালের একটি উট ছুটে পালিয়েছে। এটাকে ধরতে হবে। তখন জনৈক গোত্রপতি বললেন, এজন্য স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন দৌড়াদৌড়ি করছেন কেন ? একজন গোলাম পাঠালেই তো চলত । তখন উমর (রা.) উত্তর দিলেন, বায়তুলমালের জন্য আমার চেয়ে বড় গোলাম আর কে আছে? রাষ্ট্রের অনেক প্রাদেশিক গভর্ণর বা বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবী বায়তুলমাল হতে কোন প্রকার ভাতা গ্রহন থেকে বিরত থাকতেন। হযরত আসর ইবনুন নু'মানকে জনগণের প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। যেমন তার নিকট বেতন ভাতা প্রেরন করা হল তখন তিনি তা এই বলে ফেরত দেন যে, পার্থিব কিছু লাভের উদ্দেশ্যে আসর কুরআন শিখিনি। [৬১]

বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয় কোষাগার রাষ্ট্রনায়কদের অনেকটা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। নামে বেনামে অর্থ তসরূপকে তেমন কোন অপরাধ মনে করা হয় না । সংবাদ মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের দায়ে উন্নত বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রপ্রধানকে অভিযুক্ত করার কথা জানা যায়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে জনগণের সম্পদে পরিণত করতে হলে সাহাবীদের আদর্শিক বায়তুলমালের কাঠামো অনুসরনের বিকল্প নেই। সাহাবীদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব প্রাপ্তির পূর্বের ও পরের জীবন ধারার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। পূর্বের মতই তারা অনাড়ম্বর জীবন ধারন করে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত উমরকে (রা.) ভোগবিলাসের লেশমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। একখানা মাত্র কাপড় ধুয়ে রৌদ্রে ধরে শুকিয়েছেন। শুকানো খেঁজুর মোটা লাল আটার রুটি ছিল তার পরিবারের প্রধান খাদ্য।' [৬২]

সারা পৃথিবীতে আজ মুসলমানদের বড় দু:খের সময় যে মুসলমানরা শত শত বছর অর্থ পৃথিবী প্রতাপের সাথে শাসন করেছে সে পৃথিবীতে মুসলমানগণ বহুকাল যাবত ইহুদী নাসারাদের কাছে পর্যদুস্ত। এখন মরক্কো স্পেন আর তুরস্কের মত দেশে ইসলামের গৌরব নেই। কুরআন সুন্নাহ বুকে নিয়ে যে উমর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দিক হতে দিগন্তে, মুছে দিয়েছিলেন কালের কলঙ্কচিহ্ন, মুসলমানদের এ দৈন্যদশায় তার শাসন পদ্ধতি পরিকল্পনা ও ব্যবহারিক বাস্তবতার কথাই বিশেষভাবে স্মরণ। কুর'আন ও রাসূল (স.) এর জীবনাদর্শের মধ্যে মানবতা প্রতিষ্ঠার আধুনিক রূপকার হযরত উমর (র.) যিনি ইসলামের গতিতে বেগবান রাখতে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এ কারণে রাসূল (স.) বলেছেন 'আমার পরে যদি কোন নবী হত, তাহলে সে উমর ইবনুল খাতাবই হতো! [৬৩] আজকের মুসলমানদের যদি 'খলীফা' উমর (র.) মতো শাসন প্রক্রিয়া গ্রহন করতো-আর সরকার প্রধানগণ হতেন তাঁর মতো তেজস্বী বীর সিপাহ সালার, তাহলেই সারা বিশ্বের মানুস পেতো সুশাসন আর মুসলমানগণ ফিরে পেত তাদের হারানো গৌরব।

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও চর্চা নিশ্চিত করণের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ বিশ্বজুড়ে জোড় তৎপরতা চলছে। সাম্প্রতিক সমাজ উন্নয়ন গবেষক ও কর্মীগণ সুশাসনকে টেকসই সামাজিক রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দুর্নীতি ও সন্ত্রাস মানুষের সকল প্রকার সুখ-শান্তিকে কেড়ে নিয়েছে। আমরা যদি সমাজের দিকে তাকাই তাহলে সুশাসনের ক্ষেত্রে যেই সমস্ত বাধা সচরাচর অবলোকন ও অনুধাবন করি তা যদি ইসলামী শরী'আহ আলোকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে সুশাসনের মানদন্ডে ইসলাম কতটুক অগ্রগণ্য তা সহজে বুঝা যাবে।

ইসলামে গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতায় রাসূল (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদীন

গণতন্ত্রেরধারণা :

সুশাসনের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে; গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি। গণতন্ত্রকে বা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। সাধারণ অর্থে গণতন্ত্র অর্থ জনগণের শাসন গণতন্ত্র অর্থাৎ Democracy শব্দটির অর্থের ভেতর এই ধারণা রয়েছে। এটি দু'টো গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে, "Demos" এবং "Kratos" যার সাধারণ অর্থ হচ্ছে, যথাক্রমে জনগণ ও ক্ষমতা। আমেরিকার প্রখ্যাত প্রেসিডেন্ট আবরাহাম লিংকন গনতন্ত্রের চমৎকার এক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাহলো ঃ Government of the people for the people by the people (জনগণের সরকার, জনগণের জন্য ও জনগণের দ্বারা) [৬৪] এর প্রথম কথাটির মর্ম হল যদি ও সরকার কিছু লোকই পরিচালনা করে বটে। কিন্তু সরকার এমন হতে হবে যে, জনগণ তাদের সরকার মনে করে। দ্বিতীয় কথাটির অর্থ হলো সরকারকে জনগণের খেদমতের উদ্দেশ্যেই কাজ করতে হবে। তৃতীয় কথাটির মানে হল সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত লোকদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। প্রকৃত পক্ষে সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের বিশেষ একটি পদ্ধতির নামই গণতন্ত্র।

গণতন্ত্র বিশ্বজনীন একটি রাজনৈতিক পরিভাষা । জনগণের অবাধ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠনের পদ্ধতিকেই গণতন্ত্র বলা হয়। নীতিগতভাবে এ পদ্ধতির যৌক্তিকতা সবাই স্বীকার করে। সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন থাকুক এটা প্রত্যেক সরকারেরই ঐকান্তিক কামনা। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জনপ্রিয়তা এবং সর্বজনীনতাই এর আসল কারণ।

ইসলাম ও গণতন্ত্র :

ইসলামের রাজনৈতিক নীতিমালার সাথে গণতন্ত্রের মূলনীতির কোন বিরোধ নেই। গনতন্ত্রের মূলনীতিসমুহ যেমন (১) নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশের সমর্থনের মাধ্যমে সরকার গঠন (২) নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা (৩) সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের কল্যাণে পরামর্শ দানের অবাধ স্বাধীনতা থাকা (৪) জনগণের মতামত ছাড়া অন্যকোন উপায়ে ক্ষমতা দখল (৫) সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালনার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ হতে হবে। শাসনতন্ত্রেও বিরোধী কোন নিয়মে সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালিত হলে তা অবৈধ হবে। জনগণের উপর শাসক হিসেবে চেপে বসার কোন অনুমতি ইসলামে নেই। রাসূল (স.) এর পর যে চারজন রাষ্ট্রনায়ক খোলাফায়ে রাশিদীন হিসেবে বিখ্যাত তাঁরা নিজেরা চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেননি। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এবং তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহেই তাঁরা দায়িত্ব গ্রহন করেছেন। তাঁদের নির্বাচনের পদ্ধতি একই রকম ছিল না কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে নির্বাচিতই ছিলেন। তাঁরা কেউ এ পদের প্রার্থী ছিলেন না। আল্লাহর রসূল (স.) এর ঘোষণা অনুযায়ী পদের আকাঙ্খী ব্যক্তিকে পদের অযোগ্য মনে করতে হবে। এ কারণেই হযরত আলী (র.) এর পর হযরত মুয়াবিয়া (র.) সাহাবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্বেও খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে গণ্য নয়। কারণ তিনি চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেছেন। অথচ হযরত উমর ওমর বিন আবদুল আজীজ (র.) সাহাবী না হওয়া সত্বেও খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে গণ্য বলে বিবেচিত । এর কারন এটাই যে, রাজবংশের রীতি অনুযায়ী পূর্ববর্তী শাসক তাকে মনোনীত করার পর ঐ পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন হওয়া ইসলাম সম্মত নয় বলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং জনগণ তারই উপর আস্থা স্থাপন করায় তিনি দায়িত্ব গ্রহন করতে বাধ্য হন।

ইসলামের শাসন ক্ষমতার আকাঙ্খা করা নিষিদ্ধ, কিন্তু দায়িত্ব হলে পালানোর ও অনুমতি নেই। এ নীতি গণতন্ত্রের আধুনিক প্রচলিত পদ্ধতির চেয়েও কত উন্নত। ইসলামে সরকারের ভূল ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া জনগণের পবিত্র দায়িত্ব। নামাজে পর্যন্ত ভূল করলে মুক্তাদির উপর লুকমা (ভুল ধরিয়ে দেয়া) ওয়াজিব। ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক হলো রাসূলের প্রতিনিধি। নামাজের ইমাম যেমন রাসূলের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভূল করলে তাকে সংশোধনের দায়িত্ব মুক্তাকিদেরকে পালন করতে হয়, তেমনি রাসূল (স.) যে, নিয়মে শাসন করতেন এর ব্যতিক্রম হতে দেখলে সংশোধনের চেষ্টা করা জনগণের কর্তব্য। এ সব দিক বিবেচনা করলে গনতন্ত্রের বিশ্বজনীন নীতি ও ইসলামের সাথে শুধু মিলই নয়। ইসলামের নীতি গণতন্ত্রের চাইতেও অনেক উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত।

ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে মৌলিক প্রার্থক্য :

পাশ্চাত্য বলতে আমেরিকা ও ইউরোপকেই বুঝায়। সেখানে ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও তারা জড়বাদে (বস্তুবাদ) বিশ্বাসী। তাদের সভ্যতার ভিত্তিই হল জড়বাদ। এ মতবাদের সার কথা হল বস্তুর উর্ধে অতীন্দ্রিয় কোন সত্তায় বিশ্বাস করা জরুরী নয়। মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও অভিজ্ঞাতার

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিতেই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। Divine Guidance (আল্লাহর হিদায়াত) এর কোন প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় ব্যাপারে যার যার ধর্ম বিশ্বাসে সবাই স্বাধীন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ধর্মকে টেনে আনা অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়। এ নীতির ভিত্তিতেই পাশ্চাত্যের সব দেশের আইনেই পরস্পর সম্মতি থাকলে বিয়ে ছাড়াও নারী পুরুষের যৌন মিলন দোষনীয় নয়। এমনকি কয়েকটি দেশের আইনে সমকামিতাও বৈধ। অথচ পশুদের মধ্যেও সমকামিতা নেই।

বিস্ময়ের বিষয় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা স্রষ্টাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু সামষ্টিক স্রষ্টার নির্দেশ মানা প্রয়োজন মনে করে না। তারা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। আবার তারা ধর্মেও বিশ্বাসী । কিন্তু ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন মনে করে। এ কারণেই ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে মৌলিক প্রার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামে সার্বভৌমত্ব -আল্লাহর। আর পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌত্বের অধিকারী। সার্বভৌমত্ব মানে আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা। আইন সার্বভৌমত্ব শক্তিরই ইচ্ছা ও মতামত। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণ বা তাদের নির্বাচিত আইন সবই সকল ক্ষেত্রে আইন দাতা। আইনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা তাদেরই হাতে। ইসলামের আল্লাহর দেয়া আইন ও বিধানের বিপরীত, কোন সিদ্ধান্ত নেবার বৈধ অধিকার জনগণের বা পার্লামেন্টের নেই। ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের এ মৌলিক পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে আইনের নিরপেক্ষ শাসন একমাত্র আল্লাহর আইনের অধীনেই চালু হওয়া সম্ভব। মানব রচিত আইনের এমন নৈতিক মর্যাদা সৃষ্টি হতে পারে না। যা পালন করার জন্য মানুষ অন্তর থেকে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। মানুষের তৈরী আইনকে ফাঁকি দিয়ে পুলিশ থেকে বেঁচে যাওয়ার চেষ্টাকে কেউ বড় দোষ মনে করে না। কিন্তু আল্লাহর আইনের বেলায় পুলিশ থেকে বেঁচে গেলেও আল্লাহর হাত থেকে বাঁচার অধিকার নেই বলে এর নৈতিক প্রভাব গভীর। এ দিক বিবেচনা করলে আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সার্থকরূপ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনাময়।

ভাল ও মন্দ ন্যায় ও অন্যায় সত্য ও মিথ্যার সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে হতে পারে না। এ সব শাশ্বত মূল্যবোধের ব্যাপার যাদের কোন স্থায়ী মূল্যবোধ নেই তারা গনতন্ত্রকে জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহন করতে পারে। যারা শাশ্বত মূল্যবোধে বিশ্বাসী তাদের নিকট গণতন্ত্র সরকার গঠন ও পরিবর্তন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের একটি পদ্ধতিমাত্র। গণতন্ত্র কোন জীবন বিধান নয়। [৬৮]

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই ইসলামী :

ইসলামের বিজয়ী আদর্শ হিসাবে কায়েম করাই "ইক্বামতে দ্বীন" খোলাফায়ে রাশিদীনের পর দুনিয়ায় মুসলিম শাসন কমপক্ষে এক হাজার বছর চালু ছিল। এ দীর্ঘ শাসনামলে নির্বাচনের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে ক্ষমতার উত্থান-পতন হয়নি। কিন্তু ইসলামে আদালত ও ফৌজদারী আইন চালু থাকায় এবং এর ফলে ন্যায় বিচার প্রচলিত থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম জণগনের বিদ্রোহের কারনে মুসলিম শাসনামলে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে ইতিহাস এ কথা বলে না। তাই বলা যায় ইসলামী শরীয়ার আইন সর্বদাই মানব সমাজের অনুকূলের হয়ে থাকে। তবে এ সব শাসনকে মুসলিম শাসন বলে বলা হয়, ইসলামী শাসন নয়। কারন মুসলমানরা যা করে তাই ইসলাম নয়। ইসলাম যা করতে বলে তা করা হলেই ইসলামী শাসন বলে গন্য হয়। এ কারণেই খোলাফায়ে রাশিদীনের পর একমাত্র হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজের শাসন ছাড়া অবশিষ্ট শাসন কালকে পূর্নাঙ্গ ইসলামী শাসন বলা যায় না। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে প্রথম ৪ খলীফা নিজেরা চেষ্টা করে ক্ষমতা দখল করেননি। তারা একই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হননি। কিন্তু অবশ্যই তারা নির্বাচিত হয়েছেন। এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নির্বাচনের নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করেনি। বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের জন্য নিজেদের উপযোগী পদ্ধতি গ্রহনের স্বাধীনতা রয়েছে। পদ্ধতি যে রকমই হোক একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতাসীন হতে হবে এটাই ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ। সাহাবাগণের যুগেই এ নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাবেয়ীগণের যুগে খলীফা সুলাইমান মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করে খাম বন্ধ রেখে নির্দেশ দেন যে তার মৃত্যুর পর সকল গণ্যমান্য নাগরিকদেরকে সমবেত করে ঐ নাম বলতে হবে। যাকে খলীফা নিয়োগ করা হল সবাই তাঁর নিকট বাইয়াত হবে। এ নির্দেশ অনুযায়ী সমাবেশে খামটি খোলে যখন পড়া হল তখন জানা গেল যে, খলীফা সুলাইমান তাঁর ছেলেকে বাদ দিয়ে জামাতা ওমর বিন আবদুল আজীজকে নিয়োগ করেছেন। নেতৃস্থানীয় লোকেরা নবনিযুক্ত খলীফার আনুগত্য স্বীকার করতে (বাইয়াত) হতে এগিয়ে আসার আগেই ওমর বিন আবদুল আজীজ (র.) দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "যে পদ্ধতিতে আমাকে খলীফা নিয়োগ করা হয়েছে তাকে আমি ইসলামী পদ্ধতিতে মনে করি না। তাই আমি আপনাদের বাইয়াত গ্রহন করতে প্রস্তুত নই। কাকে খলীফার দায়িত্ব দেয়া হবে এ বিষয়ে ফায়সালা করার ইখতিয়ার আপনাদের। আপনারা স্বাধীনভাবে আপনাদের খলীফা নির্বাচিত করুন। সবাই এক বাক্যে বলে উঠলেন, আমরা আপনাকেই নির্বাচিত করলাম। আপনি পদ চান না বলে আপনাকেই আমরা এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত গণ্য করি।[৬৬]

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ খোলাফায়ে রাশিদীনের অনুকরনেই খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার প্রস্তাবকে নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য নাগরিকগণ সমর্থন করে প্রমাণ করলেন যে, তারা ইসলামের গণতান্ত্রিক বিধান সম্পর্কে সম্যক অবগত। তবে

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্র তখনই কুফরী মতবাদ বা ইসলাম বহির্ভূত মতবাদ হিসাবে পরিগণিত হবে যখন একথা বিশ্বাস করা হবে যে, জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। আর বর্তমানে বিশ্বে অধিকাংশ সরকারই মনে করে থাকেন গণতন্ত্র হবে জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে হয়ে থাকে ইসলাম তা বাতিল বলে ঘোষণা করে। গণতন্ত্রের সজ্ঞাতে ইসলাম জনগণের সার্বভৌমত্ব কথাটি কখনই গ্রহন করে না।

নবী-রাসূলগণই ইকামাতে দীনের আন্দোলনের আদর্শ। তাঁরা জনগণকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। যে কাওম দাওয়াত কবুল করেনি তাদের দেশে দ্বীন বিজয়ী হয়নি। কোন নবী সশস্ত্র আন্দোলন করে কোন দেশেই শক্তিবান ইসলামী হুকুমত কায়েম করেননি। নবীগণ মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করেছেন। মনের উপর শক্তি প্রয়োগ করা যায় না বলেই জোর করে জনগণকে হেদায়েত করা সম্ভব নয়। মক্কার জনগণ রসূল (র.) এর দাওয়াত কবুল করতে রাজী হয়নি বলে সেখানে দ্বীন প্রথমে বিজয়ী হয়নি। মদীনার জনগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করায় রসূল (স.) সেখানে ইসলাম কায়েম করতে সক্ষম হলেন। জনগণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কবুল করতে রাজী না হলে আল্লাহ অনিচ্ছুক জনগোষ্ঠীর উপর দ্বীনের নেয়ামত জোর করে চাপিয়ে দেন না। জনগণের সমর্থন নিয়েই সরকার পরিবর্তন করার পদ্ধতিকেই গণতন্ত্র বলে। রাসূল (স.) মদীনায় যে, ইসলামী বিপ্লব সাধন করলেন তা গণতান্ত্রিক পন্থায়ই করেছেন। জোর করে তিনি মদীনাবাসীদের উপর ইসলামী শাসন চাপিয়ে দেননি। যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বদলে বিপ্লব করে ইসলামকে বিজয়ী করতে চান তারা যদি বিপ্লব মানে গণঅভ্যুত্থান বা জনগণের স্বত:স্পুর্ত সমর্থন মনে করেন তা হলে তাতে গণতন্ত্রের সাথে কোন বিরোধ হবে না।

সুশাসনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভূমিকা ও ইসলামী দৃষ্টিকোন :

সুশাসন একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।[৬৭] একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধানই সঠিকভাবে দেশ পরিচালনার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (স.) এই প্রক্রিয়ার সবপ্রথম দিক নির্দেশক। তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে জগতের প্রথম বহুজাতিক মদীনা সনদের উপস্থাপক। মহানবী (স.) মদীনার ইহুদী, পৌত্তলিক ও মুসলিমদিগকে একত্র করে এর প্রতিজ্ঞাপত্র বা আন্তর্জাতিক সনদ (International Magnachara) লিপিবদ্ধ করালেন এবং মদীনার বিভিন্ন ধর্মালম্বী ও পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ বিভিন্ন গোত্রের বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন মানব সকলকে নিয়ে এক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সনদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক হল যেমন (ক)" ইহুদী-মুসলমান প্রভৃতি সকল

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়ে স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্মকর্ম পালন করতে পারবে, কেহ কাহারও ধর্মগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।'[৬৮] (খ)" মুসলমানগণ সাধারণতন্ত্রের অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি সদাই সন্তোষ ব্যবহার করবেন এবং তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের চেষ্টায় রত থাকবেন। কোনপ্রকারে তাদের অনিষ্ট সাধনের সম্পর্ক পোষণ করিবে না।'[৬৯] এই আন্তর্জাতিক সনদে প্রথমে মোহাজের আনসার ও অন্যান্য মুসলমানদিগের পরস্পরের সমন্ধে স্বত্বাধিকার এবং তাদের সমাজগত বিষয়সমূহের শাসন ও বিচারের বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হল।[৭০] তাতে এ কথাটি পুন: পুন: উল্লেখিত হয়েছে যে, এই সকল বিষয়ের মীমাংসার ভার মুসলমান জনসাধারণের উপর ন্যাস্ত থাকবে। পৌত্তলিকদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম করে তাদের সম্পূর্ণস্বাধীনতা ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বীকৃত হল। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের নিমিত্ত শুরু থেকেই আল্লাহ তায়ালা তার বাণীসহ নবী রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ (স.) এই প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ রাসূল। তাঁর মাধ্যমে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং তাঁকে মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শ ও সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত হিসেবে মনোনীত করেছেন। তিনি মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রগঠন করে তার পরিচালনার ক্ষেত্রে যে আদর্শ রেখে গেছেন তা কালজয়ী।

যে দেশে ছিল না কোন নিয়ম-নীতির ধ্যান-ধারণা, ছিল না কোন রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো। ছিল না কোন অর্থনৈতিক ভিত্তি, তিনি সেখানে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রচলন করলেন তা ছিল অচিন্তনীয়। মদীনা সনদের মাধ্যমে তিনি নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করলেন। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র , ভাষা নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার প্রদান করলেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন সম্পদের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করলেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বাস্তবায়িত করলেন।[৭১] আল-কুর'আনে মহান আল্লাহ মহানবী (স.) কে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

'তারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে ।'[৭২]

এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে এবং সকল ঈমানদার বান্দাকে পরামর্শের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মহানবী (র.) তাঁর জীবনে এ নির্দেশ নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন, যেখানে মানুষকে দাস ও স্বাধীন দুভাগে বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল, যেখানে নারীর কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। যেখানে সম্পদের মালিকানা ছিল না।[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবশ্যই অনুসরনীয়। যে মক্কাবাসীরা তাকে অমানবিক নির্যাতনে জর্জরিত করে মদীনায় হিজর করতে বাধ্য করেছিল। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাদের ক্ষমা করে দিয়ে ঘোষণা করলেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ নেয়া হবে না। তোমরা সবাই মুক্ত ও স্বাধীন।' [৭৪]

মানুষে মানুষে সমতাবোধ থেকে জন্ম নেয় ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা। সুষ্ঠু সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতা অত্যন্ত জরুরী। নবী (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পেট পুরে যায় আর তার প্রতিবেশী উপবাস করে সে মুমিন নয়। মানুষের বাঁচার জন্য খাদ্য সর্বপ্রধান মৌলিক বস্তু। যে জাতি তার জনগণের খাদ্যের চাহিদা মিটাতে পারে সে জাতি আদর্শ সমাজ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইসলাম আদর্শ জাতি গঠনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন পূরণের জন্য দারিদ্র বিমোচনের ব্যাপারে স্থির নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, যাকাত, সাদকা, ফিতরা, উমর, খিরাজ, করজে , হাসানা ইত্যাদি যত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলাম চালু করেছে, তার মূল হল সাধারণ মানুষের মৌলিক সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর। আলো, বাতাস, পানি ও মাটির মালিক আল্লাহ। বান্দা সমভাবে আলো, বাতাস ও পানি ব্যবহার করে। এতে কেউ বাধা দেয় না। সমস্যা হয়েছে মাটি নিয়ে। মাটি থেকে ফসল উৎপন্ন হয়। তাই এখানে মানুষ মালিকানা বনেছে। মালিকানার দাবিতে সে অন্যকে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ফলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কোটি কোটি বান্দা অনাহার অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছে। মানুষের মৌলিক অধিকার অস্বীকার করায় সর্বত্র বিরাজ করছে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা , আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে বৈষম্য। ফলে সমাজে দেখা দিয়েছে ভারসাম্যহীনতা ও অরাজকতা। সংঘটিত হচ্ছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। ইসলামে আইন সবার জন্য সমান। একবার এক অভিজাত আরব মহিলা চুরির অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাকে হাত কাটার দন্ড প্রদান করা হয়। তার সামাজিক অবস্থানের কথা বিবেচনা করে এ আর্দেশ রহিত করার জন্য রাসূল (স.) এর কাছে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেন, মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি এ কাজ করত তাকে ও এ দন্ডই দেয়া হত।[৭৫]

একবার কুরাইশ সর্দাররা রাসূলের কাছে বলে পাঠালেন যে, যদি তিনি দরবার থেকে ছোটলোকগুলোকে সরিয়ে দেন তাহলে তারা তার কাছে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। এ প্রসঙ্গে আয়ত নাযিল হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنْ الظَّالِمِينَ

Dhaka University Institutional Repository

'আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন ।'[৭৬]

আদর্শ জাতি গঠনের ক্ষেত্রে বর্ণভেদ, শ্রেনীভেদ যে সমস্যার সৃষ্টি করে এখানে তা নিরসনের নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঘোষণা,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

' তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।' [৭৭]

আদর্শ জাতি গঠনের জন্য ইসলামী নির্দেশনা বাস্তবায়িত করলে এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসবে। পৃথিবীতে আজ যে পরিমান খাদ্য উৎপন্ন হয়, তা যদি মানুষের মাঝে সমভাবে বন্টন করা হয় তা হলে কেউ অনাহারে কষ্ট পাবে না। আইন যদি সমভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহলে নৈরাজ্য থাকবে না। গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামের মৌল উপাদানসমূহ বিদ্যমান। গণতন্ত্র মানুষের জন্য। মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য। ইসলামও ঠিক তাই। গণতন্ত্রের প্রয়োগিক রূপ এক ও অভিন্ন নয় । তবে মৌলিক নীতি এক। ইসলাম ও গণতন্ত্রের মৌলিক নীতির মধ্যে সাজস্য বিদ্যমান। তবে ইসলামে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব আর গণতন্ত্রে জনগণের বর্তমান বিশ্বে সংঘাতহীন সমাজ গঠনের অভিপ্রায়ে সকলকে উদার মানসিকতা নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। আজ পৃথিবীতে দরকার কল্যাণকামী মানুষ। যে সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে মহান উদ্দেশ্য নিজেকে নিবেদিত করে সৃষ্টির কল্যানে কাজ করবে।[৭৮]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নিকট এ কথা স্পষ্ট হল যে, ইসলামী পদ্ধতি সার্বিকভাবেই একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যদি তাতে আল্লাহর সাবভৌমত্বের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা না হয়। আর গণতন্ত্রের জন্য সমস্ত বিষয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম তার প্রতিটি ব্যাপারে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং কার্যকারিতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে এবং ইসলামী খিলাফত ও আসহাবে রাসূলের জীবনে তা বাস্তবায়িতও হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নৈতিক দায়িত্ব :

আমেরিকার বিখ্যাত আইন বিশারদ লুইস ডি ব্যান্ডেইস গণতন্ত্র সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলেছেন, Democracy in any spehere is a serious undertaking. It demands more exigent obedience to the moral law than any other form of Govt, যে কোন ক্ষেত্রে গণতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ব উদ্যোগ । অন্য যে কোন ধরনের সরকারের চেয়ে এটি নৈতিক আইনের বেশী জরুরী আনুগত্য দাবী করে'। [৭৯]

বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই বাস্তব সত্য সংবিধান মেনে চলার মত দায়িত্বশীল , কর্তব্যপরায়ণ ও নৈতিক গুণ সম্পন্ন উপযুক্ত প্রশাসনের অভাব একটি। সংযমী ,সৎ, সুশিক্ষিত, চরিত্রবান, সমদর্শী প্রভৃতি গুণের সমাবেশ না ঘটলে জনপ্রতিনিধি হওয়া যায় না। শ্রেনী বৈষম্য মানব স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ।[৮০]

বিশিষ্ট ব্রিটিশ আইনজ্ঞ লর্ড ডেনিং আইনের কাজ কি তা ব্যাখ্যা করেছেন। The most important function of the low is to restrain the abuse of power by any of the holders of it, no matter whether they be the Government, Newspaper, Television, Trade Union, Multinational Companies or any one else. [৮১] এর অর্থ আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো যে কোন্ ক্ষমতাশীলকে ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত রাখা তারা সরকার, সংবাদপত্র, টিভি, টেড ইউনিয়ন, বহুজার্তিক কোম্পানী যা-ই হোক না কেন।

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এ তিনটি বিভাগকে সকল প্রকার কলুষতা মুক্ত করার জন্য আমাদেরকে দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণ মানসিকতার উর্ধ্বে উঠা অত্যন্ত জরুরী। সুশাসনের নিশ্চিত করার জন্যে রাষ্ট্রের এই তিনটি বিভাগকে সকল প্রকার দুর্নীতিমুক্ত হওয়া জরুরী। সরকারের স্বচ্ছতার জন্য রাষ্ট্রেও সুশাসনের বৈশিষ্ঠাবলী অর্জন অতীব জরুরী। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন উপাদান ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালিত হোক এটা সকলের কাম্য। আর রাষ্ট্রের ব্যাপারে ইসলাম যে সুষ্ঠ প্রক্রিয়া শিখিয়েছে তার বিকল্প কোন ব্যবস্থা আজও বিশ্বব্যাপী উপস্থাপিত হয় নাই।

মানব জাতি বা সমাজের জন্য যা কল্যাণকর ও উপকারী , সেটাকেই ইসলাম যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইজতিহাদের ভিত্তিতে গ্রহন করার অনুপ্রেরনা যুগিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসনের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্টাবলী ও আধুনিক বিশ্ব :

শাসন ব্যবস্থার ধারণা নতুন কিছু নয়। এটা মানব সভ্যতার মতই পুরাতন। সম্প্রতি সুশাসনের পরিভাষাটি উন্নয়ন সাহিত্যে ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই সুশাসনের বিষয়টি বর্তমান আধুনিক বিশ্বে একটি বিবেচ্য বিষয়। সুশাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে গণতন্ত্র সমৃদ্ধ হতে পারে না। সুশাসন ব্যবস্থার পূর্বশর্ত হচ্ছে সমাজে গণতন্ত্রের কার্যকরী অবস্থান। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে যেখানে সরকারের প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা এবং মানবাধিকারের অনুপস্থিতি সচরাচর লক্ষ্য করা যায়, যেখানে সুশাসনের মত একটি আদর্শকে বাস্তবায়ন সঠিকভাবে কঠিন, তবে টেকসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই আদর্শকে সামনে রেখে কিছু পদক্ষেপ নেয়া অত্যাবশ্যক। যেমন জবাবদিহি মূলক শাসন ব্যবস্থা, একটি কার্যকরী বিচার ব্যবস্থা এবং সুষ্ঠু আইন প্রণয়ন সংস্থা। আর উল্লেখিত বিষয়গুলো সুষ্ঠু কার্যকারীতার উপরই কোন দেশের সুষম উন্নয়ন নিভরশীল। এটাও উল্লেখ্য যে শাসন হচ্ছে জাতীয় বিষয়াবলীতে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার। আর এটা হচ্ছে সরকার এবং জনগণের সম্পর্কের সমন্বয়।

সুশাসনের অনুপস্থিতিতে উন্নয়নের গতিধারা ফিরে আসে না। যা এখন ব্যাপকভাবে গ্রহনযোগ্য। কেননা এটা বর্তমান আলোচ্য বিষয় সুশাসনের নিশ্চয়তা তখনই সম্ভব যখন আন্তরিক এবং অনবদ্য আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়। সর্বোপরি সুশাসন বাস্তবায়নে বর্তমান বিশ্ব যে সমস্ত বিষয়াবলীর প্রতি গুরুত্বরোপ করেছে। এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং ইসলামের সাথে এর যে মিল বা সামঞ্জস্যতা রয়েছে তা তুলে ধরার সাথে সাথে সুশাসনের বৈশিষ্টবলী তুলে ধরা হল-

প্রশাসনে জবাবদিহিতা :

গণতান্ত্রিক ও ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান প্রশাসনের উপর ন্যাস্ত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে দায়িত্ব পালনে প্রশাসনের উপর যে ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রশাসনকে তার জবাবদিহি করতে হয়। প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে যে সব ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার দীর্ঘসূত্রিতার ফলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, সরকারী অর্থ-সম্পদ অপচয়, জনগণের হয়রানী ইত্যাদি নানাবিধ অভিযোগ আছে। পত্র-পত্রিকায় চোখ পড়লেই দেখা যায় প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল। অথচ সরকারী কর্মচারীর অন্যায় কাজ ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের জন্য আছে সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধি, শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি, আছে দুর্নীতি দমন আইন। নাই শুধু এসব আইনের যথাযথ প্রয়োগ। তাই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, দুর্নীতি রোধে,

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে কর্মচারী শৃঙ্খলা বিধির প্রয়োগ নিশ্চিত করণে, প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। স্থিতিশীল সরকারের নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে দেশ ও জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি আনা সম্ভব।

প্রশাসন ও প্রশাসনে জবাবদিহিতাঃ

প্রশাসনের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শাসন কাজ পরিচালনা করা। সরকার পরিচালনার যে তিনটি ধারা বর্তমান বিশ্বে অব্যাহত রয়েছে তার মধ্যে প্রথমত: আইন পরিষদের মাধ্যমে আইন প্রণীত হয়, দ্বিতীয়ত: শাসন বিভাগের দ্বারা আইনের বাস্তবায়ন এবং তৃতীয়ত: বিচার বিভাগ কোথাও কিছু ঘটলে তা নিস্পত্তি করে। সাধারণ অর্থে প্রশাসন বলতে স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের কার্যনির্বাহী বিভাগের কাজকে বুঝায়। সরকারী নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব কাজই হচ্ছে প্রশাসন। সরকার প্রধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী মিলেই সরকার হয়। প্রশাসনের কাজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, সরকারী, বেসরকারী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার নীতি প্রণয়ন করে। কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহন করে, বিধি-বিধান প্রণয়ন করে এবং সে মোতাবেক দপ্তর, অধিদপ্তর ও কার্যালয় তা বাস্তবায়ন করে। প্রশাসন প্রধানত: আইন- শৃঙ্খলাসহ সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করে, ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ করে, যোগাযোগ, ব্যাংক বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কর্মকান্ডের যথাযথ প্রসারে উৎসাহ দেয় এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জনকল্যাণ ও সমাজ সেবা মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

প্রশাসন এবং জবাবদিহিতা দু'টি আলাদা শব্দ। প্রশাসন হল এমন একটি ব্যবস্থা যা শাসন কার্য পরিচালনা করে থাকে, আর জবাবদিহিতার আভিধানিক অর্থ কৈফিয়ত। অর্থাৎ জাবাবদিহিতা হচ্ছে সম্পাদিত কর্ম সম্পর্কে একজন ব্যক্তির ব্যাখ্যা দানের বাধ্যবাধকতা। অক্সফোর্ড এ্যাডভান্সড লার্নারস ডিক্শনারিতে জবাবদিহিকে "A requirment to give explanations for one's actions''[৮২] হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রশাসনে জবাবদিহিতা বলতে প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে যে ক্ষমতা বা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালন করার সন্তোষজনক কৈফিয়ত প্রদান করা বুঝায়। জনগণকে নিয়েই সরকার। সরকারকে নিয়েই প্রশাসন। জনগণের অর্থে সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় বিধায় এখানে জবাবদিহিতা শুধু প্রতিষ্ঠানের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পবিত্র কুর'আন, হাদীসের ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে কোন দেশের উপযোগী সংবিধান প্রণয়ন করে, এই সংবিধানের মাধ্যমে দেশের জনগণ প্রশাসনে ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

বর্গের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পন করেছে তা যথাযথভাবে পালন করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির কর্তব্য, সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দেশের যাবতীয় আইন ও বিধি বিধানে যে ক্ষমতা প্রশাসনকে দেয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে জনস্বার্থে কার্যকর করা প্রশাসনের দায়িত্ব। এসব ক্ষমতা যথাযথভাবে পালনের জন্য পশাসন জবাবদিহিতার দায়ে দায়বদ্ধ। চাকুরীর ক্ষেত্রে একজন না একজনের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। জবাবদিহির প্রথা না থাকলে স্বেচ্ছাচারিতা আসে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অনন্য কৌশল জবাবদিহিতা। দক্ষ এবং উন্নত প্রশাসনের জন্য জবাবদিহিতার বিকল্প নেই।

সরকারী কর্মচারীদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে বর্ণনা সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিতে বর্ণিত আছে। এ আচরণ বিধি প্রণয়নের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, দর্নীতি, অনিয়মের বিষয়ে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা। আচরণ বিধিবহির্ভূত কাজের জন্য সরকারী কর্মচারীকে শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি মোতাবেক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

প্রশাসনে স্বচ্ছতা :

আভিধানিক অর্থে যে বস্তুর ভিতর দিয়ে আলোর প্রতিসরণ ঘটে তাই স্বচ্ছ, যেমন কাঁচ, কিন্তু প্রশাসন কাঁচ নয়। প্রশাসনের কার্যাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহের ভিতর দিয়ে আলোর প্রতিসরণ হয় না, তাহলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা বলতে আমরা কি বুঝবো ? প্রশাসনের ভিতর দিয়ে যা প্রতিসরণ করতে পারে তা হচ্ছে- various kinds of information for public overservaion. Persual and guidance, Information about government decisions, activities, plans, Programmes, policies etc. Can be transmitted and furnished, made visible and intelligible through various ways and means to the public. [৮৩] প্রশাসন যখন কোন লক্ষ অর্জনের জন্য কাজ করে তখন সেই কাজটি প্রশাসন কিভাবে করছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণার অনুভূতিকে আমরা প্রশাসনের স্বচ্ছতা বলতে পারি। সুতরাং প্রশাসন যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে, পরিকল্পনা, কর্মসূচী বা নীতি গ্রহণ করে, সে সব সিদ্ধান্ত, কর্মসূচী বা নীতি কেন, কার জন্য এবং কি পদ্ধতিতে নেয়া হলো সে সব তথ্য যখন প্রশাসন জনগণের কাছে সুস্পষ্টভাবে উন্মুক্ত করে অথবা সে সব তথ্য বা ভেতরের খবর যখন জনগণের কাছে বিনা প্রতিবন্ধকতায় পৌছে তখন তাকে স্বচ্ছ প্রশাসন বলা যেতে পারে। আর ইসলামী শরী'আহ আইন তার যথার্থ স্বচ্ছতা রক্ষায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে যা আসহাবে রাসূলের জীবন বিধি মুতাবিক আমাদের নিকট সুস্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিসেফ Human settlements এর এর তথ্যানুযায়ী Transparency বা স্বচ্ছতার ব্যাখ্যা হল, 'Transparency means that decisions taken and their enforcement are done in manner that follows rules and regulations. It also means that information is freely available and directly accessible to those who will be affected by such decisions and their enforcement. It also means that enought informantion is provided and that it is provided in easily understandable forms and media" [৮৪] প্রশাসনে স্বচ্ছতা গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। সরকারের কাজ-কর্ম যদি স্বচ্ছ হয় তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা হয়ত হবে। কিন্তু সে ফল হবে সরকারের উপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি। সরকারের স্থিতিশীলতা জনগণের আস্থার উপর নির্ভরশীল। স্থিতিশীল সরকার অর্থ হচ্ছে নীতির স্থিতাবস্থা, যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর প্রশাসনের স্বচ্ছতার মধ্যদিয়ে জবাবদিহিতার বিষয়টি বেরিয়ে আসে।

সাংবিধানিক ন্যায়পাল নিয়োগঃ

ন্যায়পালের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগাদির তদন্তকারী কর্মচারী। অক্সফোর্ড অ্যাড্ভান্সড লার্নারস ডিক্শনারিতে ন্যায়পালকে ''A government official whose job is to examine and report on complaints made by ordinary people about the government or public outhorities" [৮৫] হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ন্যায়পাল একটি প্রতিষ্ঠান। আধুনিক বিশ্বে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবত কার্যকর থাকায় সেখানে প্রশাসন শুধু গতিশীলই হয়নি, বরং এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম, কাজের দীর্ঘসূত্রিতা ও দূর্নীতি রোধে ব্যাপকভাবে কার্যকরী ভূমিকা নেয়া সহজ হয়েছে। কোন দেশের পার্লামেন্ট নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সাধারণতঃ বিচারপতি বা প্রশাসনের অভিজ্ঞ সৎ, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে ন্যায়পাল মনোনয়ন করে থাকে। প্রশাসন যাতে দেশের আইন ও বিধি বিধানের বাহিরে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে তা নিশ্চিত করা ন্যায়পালের কাজ। এ ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ প্রত্যেক মানুষকে তার কাজের জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করেছে। রাসূল (স.) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স.)কে বলতে শুনেছি, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত করা হবে একজন দায়িত্বশীলা স্ত্রীকে তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ইমাম বা শাসক একজন দায়ীত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘর

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকেও তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। খাদিম তার মুনীবের মাল সংরক্ষণ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং সেও তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। [৮৬] এতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষই তার কার্য সম্পর্কে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ:

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের প্রভাব, হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে। বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে দুর্নীতির সাথে জড়িত মামলা মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করার এবং আদালতের রায় কার্যকর করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। তাছাড়া তদন্ত থেকে শুরু করে রায় ঘোষনা পর্যন্ত দুর্নীতির মামলায় বছরের পর বছর সময় লেগে যায়। দুর্নীতির মামলার বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা বিচারালয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ দুর্নীতির মামলার দ্রুত সুরাহা করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় না।
যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের সফলতার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। কোনো দেশ গণতন্ত্র আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার যত আয়োজনই করুক না কেন একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ ছাড়া এ সকল আয়োজন সবই নিরর্থক। আর বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অন্যতম পূর্বশর্ত হল শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ।

বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও স্বাধীনতার অর্থ:

বিচার বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সরকার মূলত আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সমন্বয়েই গঠিত হয়। তাই এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্পর্কের ধরণ শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীরনতা বলতে সাধারণত আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচার বিভাগের মুক্ততাকে বুঝায়। অন্যকথায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে আইনের ব্যাখ্যাদাতা ও বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষমতাকে বুঝায়।

আইনের শাসন :

আইনের শাসন আধুনিক গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম অনুষঙ্গ। আইনের শাসন বলতে সাধারণ বুঝায় সর্বক্ষেত্রে আইনই হবে প্রধান মাপকাঠি আইনের চোখে সবাই সমান বলে বিবেচিত হবে। প্রতিটি নাগরিক আইনের আশ্রয় গ্রহণ ও আইনানুগ বিচার পাওয়ার অধিকার ও সুযোগ ভোগ করবে। বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের অনুশাসনকে আরো জোরদার করতে হবে। দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি সমাজের যে কেউই হোক না কেন। শাস্তি যাতে এড়িয়ে যেতে না পারে সে জন্য কঠোরভাবেই আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সমতা বিধান :

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে মানুষের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, কোন বৈষম্য নেই বর্ণ ও শ্রেণীগত কোন ভেদাভেদ নেই। কেউ উঁচু নয়, কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়, কেউ দাস নয়, কেউ মনিব নয়, কেউ পবিত্র নয়, কেউ অস্পৃশ্য নয়। মানব হিসেবে সব মানুষ সমান। মানুষ হিসেবে সব মানুষ সৃষ্টিসূত্রে এক ও অভিন্ন। সুতরাং সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষ সমান। সব মানুষের সাথে সব মানুষের রয়েছে জন্মসূত্রগত চিরন্তন শ্বাশত সম্পর্ক। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে, সর্বাধিক পরহেযগার।' [৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১) সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্র রাজনীতি , গণতন্ত্র ও সুশাসন, একুশে বাংলা প্রকাশনা , ঢাকা, পৃ.৬৩।

২) ড. এমাউদ্দীন আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক করর্পোরেশন লিঃ ঢাকা, ২০০৭,পৃ.৫৩

৩) অধ্যাপক একে এম শহীদুল্লাহ, এম.রফিকুল ইসলাম, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ওরাল পাবলিকেশন-ঢাকা ২০০৪ পৃ.১৯১।

৪) অধ্যাপক এ কে এম শহীদুল্লাহ , এম রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত ,পৃ.২৬

৫) প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩

৬) Sherwani, H.K: Muslim Poitical Thought and Administration(1965) P.191. উদ্ধৃত মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন, রাষ্ট পরিচিতি, পৃ. ২৬৮।

৭) আবদুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা (১৯৫৫), পৃ.৪৪, তথ্যসূত্র মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন, রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি পৃ.২৬৮।

৮) মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন, রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি, মৌসুমী পাবলিকেশনস , রাজশাহী (১৯৮৩) পৃ.২৭১।

৯) মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪।

১০) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।

১১) Rosenthal : Erwin, Political Thought in Mediaeval Islam (1968) P.126.

১২) মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮২।

১৩) মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল কুর'আনে, রাষ্ট্র ও সরকার, খায়রুন প্রকাশনী,ঢাকা পৃ.১৪।

১৪) ইবনে খালদুনের ইতিহাসের ভূমিকা , প্রাগুক্ত, পৃ.১৪

১৫) আন-নাজমুস সিয়াসিয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪

১৬) সৈয়দ আনোয়ার হোসেন , প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩-৬৪।

১৭) অধ্যাপক একে এম শহীদুল্লাহ , এম রফিকুল ইসলাম, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রাগুক্ত ,পৃ. ২০২

১৮) Dr. Garner, Polical Science and Government. তথ্যসূত্র, অধ্যাপক একে এম শহীদুল্লাহ, এম রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২।

১৯) আল-কুর'আন, ৬:৫৭

২০) আল-কুর'আন, ৫:৪৯

২১) মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল কুর'আনে রাষ্ট্র ও সরকার, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ.৮৫।

২২) আল কুর'আন, ৩৮:২৬

২৩) আল-কুর'আন, ৩৮:২৬

২৪) আল-কুর'আন, ৫:৪৪

২৫) আল-কুর'আন,৩৫:৩৯

২৬) আল-কুর'আন,৯৫:৮

২৭) আল-কুর'আন,৭:৮৭

Dhaka University Institutional Repository

২৮) আল-কুর'আন,৩৩:৩৬

২৯) আল-কুর'আন,৪:৫৭

৩০) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত , বুখারী , তথ্যসূত্রঃ- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম , প্রাগুক্ত পৃ. ৯১

৩১) আলকুর'আন,২:৩০

৩২) আল-কুর'আন, ২:৩০

৩৩) আল-কুর'আন, ৯৫:৪

৩৪) মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৭

৩৫) এ জেড , এম,শামসুল আলম, ইসলামী রাষ্ট্র , খোশরোজ,কিতাবমহল, ঢাকা ১৯৯৬,পৃ.৯৯

৩৬) এ, জেড, এম, শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০০

৩৭) অধ্যাপক একে,এম , শহীদুল্লাহ, এম রফিকুল ইসলাম আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৩৮) প্রফেসর ফিরোজা বেগম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি , এজেল প্রেস এ্যান্ড পাবলিকশন্স ২০০৩, পৃ. ৫৫

৩৯) আল-কুর'আন, 2:209

৪০) Bosworth Smith, life of Muhommad , তথ্যসূত্র দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ মার্চ ২০০৬, পৃ.২৭

৪১) আল-কুর'আন, ২২:৪৩

৪২) মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৪৩) আল-কুর'আন, ৪:৫৯

৪৪) আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

৪৫) ডাঃ মোঃ নিজাম উদ্দীন, দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ, ২০০৭, পৃ. ২১

৪৬) আল-কুর'আন, ১৫:৪৩

৪৭) ডাঃ মোঃ নিজাম উদ্দীন, দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ, ২০০৭ প্রকাশিত প্রবন্ধ, পৃ.২১

৪৮) প্রাগুক্ত, পৃ.২১

৪৯) প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩

৫০) প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩

৫১) প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩

৫২) প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩

৫৩) মুহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, হযরত উমর (রাঃ) সুশাসন, দৈনিক ইত্তেফাক ২ মার্চ ২০০৭,পৃ .২৩

৫৪) প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

৫৫) প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

৫৬) প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

৫৭) ডাঃ মোঃ নিজাম উদ্দীন, দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ ২০০৭, পৃ. ২৩

৫৮) প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

Dhaka University Institutional Repository

৫৯) প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

৬০) প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

৬১) প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

৬২) প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

৬৩) তিরমিযী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.২০৯

৬৪) অধ্যাপক একে এম শহীদুল্লাহ ও এম রফিকুল ইসলাম, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ওরাল পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ.২৬৬

৬৫) অধ্যাপক গোলাম আজম, ইসলাম ও গনতন্ত্র , আল-আযমী পাবলিকেশনস,ঢাকা-২০০৬ পৃ.৭

৬৬) প্রাগুক্ত. পৃ.৯

৬৭) গুড গভর্ন্যান্স রিসার্স গ্রুপ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও মত প্রকাশের মুখপত্র, মাননীয় ভোটার

৬৮) দৈনিক সংগ্রাম, মহানবী (স.) সম্পাদিত জগতের প্রথম বহুজার্তিক রাষ্ট্রসনদ, ১৪ এপ্রিল ২০০৭, পৃ.৫

৬৯) প্রাগুক্ত পৃ.৫

৭০) প্রাগুক্ত পৃ. ৫

৭১) গণতন্ত্র ও ইসলাম, আমার দেশ , দৈনিক পত্রিকা , ২৭ এপ্রিল ২০০৭ পৃ. ৮

৭২) আল-কুর'আন; ৪২:৩৮

৭৩) ডাঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃ.- ৮

৭৪) প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৭৫) প্রাগুক্ত, পৃ.৮

৭৬) আল-কুরআন, ৬ : ৫২

৭৭) আল-কুরআন, ৩:১১০

৭৮) মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃ.৮

৭৯) বদর উদ্দিন আহমেদ, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও নৈতিক দায়িত্ব, দৈনিক নয়াদিগন্ত,পৃ. ৬

৮০) প্রাগুক্ত, পৃ.৬

৮১) প্রাগুক্ত, পৃ.৬

৮২) Oxford advanced learner's Dictionary, A S Hornby Sixth edition, Oxford University press, P.8

৮৩) সম্পাদনা পরিষদ, বি.সি.এস টেক্সট সেফল অ্যাসেসমেন্ট, মিলারস্ প্রকাশনী, ঢাকা আগষ্ট ২০০৪, পৃ ১৬

৮৪) ইউনিসেফ "Human Settelements'' রির্পোট,ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

৮৫) Oxford Advanced learner's Dictionary, op, cit p.883

৮৬) মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুম'আ, বুখারী, দেওবন্দ, ছাপা ১৯৮৫ খ্রি., প্রথম খন্ড, পৃ.১২২

৮৭) আল-কুরআন ৪৯:১৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরী'আহ আইনের সহায়ক ভূমিকা

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ন্যায়বিচারের ভূমিকা

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অপরিহার্যতা

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিচার ব্যবস্থা

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের গুরুত্ব

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিচার বিভাগ

আইনের শাসনের নীতি ও অভিব্যক্তি

আইনের শাসনের জন্য করনীয়

দূর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিচার বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরীআহ আইনের সহায়ক ভূমিকা :

১.সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ন্যায়বিচারের ভুমিকা :

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এবং সমাজের কল্যাণের স্বার্থে সামাজিক ন্যায়বিচার অপরিহার্য। ইসলামী শরীআহ সুশাসনের মাধ্যমে সম্পদের সুষমবন্টন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। অপরদিকে সামাজিক ন্যায়বিচার ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। সামাজিক ন্যায়বিচার কথাটি মূলত: এমন এক ভাবধারা ভিত্তিক যা জাতি , ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের মধ্যকার পার্থক্য ব্যতিরেকে সমাজে সকল মানুষের সমতা নির্দেশ করে। তাছাড়া সকল মানুষের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টিতেও এর অর্থবোধ লক্ষ্য করা যায়। ন্যায়বিচার মানুষের চিরন্তন প্রত্যাশা। মানুষ নিজের অধিকার নিয়ে সমাজে বাঁচতে চায়। চায় প্রাপ্য স্বাধীনতা। মানুষের এই যে অধিকার, স্বাধীনতা, এগুলো কোন জাগতিক উৎস হতে উদ্ভুত নয়, বরং ঐশীভাবে প্রাপ্ত। মানুষের সৃষ্টি হয়েছে এ অধিকারগুলো নিয়ে। সুতরাং এগুলো কেড়ে নেওয়ার অধিকার অন্য কারও হাতে থাকতে পারে না। এ অধিকারগুলো সংরক্ষণ হল সামাজিক ন্যায়বিচার।[১] অধিকারগুলো সংরক্ষণের জন্যই প্রণীত হয়েছে জাগতিক আইনসমূহ: এগুলো সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিচার বিভাগ, যার মূল দর্শন 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন'। সমাজের প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ অধিকার নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি সমাজকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দেয়। সমাজ হয়ে উঠে অশান্ত। এই অশান্ত অবস্থায় মানব জীবনের সুষ্ঠু বিকাশে সম্ভব নয়। ব্যক্তি জীবনের পূর্ণ বিকাশ ও সামাজিক অগ্রগতির স্বাভাবিক ধারা বজায় রাখতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা জরুরী।[২]

সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা প্রসঙ্গে : Encyclopedia of Social Work এ বলা হয়েছে " Social Justice is the embodiment of fairness (whether peoples are dealt with reasonably), equity (whether similar situation are dealt with similarly) and equality (whether people and situations are dealt with in the same manner". [৩]

ন্যায়বিচার সাম্য ও নিরাপত্তার প্রধান নিয়ামক। এর মাধ্যমেই ন্যায়বোধ পালিত হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম সমাজে সবল, দূর্বল, ধনী, গরীব এবং শাসক শাসিত্যের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে সামাজিক সংহতি ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। ইসলাম যে সুবিচার নীতি উপস্থাপন করেছে তা সকল মানুষের প্রতিই সমানভাবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রযোজ্য। আইন প্রয়োগে মানুষে মানুষে কোনরূপ ভেদাভেদ করার নীতি ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয় তা বংশের দিক দিয়েই হোক, এমনকি আক্বীদা, বিশ্বাস, আত্মীয়তা , নৈকট্য, বন্ধুত্ব ইত্যাদির কারণে আইন প্রয়োগে কোনরূপ পার্থক্য করা চলবে না। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে,

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

'আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর। তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক ।'[৪]

অন্য আরেকটি আয়াতে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক: আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়; তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশী।' [৫]

মহানবী (স.) ও তার খলীফাগণ ছিলেন আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের মূর্তপ্রতীক। এর প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা থেকে। তাইমা ইবন উবাইরাক নামে মাত্র একজন মুসলমান (প্রকৃতপক্ষে সে ছিল কপট) বর্ম চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হলে, সে বর্মটি একজন ইহুদীর বাড়ীতে পুতে রাখে। ইহুদীর বাড়ী থেকে তা উদ্ধার করা হলে ইহুদী অভিযোগ অস্বীকার করে এবং তাইমার উপর দোষ চাপায়। একজন মুসলমান হিসেবে সকল মুসলমানের সহানুভূতি ছিল তাইমার পক্ষে। মহানবী (স.) মামলাটি নিজের হাতে নিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক বিচার করে ইহুদীকে মুক্তি দান করলেন। [৬]

বনু মাখযুম গোত্রের ফাতিমা নাম্নী এক মহিলা চুরি করে ধরা পড়লে মহানবী (স.) তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কুরাইশদের জন্য ব্যাপারটা বড়ই বিব্রতকর হয়ে দেখা দিল। তাই তারা নবীর প্রিয়পাত্র উসামা বিন যায়েদকে তার নিকট পাঠালেন সুপারিশের জন্য। মহানবী (স.) তা প্রত্যাখান করলেন এবং সবাইকে জমায়েত করে তিনি একটি জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের প্রদান কারণ ছিল এই যে, তাদের দৃষ্টিতে যারা অভিজাত ছিল, তাদের কেউ অপরাধ করলে তাকে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল শ্রেণীভূক্ত কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর শপথ, চুরির অপরাধে ধৃত এই ফাতিমা যদি আমি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও হত, তবে আমি তার হাতও না কেটে ছাড়তাম না।' [৭]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসকগণ সকলকে সাম্যের ভিত্তিতে একই কাতারে রেখে বিচার ফায়সালা করতেন। এমনকি মহানবী (স.) খোলাফা এ রাশেদীনের এক হাজার বছর পরেও আইনের চোখে সমতার জ্বলন্ত উদাহরণ স্বরূপ অনেক ঘটনাই রয়েছে। শের শাহের পুত্র আদিল খাঁ নদীতে স্নানরতা এক মহিলার দিকে পান পাতার বিড়া ছুঁড়ে মেরেছিল। মহিলা ক্ষিপ্ত হলে তার স্বামী শের শাহের নিকট অভিযোগ করলে তিনি আর্দেশ দিলেন যে, অভিযোগকারীও রাজপুত্র আদিল খাঁনের স্ত্রীর দিকে অনুরূপ পানের বিড়া ছুঁড়ে মারবেন। যেহেতু এটাই হচ্ছ ইসলামী বিধানের প্রতিশোধ মূলনীতি। [৮]

কয়েকজন উট মালিকের ঘটনায় মদীনার কাযীর আহবানে আব্বাসীর খলীফা মনসুর স্বশরীরে উপস্থিত হলেন এবং কাযীর সামনে একজন সাধারন বিবাদীর বেশে দাঁড়ালেন। কাযী খলীফাকে অভ্যর্থনা জানাতে এমনকি তার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন না। বাদীর পক্ষে মামলার রায় হল। সঠিক ও উপযুক্ত বিচারের জন্য মনসুর পরবর্তীতে কাযীকে উপঢৌকন দিয়ে তার স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতার স্বীকৃতি দিলেন। [৯]

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অপরিহার্যতা :

সামাজিক নিরাপত্তা বলতে মূলত প্রতিকূল অবস্থা হতে নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহীত এক ব্যবস্থাকে বুঝায়। নিরাপত্তা শব্দের অর্থ বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা। সে অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা হল এমন এক ধরনের ব্যবস্থা বা কর্মসূচী যার মাধ্যমে সমাজবাসীকে সম্ভাব্য বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত এক ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা বুঝায়।

সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত কোন ধরনের অন্তরায় থাকবে না। আর সামাজিক নিরাপত্তা মানব জীবনের এমন একটি অবস্থা (Situation) যেমনঃ বেকারত্ব , পঙ্গুত্ব , বার্ধক্য কার্যকালীন দুর্ঘটনা প্রভৃতি যা মানুষের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন-যাপনের জন্য প্রতিকূল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক অবস্থায় স্বল্প আয়ের লোকেরা নিজের সামর্থ দিয়ে পূরন করতে পারে না। যার প্রেক্ষিতে সমাজ বা রাষ্ট্র জনগণকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে থাকে। ডা. আলী আকবরের কথায়, Social security is a general concept with generally refers of social insurance, social assistance, family allowances and a variety of social services designed to reduce economics burdens of a family.[১০]

Dhaka University Institutional Repository

Encyclopedia of social work in India (1967) তে সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Social security ensures a person against economic distress resulting from various contingencies and assures him a minimum level of living consistant with the nations capacity to. [১১]

William Beveridage এর মতে, পারিবারিক পর্যায়ে বিভিন্ন দুর্যোগে আয়ের পথ বন্ধ হলে আয়ের নিশ্চয়তা দান করার জন্য গৃহীত কর্মসূচী হল সামাজিক নিরাপত্তা। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি কর্মক্ষম তখন তাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া এবং যখন কেউ কাজ করতে অক্ষম তখন আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়াই সামাজিক নিরাপত্তার কাজ।'[১২] উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর পর্যালোচনায় বলা যায় যে, সব সমস্যা ও অর্থনৈতিক দুর্যোগ মানুষ নিজের সম্পদ, সামর্থ বৃদ্ধি ও দূরদর্শিতার দ্বারা মোকাবেলা করতে পারে না। সে সব দুর্যোগ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক যে ব্যবস্থাসমূহ নেয়া হয় সেগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বলে।

সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য হল সমাজে অক্ষম ও বিপন্ন মানুষের মৌল চাহিদাসমূহ পূরণেব ব্যবস্থা করে জীবন যাত্রার একটি নূন্যতম মান বজায় রাখতে সাহায্য করা, যার মাধ্যমে সমাজে সুশাসন নিশ্চিত হয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদি বিশেষ কারণে কোন ব্যক্তির মৌলিক অর্থনৈতিক চাহিদা যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। চাকুরী এবং অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুবিধা থাকবে। প্রতিটি ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও সামর্থ অনুযায়ী যে কোন পেশা বা চাকুরীতে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। তার উপার্জিত অর্থ স্বাধীনভাবে ভোগ করার অধিকার থাকবে। কোন ব্যক্তি যদি প্রচেষ্টা করেও তার মৌলিক অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করতে সামর্থ হয় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে সাহায্য প্রদানের বিধান রয়েছে। অধিকন্তু বেকার, অসামর্থ এবং অভিভাবকহীন পরিবারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থ সাহায্য দেয়ার বিধান ইসলামী আইনে রাখা হয়েছে। এভাবে ইসলাম সামাজিকভাবে মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের একটি পূর্ণাঙ্গ নয় যে, ব্যক্তি পেট ভরে যায় অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে। তদুপরি রয়েছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খলীফা উমর (র.) ও খলীফা দ্বিতীয় উমর এর আমলে দেখা যায়। কাজ, ন্যায্য মজুরীসহ শ্রমিকের সকল প্রকার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ইসলামী শরীআহ ন্যায়সঙ্গতভাবে আদায়ের জোড় সুপারিশ করেছে। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজেই শ্রমজীবি মানুষ ছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি শ্রম বিভাগের মাধ্যমে অংশীদার হিসেবে হযরত খাদিজা (র.) এর ব্যবসায় খেটেছেন। খোলাফা-এ-

Dhaka University Institutional Repository

রাশেদার অন্যতম দুই খলীফা হযরত উমর (র.) এবং হযরত আলী (র.) তেমন রূপে জীবন যাপন করেছেন। ইসলাম শ্রমিকদের মজুরী যথাসময়ে পৌছে দেয়ার জন্য তাগিদ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

'অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞসাবাদ করা হবে।'[১৩]

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামাজিক নিরাপত্তার অপরিহার্যতা অপরিসীম। এই সমাজে কেউ কাউকেও ঠকাতে পারবে না এবং দায়িত্বে অবহেলা করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

'যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য দুর্যোগ, যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়।'[১৪]

সর্বোপরে শ্রমিকের অধিকারকে যথাসময়ে আদায়ের ব্যাপারে রাসূল (স.) এর স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। মহানবী (স.) বলেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' [১৫]

ইসলামী শরী'আহ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামাজিক নিরাপত্তার সকল প্রকার বিষয়কে গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করে। তার মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার , শিক্ষা লাভের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সংখ্যালঘু অমুসলিমরা তাদের সমস্ত সামাজিক অধিকার ভোগ করে থাকে। ইসলামী আইনে অমুসলিমদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার বিধান করা হয়েছে। একইভাবে তাদের শিক্ষার ও রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে। অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,'لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য।'[১৬]

সামাজিক আইন হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্থা থেকে প্রবাহমান সামাজিক বিধি বিধানের সমষ্টি। আইনের মূল কাজ হল শাসকের মাধ্যমে সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করা, সংহতি সাধন ও শৃঙ্খলা আনয়ন। আর্থ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সমতা আনয়ন, কু প্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণ এবং নির্যাতিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য রাষ্ট্রীয় সাবভৌম প্রতিষ্ঠান প্রণীত বিধি-বিধানের সামাজিক আইন বলে।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

এই সামাজিক আইনের মাধ্যমে ইসলামী শরীআহ সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করে থাকে এবং এর মাধ্যমে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয়। মোটকথা, যখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তখন এ অবস্থা মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষ হতে যে সকল ব্যবস্থা গৃহীত হয় সে সকলের সমষ্টিই সামাজিক নিরাপত্তা।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিচার ব্যবস্থা:

আইনের চোখে সবাই একই রকম। সবার উপর আইনের কর্তৃত্ব সমভাবে কার্যকর। তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে শুধু ন্যায়ের ভিত্তিতে। সমাজ কাঠামোতে সকলের অবস্থান সমান। যে শক্তিশালী, সে দূর্বলকে সাহায্য করে। এভাবে গোটা সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির সেবকে পরিণত হয়। মহানবীর (স.) উক্তি মতে, পারস্পরিক স্নেহ মমতায় মুসলমানদের উদাহরণ একটা একক দেহের মত। দেহের একটা অঙ্গ যখন রুগ্ন হয়। তখন সব কটা অঙ্গ তার সাথে জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় আক্রান্ত হয়। মহানবী (স.) আর বলেন, তোমরা সকলে ভাই ভাই এবং সকলেই সমান। তোমাদের মতে কেউ অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে না। একজন আরব একজন অনারবের উপর এবং একজন অনারব একজন আরবের উপর প্রাধান্য লাভ করবে না। অনুরূপভাবে একজন শ্বেতাঙ্গকে একজন কৃষ্ণাঙ্গের উপর এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ একজন শ্বেতাঙ্গের উপর প্রাধান্য প্রাপ্তি ব্যতীত। [১৮]

ইসলামের এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতি, অধিকার ও দায়িত্ব উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে পালিত হত। এ প্রসঙ্গে সরোজীনি নাইডু লন্ডনে তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, It (Islam) has brought to the modern world the true gift of democracy but the trend of civilization today the sum total of the world's aspiration today is to reconstruct the new world towards the brotherhood that was preached in the desert by a camel-driver more than thirteen hundred years ago--------. Centuries ago when my forefathers, were evolving great philoso phies and sending to the younger nations a message of enlightenment, Arabia was still uncultured. Arabic was nothing but a desert of wild of holders when the great Buddhist message of "Nirvan" was being enumerated from the Bo-tree by Buddha Gaya and Sarnath. There was no conception of what the world 'Democracy' meant when Christ was crucified upon the cross by the unbelievers, even then the ideal of brotherhood was not accepted. It was challenged and

Dhaka University Institutional Repository

trampled in the dust. It was necessary that a camel-driver from Arabia should gave to the world in the ultimate from the most perfect definition of brotherhood of the republic of equality of all men of all classes of all rank" [১৯]

ইসলামী শরী'আহ্ সর্বদা বিচারেরপ্রতি গুরুত্বরোপ করে এবং সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ

' নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক।' [২০]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ

' হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর। তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও।' [২১]

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা:

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর নিযুক্ত কাজী বা বিচারক ছিলেন। এ জন্যে বিচার বিভাগও সম্পূর্ণরূপে তারই হাতে ছিল। এ ব্যাপারে তার নীতি ছিল যে, ইনসাফ করা বা ন্যায়বিচার করা হবে তা নয়, বরং মানুষ দেখুক যে ইনসাফ করা হচ্ছে। খোলা আদালতে সকল মামলার শুনানী হত। গোপন শুনানীর কোন দৃষ্টান্ত তার বিচার ব্যবস্থায় নেই। বিখ্যাত ঘটনা যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে কোন এক সাহাবী মক্কায় মোশরেকদের নামে এ মর্মে চিঠি লিখে তাদেরকে সংবাদ পাঠায় যে, তোমাদের উপর আক্রমণ হতে যাচ্ছে। চিঠি ধরা পড়ে। এটা একটা গুপ্তচর বৃত্তির ব্যাপার। এ যুগের লোকেরা এটাই বলবে যে, এ ভয়ংকার ব্যাপার রুদ্ধদ্বার কক্ষেই পেশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিশ্ব নবী (স.) মসজিদে নববীতে খোলাখুলিভাবে তার গুণাবলী করেন। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল যে, উভয়পক্ষের বক্তব্য না শুনে কোন মামলার রায় দিতেন না। আর কোন ব্যক্তিকেই আত্মপক্ষ সমর্থন করার পুরোপরি সুযোগ না দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে কোন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত

Dhaka University Institutional Repository

করা হত না। বিশ্বনবী (স.) মদীনার বাইরে যে সকল কাজী নিযুক্ত করেছেন তাদের জন্যেও তার নির্দেশ ছিল যে, উভয় পক্ষের বক্তব্য না শুনে কোন সিদ্ধান্ত দেবে না। আদালতের ব্যাপারে সুপারিশের পথ তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে বন্ধ করেছেন। মক্কা বিজয়ের পর কোরাইশদের এক অভিজাত পরিবারের মহিলা চুরি করায় অপরাধী হয়। তার পরিবারের লোকেরা চেষ্টা তদবীর করা আরম্ভ করে , যেন তার হাত কাটা না হয়। বিশ্ব নবী (স.) একান্ত প্রিয়জন হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) দ্বারা সুপারিশ করানো হয়। বিশ্ব নবী (স.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি হুদুদুল্লাহর ব্যাপারেও কি সুপারিশ করতে এসেছ, সাধারণ লোকের কোন অপরাধ করলে তাদেরকে আইন অনুসারে শাস্তি দেয়া হত, অপরদিকে কোন বড় লোক যদি একই অপরাধ করতো তখন তাঁর সাথে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হত। আল্লাহর কসম মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরির অপরাধে অপরাধী হতো তাহলেও আমি তার হাত কেটে দিতাম। এভাবে তিনি কেবল সুপারিশের পথই বন্ধ করেননি, বরং এ নীতিও কায়েম করেছেন যে, আদালতকে ধোকা দিয়ে যদি কেউ নিজের পক্ষে ফয়সালা করিয়ে নেয় তাহলে কেবল দুনিয়াতেই সে ফায়দা হাসিল করতে পারে, পরকালে বিচার বিভাগ আল্লাহর হাত থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।[২২]

বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের গুরুত্ব :

দেশে আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথর্কীকরণের গুরুত্ব অনেক। যেমন-

প্রথমত: সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগ সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী এবং অন্যান্য বিভাগ তথা আইন ও বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব সুবিদিত। বিশেষ করে যারা দেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা সরকারের শাসন বিভাগেরই অন্তর্ভূক্ত। দেশের রাজনীতি , অর্থনীতি, সমাজ ও প্রশাসন চালায় শাসন বিভাগ। তাই শাসন বিভাগ যদি বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করা বিচার বিভাগের জন্য রীতিমত অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত: বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে না পারলে বিচারপতিগণ প্রভাবমুক্ত হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারবে না। কেননা, দেশের সাধারণ জনগণের সাথে ব্যাপক সম্পৃক্ততার কারণে শাসন বিভাগ তথা রাজনীতিবিদরা প্রতিটি অপরাধ ও অপরাধীর সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত থাকেন। ফলে যখন তাদের কোন বিষয় কোর্টে উথাপিত হয় তখন তারা প্রভাব খাটিয়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটন ও ন্যায়বিচার পরিচালনার পথে পাহাড় সমান বাধার সৃষ্টি করে। তারা বিচারকার্যকে

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের পক্ষে নিতে বিচারপতিদের প্রভাবিত করে। ফলে প্রভাবমুক্ত থেকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত : শাসন বিভাগের প্রভাব ও হস্তক্ষেপের ফলে বিচারকার্যে নিরপেক্ষতা-নষ্ট হয়। শাসন বিভাগের অবাঞ্ছিত ও অনুচিত হস্তক্ষেপের ফলে বিচারপতিগণ তাদের পবিত্র দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করতে পারেন না। ফলে পুরো বিচারকার্যই একটা প্রহসনে রূপ নেয়।

চতুর্থত : বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্বপালন করতে না পারলে বিচারকার্যে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং বিচারকার্য বিলম্বিত হয়। সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা উঠে যায়। তাই দেশের শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ খুবই জরুরী। সর্বোপরি দেশে আইনের শাসন, গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকারের মত সুশীল ধারণাগুলোর কার্যকারিতার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আবশ্যক।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিচার বিভাগ

আইন রচনা ও প্রয়োগ নীতি :

বিশ্বনবী (স.) কর্তৃক আনীত দীনে মূলতঃ আইন ছিল আল্লাহর দেয়া। আর আইন প্রণয়নের অধিকার ও একমাত্র আল্লাহরই। অতএব বিশ্বনবী (স.) এর আইন প্রণয়নকারী মর্যাদা ছিল না, বরং তিনি ছিলেন আইন প্রয়োগকারী, তার ব্যাখ্যা দানকারী, মানুষকে সে অনুসারে সুবিচার ও ব্যবস্থা পরিচালনা করার প্রশিক্ষণ দানকারী। তিনি মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহর আইন কি ও কাকে বলে? তিনি তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সুন্নাতের মধ্যে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, কুর'আন মজীদে চুরির শাস্তির হুকুম একান্ত সংক্ষিপ্ত কথায় দেয়া হয়েছে। চোরের হাত কেটে দাও, এর বেশী কোন বিবরন কুর'আন মজীদে নেই। এখন বিশ্বনবী (স.) এর সুন্নাতেই আমাদেরকে বলে দেয় যে, এ হুকুম কোন অবস্থায় কার্যকরী হবে কোন অবস্থায় কার্যকারী হবে না। চুরি কাকে বলে আর কাকে বলে না। কি ধরনের মাল কি পরিমান চুরি করলে এ শাস্তি দেয়া হবে এবং কিভাবে তা কার্যকারী হবে। সুন্নাতের মাধ্যমে যদি কুর'আনের এ ব্যাখ্যা আমরা না পেতাম তাহলে কখনও আমরা ঠিকমত এ হুকুম তামিল করতে পারতাম না। অতএব এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বিশ্বনবী (স.) নিজে প্রণয়নকারী ছিলেন না। আর তিনি ছিলেন তার দ্বারা নিযুক্ত সরকারী ব্যাখ্যাদানকারী। অতএব যে জিনিসটিকে আমরা ইসলামী আইন বলি তা হচ্ছে কুর'আন ও সুন্নাতের সমষ্টি।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

আইন প্রয়োগ করার ব্যাপারে তিনি যে ব্যবস্থা কায়েম করেছেন তার কতগুলো উল্লেখযোগ্য নীতি হচ্ছে এই যে, বিচারকের কোন অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া ভুল করা কোন নিরপরাধীকে শাস্তি দিয়ে ভুল করার চাইতে উত্তম। পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ নিজেরাই মিটমাট করে ফেলুন কারো অপরাধ ক্ষমা করতে হলে তা করুক অথবা কারো পাপ অপরাধ গোপন রাখতে চাইলে তা করতে পারে। এ সব কিছুই আদালত পর্যন্ত যাওয়ার পূর্বেই সেরে নিতে হবে। কিন্তু ব্যাপার বিচারালয় পর্যন্ত পৌছলে পরে ক্ষমা ও গোপন করার কোন পথ থাকবে না। এরপর কেবল আদালতই আইন অনুসারে বিচার করবে। আদালত প্রভাবিত করার যে কোন প্রচেষ্টাকেই তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং ফয়সালা দিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, না জেনে বিচার করা কিংবা জানা সত্ত্বেও অন্যায় বিচার করা মস্ত গুনাহের কাজ। প্রকৃত কাজী সেই ব্যক্তিই যে আইন জানে এবং নিজের জ্ঞান অনুসারে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে।[২৪]

আইনের শাসনের নীতি ও অভিব্যক্তি :

সাধারণ অর্থে আইনের শাসন হল-আইনের সর্বোচ্চ প্রধান্য বা কর্তৃত্ব। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয় নির্ধারণের মাপকাঠি হবে আইন এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক আইনের চোখে সমান বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং আইনের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব (Supremacy of law) এবং আইনের চোখে সমতা (Equality before law) এ দু'টি বিষয়কে মূল ধরলেও আইনের শাসনের আরো কিছু প্রাসঙ্গিক দিক বা বিষয় চলে আসে।

প্রথমত: আইনের শাসনের মৌলিক নীতি হল শাসনকার্যে স্বেচ্ছাচারিতার কোন স্থান থাকবে না। রাষ্ট্র কেবল সংবিধিবদ্ধ আইন বা প্রচলিত রাজনীতি ও বিশ্বাসের ফলে গড়ে উঠা আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা দল নয়, আইনই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল মাপকাঠি।

দ্বিতীয়ত: আইনের শাসনের আরেকটি মূলনীতি হল, জাতি-ধর্ম -বর্ণ-গোত্র-দল বা উপদল নয়, বরং রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তিই আইনের চোখে সমান বলে বিবেচিত হবে। রাষ্ট্রের কোন নাগরিক যেমন আপন প্রভাবে আইনের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। তেমনি কোন নাগরিকই আইনের চোখে নিম্নতর বলে বিবেচিত হতে পারে না।

তৃতীয়ত: আইনের শাসনের আরেকটি দিক হল রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের যেমন তার কৃতকর্মের জন্য আইনের মুখোমুখি হতে হবে। তেমনি তার অধিকার ও দাবির ব্যাপারে আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার ও সুযোগ থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থত: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার একটি পূর্বশর্ত হল আইনকে অবশ্যই যৌক্তিক হতে হবে। কোন আইন যদি নীতিগত বা পদ্ধতিগতভাবে অযৌক্তিক হয় তাহলে সে আইনে পরিচালিত শাসন আইনের শাসনের মূলনীতির অনুকূল হতে পারে না।

পঞ্চমত: আইন প্রণয়ন বাস্তবায়ন এবং আইনের যথাযর্থ প্রয়োগ ও মূল্যায়নসহ বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত সরকারের আইন, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। বিশেষত বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখতে হবে।

আইনের শাসনের জন্য করণীয় :

ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী আইনের শাসনের জন্য কতিপয় বিষয়ের প্রতি জরুরী ভিত্তিতে দৃষ্টি দিতে হবে,

- কার্যকর অর্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সে জন্য বিচার বিভাগ থেকে শাসন বিভাগ আলাদা থাকবে।
- বিচার বিভাগীয় স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ন্যায়পাল নিয়োগের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিশেষ করে পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে তাদের সদস্যদের দুর্নীতির বিষয়ে যেমন কঠোর হওয়া দরকার, তেমনি তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়েও নজর দেয়া অতীব জরুরী।
- আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়ার রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে। আইনে তার নিজস্ব গতিতে চলতে বাধা দেয়ার মাধ্যমে কুশাসনের পথ তৈরী করা থেকে বিরত থাকা।
- অপরাধীকে দলীয় সমর্থন দেয়ার নোংরা মানসিকতা পরিহার করা এবং আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া।সর্বোপরি আইনের প্রয়োজনীয়তা যেমনটা জরুরী তেমনি আইনের প্রয়োগটাও হতে হবে বাধীমুক্ত আর তাতেই সুশাসন আশা করা যায়।

দুর্নীতি মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা :

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনের জন্য পুরোপুরি স্বাধীন এবং পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিয়ে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা। এই কমিশন যাতে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন প্রকার পূর্বানুমতি ছাড়াই দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে সে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি সুশাসনের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। দুর্নীতিও এক ধরণের সন্ত্রাস। পিস্তল দেখিয়ে পয়সা আদায় আর ফাইল ঠেকিয়ে পয়সা আদায়ের মধ্যে তফাৎ শুধু মাত্রার। অন্তিমে লক্ষ্য এক। তাই সত্যিকার অর্থে দুর্নীতি নিমূল করতে না পারলে কোনভাবেই সুশাসনের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

আভিধানিক অর্থে দুর্নীতি হল ঘুষ বা অনুগ্রহ দ্বারা জনকর্তব্য সম্পাদনে একাগ্রতার বিকৃতি বা ধ্বংস। নৈতিক প্রেক্ষাপটে বলা যায়, নীতিবিচ্যুত হওয়া বা কোনো গুণ ও পবিত্রতার অবমাননাই হল দুর্নীতি। আবার প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ, কিংবা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কাউকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে যদি কোন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজের খেয়াল-খুশি মত সরকারী ক্ষমতা বা পদমর্যাদার অপব্যবহার করে বা টাকা-পয়সা এবং বস্তুগত ও অন্যবিধ উৎকোচাদির মাধ্যমে অন্যায় কোন কাজ করে অথবা ন্যায়সঙ্গত কাজ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তার এরূপ কার্যকলাপ দুর্নীতি।

দুর্নীতি দমনের উপায় সমূহ:

বর্তমানে দুর্নীতি সমস্যা বিশ্বব্যাপি ক্যান্সার স্বরূপ বিস্তার লাভ করেছে। তাই যে কোন দেশের জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে সমাজের সর্বস্তর থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার বিষয়টি এক নম্বর অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। দুর্নীতি প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের পবিত্র ও সাংবিধানিক দায়িত্ব। আর এজন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহন, কঠোরভাবে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গঠন। তার পাশাপাশি নিম্নোল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১। দুর্নীতি বিরোধী জনমত গঠন: কোন সরকারের প্রথম কাজ হবে, সমাজে দুর্নীতির কুফলগুলো তুলে ধরে সমাজের সকলকে সচেতন করা। এজন্য পারিবারিক পর্যায় থেকে উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত নৈতিক শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

২। ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাগ্রত করা : দুর্নীতি দমনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো মানুষের মাঝে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাগ্রত করা। কারণ নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি কখনো দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারে না।

৩। দুর্নীতি বিরোধী টাস্কফোর্স গঠন : দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সকল প্রাসঙ্গিক ইস্যু মূল্যায়ন এবং দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য দক্ষ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ নাগরিকদের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা। এই টাস্কফোর্স দুর্নীতি দমনের একটি বিশাল কর্মসূচি হাতে নিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। ন্যায়পাল পদে বাস্তবায়ন : সরকারী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত নিরপেক্ষ ভাবে সম্পাদনের জন্য ন্যায়পালের অফিস প্রতিষ্ঠা করা।

৫। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা : দুর্নীতি প্রতিরোধের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। এজন্য শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও রাজনৈতিক দলের প্রভাব ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত আইনের অধীন পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা। যাতে এ কমিশন দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট মামলা মোকাদ্দমা বিচার নিষ্পত্তি করতে পারে।

৬। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন : দুর্নীতির সাথে জড়িত সকল কর্মকান্ডকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা যেতে পারে। যাতে তারা সব ধরনের প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা : দুর্নীতি দমনের পূর্বশর্ত হল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কোনভাবেই যাতে শাস্তি এড়িয়ে যেতে না পারে, সেজন্য দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের কঠোর প্রয়োগ দুর্নীতির প্রবণতা হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৮। পর্যাপ্ত বেতন ও পারিশ্রমিক প্রদান : রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন তাদের প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত বলে অনেক সময় তারা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য বাধ্য হয়ে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। তাই তাদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় বেতন ও সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করা। অন্যথায় দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না।

৯। দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বয়কট করণ : অনেক সময় পেশাগত বা ব্যবসায়িক দিক থেকে সমাজের মনুষ অতি সহজে দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করতে পারে। ঘুষখোর, সুদখোর, চোরাচালানি প্রভৃতি শ্রেনীকে সামাজিকভাবে বয়কট ও তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হলে দুর্নীতির প্রবণতা হ্রাস পাবে।

১০। আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্যহীনতার জবাবদিহিতার ব্যবস্থাকরণ : দুর্নীতি দমনের উত্তম ও কার্যকর ব্যবস্থা হল সরকারী প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয় ও ব্যয়ের মধ্যকার সামঞ্জস্যহীনতার সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কঠোর জবাবদিহীর ব্যবস্থা গ্রহন করা। অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে নেয়া হলে দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাবে।

সর্বোপরি উপরের আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, দুর্নীতির কালো হাত সমাজ জীবনের সকল দিককে গ্রাস করে জাতীয় উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করে। আর ইসলামী শরী'আত এ ব্যাপারে কুর'আন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস ভিত্তিক সকল আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

আবশ্যই এটা নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রের সকল সদস্যের এই অনুভূতি আছে যে, তাদের সরকারের প্রতি একটি নিশ্চিত নির্ভরশীলতা রয়েছে। তাদের কখনো এই ধারণা হবে না যে, তারা এই সমাজে মূলস্রোতের বাইরে। আর এজন্য সমস্ত দলগুলো নির্দিষ্টভাবে যারা সমাজে সবচেয়ে নিপীড়িত তাদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টিপাত করা। তাদের সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকারী অনুদানের ঘাটতি না করা এবং তাদের উন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। যে কোন সরকারের বৈধতার মাত্রা নির্ভর করে সরকার ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রার উপর। আর একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনই হচ্ছে জনগণের অংশগ্রহণের একমাত্র স্বীকৃত মাধ্যম। এতে জনগণ তাদের ইচ্ছামত যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিদেরকে সরকারে পাঠাতে সহযোগীতা করতে পারে।

সংসদে কথা বলার অধিকারের ক্ষেত্রে সকল সাংসদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, এতে তারা জনগণের দুর্ভোগ এবং অধিকারের কথা নিবিঘ্নে সরকারের নিকট তুলে ধরতে পারবে।

এছাড়া বাকি যেই সমস্ত বিষয়াবলী সুশাসনের জন্য জরুরী যেমন বেতার ও টিভির স্বায়ত্বশাসন, বিনিয়োগ বান্ধব সরকার, কার্যকরী ও দক্ষ প্রশাসন এবং সকলের অংশগ্রহন ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ উপলব্ধির মাধ্যমে সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহন করা হলে সুশাসন নিশ্চিত করা যে কোন সরকারের জন্য সহজ। যদিও সার্বিকভাবে সুশাসনের বিষয়টি অর্জন করা বর্তমান বিশ্বে কঠিন। তারপরও এই আশা করা যায় যে, ইসলামী শরী'আহ যদি আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা হয় তাহলে একটি নিশ্চিত সুশাসনের রাষ্ট্র বা সরকার উপহার দেয়া সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

উপর্যুক্ত আলোচনা-পর্যালোচনায় যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা'হল আজকে বিশৃংখলাপূর্ণ সমাজে শৃংখলা, স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন শরী'আহ ভিত্তিক আইন প্রনয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত বিধি-বিধানেই মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আমাদের বর্তমান বিশ্বে ইসলামী উম্মাহর অবনতি ও অবক্ষয়ের মূল কারণ হচ্ছে ইসলামী শরী'আহ তথা আসমানী বিধি-বিধান লংঘন।

বর্তমান সন্দর্ভটিতে ইসলামী শরী'আহ আইন, ইসলামী শরী'আহ আইনে মানব জীবন, ইসলামী শরী'আহ আইনের প্রয়োগিক ধারা, সুশাসন নিশ্চিত করণে ইসলামী শরী'আহ আইন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শরীআহ আইনের সহায়ক ভূমিকা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে ইসলামী উম্মাহ ও তাদের উত্তরসূরীগণ এর যৌক্তিকতাকে উপলব্ধি করতে পারে। মহান রাব্বুল আলামীন এ দুনিয়ায় মানুষকে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন এবং পরকালীণ কল্যাণের উদ্দেশ্যে ইসলামী শরী'আত অবতীর্ণ করেছেন, যার অবয়ব নির্মিত হয়েছে পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে। এ শরী'আতের বিধি-বিধানগুলো পর্যালোচনা করলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শরী'আতকে কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানব জাতির জন্যে মনোনীত করেছেন। অথচ এই শরী'আতের ধারক-বাহক মুসলমানরা এর উপর আস্থা হারিয়ে পাশ্চাত্যের আইনকে নিজেদের জীবন চলার পথ হিসেবে গ্রহন করেছে। এই শরী'আহ যে তাদের জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারে এবং সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, এ সত্যটা তারা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারছে না। অথচ ইসলামী শরী'আহই পারে মানব-সমাজে শান্তি-সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে। আর আমাদের করণীয় হচ্ছে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নের জন্য ইজতিহাদ অর্থাৎ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শরী'আহ যে প্রগতির মুকাবিলা করতে সক্ষম তা প্রমাণ করা। ইসলামী শরী'আহ বর্তমান সমাজের কল্যাণ সাধনে এবং মানব জীবনে তার কাঙ্ক্ষিত সুফল দানে সক্ষম হবে। যদি জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ইসলামকে সার্বিকভাবে গ্রহণ করা হয়। ইসলামকে এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে ইসলাম জীবনের সব কয়টি দিককে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একারণেই পবিত্র কুরআনে কিছু আহকাম গ্রহণ করে বাকি কিছু বাদ দেয়ার বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন

Dhaka University Institutional Repository

না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন।'[২৫]

এখানে একটি জরুরী বিষয় উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ আইনই ইসলামী ভাবধারায় তৈরী। যেমন- ফৌজদারী আইন, উত্তরাধিকারী আইন এবং সামাজিক আইন। অতএব ইসলামী শরীআহ স্বঅবস্থানে রেখে ইসলামী শরীআহ আইনের অবশিষ্ট বিধানাবলীকে কার্যকরী করতে পারলে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব : আর ইসলামী শরীআহ আইন মানবার কল্যাণেই যে ৪টি বিষয়ে হুদুদ তথা নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে যেমন- চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার ও হত্যা এবং অন্যান্য দিকসমূহের ব্যাপারে তা'যিরাত বা ধমকমূলক শাস্তির বিধান দিয়েছে।

ইসলামী শরীআহ সুশাসন দিতে এজন্যই সক্ষম যে, মানুষের সার্বিক চাহিদা নিশ্চিত করার পরই স্বভাবসিদ্ধ অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যেনার হদ (শাস্তি) কায়েম করার জন্যে অবশ্যই এমন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা চাই যেখানে বিয়ে করতে ইচ্ছুক লোকদের জন্যে হালালভাবে বিয়ে করার সহজ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে এবং অবৈধ যৌনাচারের পথ অবরুদ্ধ থাকে। একদিকে অল্প বয়সে বিয়ের ব্যবস্থা করা হলে, মহরের পরিমান কমানো হলে, বাসস্থান ও আসবাবপত্র সহজ লভ্য করা গেলে, বিয়ে অনুষ্ঠানের খরচ কমানো সম্ভব হলে, অন্যদিকে সমাজকে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা, পর্দাহীনতা, অশ্লীল গল্প-নাটক, উপন্যাস, নাচ-গান, সুড়সুড়ি দানকারী শিশুসাহিত্য হতে পূত পবিত্র রাখা গেলে তখনই ব্যভিচারী নারী পুরুষকে শাস্তি দান যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত হয় এবং বিধানদাতার এ শাস্তি ব্যবস্থাও পুরোপুরি সার্থক হয়।

এ আলোচনা হতে আরো বুঝা যায় যে, ইসলামী শরী'আতের কোন অংশ বাদ না দিয়ে তাকে সঠিকভাবে গ্রহন করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে কোন রকমের শিথিলতা বা অবহেলা গ্রহণ করা যায় না। এখানে শরী'আত বলতে গোটা ইসলামকেই বুঝানো হয়েছে। ইসলামের আকীদা, চিন্তা-ভাবনা, ইবাদত-বন্দেগী, কল্পনা, অনুভূতি, চরিত্র, মূল্যবোধ, আদব-কায়দা, আইন-কানূন সবই বুঝানো হয়েছে।

ইসলামী শরী'আত একাকী কখনো সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে না, যতক্ষণ না তার সাথে তার অনুসারীদের মানসিক, চিন্তাগত পরিবর্তন সম্পৃক্ত হয়। এ সম্পৃক্ততার ফলে গোটা উম্মাহ শরী'আতের সাথে মানানসই একটা স্তরে উপনীত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ। তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক জীবনে ইসলামের সুফল পেতে হলে আমাদেরকে এমন মুসলিম ব্যক্তি তৈরী হতে হবে যা ইসলামী শরীআ'তের সুবিচারে বিশ্বাসী এবং পূর্ণ বিশ্বাস ও সন্তুষ্টির সাথে ইসলামী শাসন কামনা করে এবং নির্দ্বিধায় ইসলামী আইন মেনে নিতে পারে। কেননা কোন আইনই সুশাসন দিতে পারে না যদি সে আইনকে তাঁর নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া না হয়। ইসলামী শরী'আত বর্তমান যুগে বিশেষত আরব ও মুসলিম দেশসমূহে অবশ্যই বাস্তবায়নযোগ্য এবং সুশাসনের ক্ষেত্রে এসব দেশে ইসলামী শরী'আত ছাড়া অন্য কোন আইন কল্যাণকর ও বাস্তবায়ণযোগ্য হতে পারে না।

অতএব আমাদের উচিত মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী শরী'আহ আইন সম্পর্কে পরিচিত হওয়া, অত:পর তা আমাদের কর্মে বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ইসলামী শরী'আহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করা। আমাদের মানবগোষ্ঠীকে ইসলামী শরী'আহ সম্পর্কে আরো বাস্তবধর্মী জ্ঞানার্জনে সহায়তা দান করা। শরী'আহ আইন সম্পর্কে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আরো সচেতন করা এবং শরী'আহ আইনের সুফল সম্পর্কে তাদেরকে সম্যক জ্ঞান দান করা। সমাজে সচেতন শ্রেণী, শিক্ষিত সমাজ, সমাজপতি বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারকেও এ দায়িত্ব গ্রহন করতে হবে।

মোটকথা যে জনসমষ্টি নিয়ে সমাজ গঠিত সেই জনসমষ্টির প্রত্যেকটি ব্যক্তি ইসলামী শরী'আহ আইনে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই একটি সুন্দর, সুশীল ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১) ডা.মোঃ নুরুল ইসলাম, মানবাধিকার ও সমাজকর্ম , নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫, পৃ.১২

২) গাজী শামছুর রহমান, মানবাধিকার ভাষ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৪, পৃ. ৬

৩) Encyclopedia of Social Work, Vol-iii, NSAW New York, 1995, P.2176

৪) আল-কুর'আন, ৪:৫৮

৫) আল-কুর'আন, ৪:১৩৫

৬) এ্যাড. মুজিবুর রহমান, ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব ; শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন-৯১, বাংলাদেশ-সৌদী আরব, ভ্রাতৃ সমিতি ঢাকা, পৃ. ১৪১

৭) ডা. মুসতাবা আসসিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৮) এ্যাড. মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

৯) এ্যাড. মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

১০) Md. Ali Akbar, Element of social welfare, (2nd ed), College of social welfare and Research Center, Dhaka,1965, Page 185.

১১) Encyclopodia of social work, in India Vol-2,1967, Page 302.

১২) Beveridge Report, P.10 উদ্বৃত, অ,স,ম নুরুল ইসলাম ও মোঃ হাবিবুর রহমান, কল্যাণনীতি ও কর্মসূচী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ১৩২

১৩) আল-কুর'আন, ১৭:৩৪

১৪) আল-কুর'আন, ৮৩:১-৩

১৫) ইবনে মাজা। সূত্র ; দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯৯

১৬) আল-কুর'আন, ১০৯: ৬

১৭) রেজাউল করিম, সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ১০৩

১৮) গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহম্মদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা- ১৯৪৩, পৃ. ৩৪০

১৯) সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত মুহাম্মদ (স.); তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ,ঢাকা-১৯৯৭, পৃ.৫২-৫৩

২০) আল-কুর'আন, ৪:১৩৫

২১) আল-কুর'আন, ৪:৫৮

২২) আবুল আ'লা মওদুদী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২-১৩

২৩) আবুল আ'লা মওদুদী, বিশ্ব নবীর রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি, অনুবাদ অধ্যপক লুৎফর রহমান ফারুকী সাইয়েদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ১৩

২৪) প্রাগুক্ত পৃ.১৪

২৫) আল-কুর'আন, ৫:৪৯

আল-কুর'আন, ২:২০৮

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

	:	আল-কুর'আন
	:	সহীহ্ বুখারী শরীফ
	:	সহীহ্ মুসলিম শরীফ
	:	সুনানে আবু দাউদ শরীফ
	:	সুনানে ইবনে মাযাহ্
	:	জামে তিরমিযী
	:	সুনান আন-নাসাঈ
আবুল ফজল জামালদ্দিন ইবনে মানজুর আল-আফরীকী	:	লিছানুল আরব (বৈরুত দারু ছাদের,১৪০২ হি.)
আবু মুহাম্মদ আব্দুলাহ্ বিন মুহাম্মদ আল কুরতুবী	:	আলজামে-লিআহকামিল কুরআন, ১ম খন্ড মিশর, কায়রো,
মুহাম্মদ শফিক গারবা	:	মৌসু'আতুল আরাবিয়াহ্, ইহইয়াউত তুরাসুল লিলআরাবী,বৈরুত,লেবাবন ১৯৮৭খৃ.
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	:	ইসলামী শরী'আতের উৎস,খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৩
ইসলামী বিশ্বকোষ	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশান ঢাকা ১৯৮৭
সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ - ১৯৮২খৃ.
ইউসুফ আল কারজাভী	:	শরী'আতুল ইসলাম খুলুদুহা ওয়াসালাহুহা ফি কুলি যামান ওয়ামাকান, আল-মাকতারাতুল ইসলামীয়া, বৈরুত-১৩৯৭
ইবনু তাইমিয়া	:	মাজমূ' আল-ফাতাওয়া
মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল	:	মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৬
ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী	:	ইসলামী আইন ও বিচার(ত্রৈমসিক গবেষণা পত্রিকা) বর্ষঃ ৩সংখ্যা, ৯ জানুয়ারী মার্চ ২০০৭
সাইয়েদ কুতুব	:	মা'আলিম ফিত-তদরীক
ইমাম মালেক	:	মুয়াত্তা
ইমাম আহমদ	:	মুসনাদে আহমদ
ড. মুহাম্মদ সাদ আল-ইয়ূবী	:	মাকাসিদুশ-শরীআহ্ আল-ইসলামিয়াহ্
ড. আহমাদ আল-বাইসূনী	:	ইমাম শাতিরবীর মাকাসিদ তত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল ওয়াহাব খাললাফ	:	ইলমু উসুলিল ফিকহ
ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন	:	ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-২০০৪
মাওলানা তকী উসমানী	:	উলুমুল কুর'আন
ইমাম রাগের ইস্পাহানী	:	মুফরাদাত
মোলা জিউন (র.)	:	নুরুল আনওয়ার দেওবন্দ, ইয়াসির নাদিম তা. বি.
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	:	হাদীস সংকলনের ইতিহাস,খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর-২০০০
ড.রশিদুল আলম	:	মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির,ঢাকা-১৯৯৯
অধ্যাপক মো:আলতাফ হোসেন	:	ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন বাংলাদেশ, ল' বুকসেন্টার ২০০৫
ড. মোঃ আমির হোসেন সরকার	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৫বর্ষ, ১ম সংখ্যা ,জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫
আবদুল করীম যায়দা	:	উসূলুদ দাওয়াহ, তৃতীয় সংস্করণ, দার- উমর ইবনুল খাত্তাব, ইস্কান্দারিয়া- ১৯৭৫
মুহাম্মদ মুসা	:	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১৯৯৬
ইবনে হিশাম	:	সীরাত ৭ম সংস্করণ- ১৯৮৩, দারুল ইমান প্রকাশনী , সৌদী আরব
আব্দুল কাদির আওদাহ শহীদ	:	ইসলামী আইন বনাব মানব রচিত আইন, (অনু: মাওলানা কারামত আলী নিযামী) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারী-২০০৫
ড. এমাজউদ্দীন আহম্মদ	:	রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ২৪তম সংস্করণ (ঢাকা বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, নিউ পূবালী মূদ্রায়ন ১৯৯৬ইং)
গাজী শামসুর রহমান	:	অপরাধ বিদ্যা, ঢাকা পল্লব পাবলিসার্স ১৯৮৪
ড. ফকরী মহাম্মদ ওকাজ	:	ফাসাকাতুল অকুবাত ফী আল্-শরী'আহ্ আল্-ইসলামিয়া (জেদ্দাঃ ওকাজ লাইব্রেরী ১৯৯৫ইং)

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আমীন (ইবনে আবেদীন নামে খ্যাত)	:	রদ্দুল মুহতার 'আলা আল-দূর আল-মোখতার, ৪র্থ খন্ড,
ইসমাইল বিন হাম্মাদ আল-জাহরী	:	আল-ছিহাহ তাজ আল-লুগাত, ৪র্থ খন্ড, ২য় সংস্করণ বৈরুত দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৩৯৯হি.)
ইমাম আলাউদ্দীন আবু বকর বিন মাসউদ আল-কাছানী আল-হানাফী	:	বাদায়ে, আল-ছানায়ে,কি তারতীব আল-শারায়ে, ৭ম খন্ড, প্রথম সংস্করন, পাকিস্তান-১৪০০
মুহাম্মদ বিন আহম্মদ বিন জজ্জী	:	কাওয়ানীন আল-আহকাম আল শরী'আহ্ ওয়া মাসায়েল আল-ফরু আল-ফকহীয়াহ বৈরুত
সালামা শায়বানী	:	মুগনী আল-মুহতাজ
ইবনুল আরবী	:	আরেজাতুল আহওয়াজী, ৬ষ্ঠ খন্ড, (বৈরুত দারুল কুতুব আল-আরবী)
আলামা কাছানী	:	বাদায়ে আল-ছানায়ের ৭ম খন্ড, আলী করায়া, ফিকহ আল-কুরআন ওয়া আল সুন্নাহ
বোরহানউদ্দিন আল-মারগেনানী	:	হিদায়াহ,
ইবনে রুশদ	:	বিদাইয়াতুল মুজতাহিদ, ২য় খন্ড
ড. ইউসুফ হোসাঈন আহমদ	:	রিসালাতু ফিল মিরাছ, হক প্রকাশনা, ঢাকা-১৯৯৮
		শিবলী নোমানী, সীরাতুন নবী, ১ম খন্ড.
সালাহউদ্দিন	:	মৌলিক মানবাধিকার, (ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা)
মুহাম্মদ বিন আবী বকর আল-রাজী	:	মুখতার আল-ছিহাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব)
আল-ইমাম জাকারিয়া আল-আনসারী	:	তুফফাহাতু তুল্লাব, ৪র্থ খন্ড বৈরুত : আল-মুযাচ্ছাছা আল-আরাবীয়া
ইবনে হুম্মাম	:	শরহে ফতহুল কাদীর, ২য় খন্ড (পাকিস্তন, কোয়েটা, রশিদীয়া লাইব্রেরী)
মুহাম্মদ জুরকানী	:	শরহ আল-জুরকানী আলা মুয়াত্তাই ইমাম মালেক, ৮ম খন্ড (বৈরুত : দারুল মায়িদা ১৩৭৮হি.)
মুহাম্মদ বিন আলী আল-শাওকানী	:	নাইলুল আওতার, ৭ম খন্ড, ১ম সংস্করণ

Dhaka University Institutional Repository

কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম : শরহি ফাতহুল কাদীর, আল-রাজী আল-মালেকী, আল মুনতাকা, ৭ম খন্ড

শাহওয়ালী উল্লাহ : হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২য় খন্ড

এম.এম. পিকথল : ইসলামে দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামী সংস্কৃতি (অনু সানাউল্লাহ নুরী) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ১০২

ড.হাসান জামান : আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাক-১৯৮৩

অলী উদ্দিন মুহাম্মদ : মশকাতুল মাসাবিহ, কলিকাতা ,১৩৫০ হি.

ডা. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী , ঢাকা-১৯৮৪

ড. রশীদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা , সাহিত্য কুটির, ঢাকা ও বগুড়া, ১৯৮৪

শাহেদ আলী : ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা , ঢাকা-১৯৬৭

মুহাম্মদ আবদুর রহীম : ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮৭

অধ্যাপক আবুল কাশেম ভূইয়া : যুগ জিজ্ঞাসা ও পরিবার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭

ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান : ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা-২০০৪

আবদুস শহীদ নাসিম : ইসলামের পারিবারিক জীবন, বর্ণালী বুক সেন্টার, ঢাকা-১৯৯৭

মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশাইরী : সহীহ মুসলিম, আসাহ্-হাল মাতাবী, করাচী - ১৯৩০

মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নু'মানী : ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা - ১৯৯৭

আবু বকর আহমদ ইবনল হুসাইন ইবনে

Dhaka University Institutional Repository

আলী আল বায়হাকী	:	আস্ মুনানুল কুরবা, দার আলকুতুব আল ইসমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯৪
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল হাকীম নিশাপুরী	:	আল-মুসতাদরিক, ২য় খন্ড,দারিয়াতুল মা'আরিফিল উসমানিয়া, হায়দারাবাদ-১৩৪৫ হি.
আহমদ মনসুর	:	বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স.), তাসনিম পাবলিকেশন্স ঢাকা-১৯৯৫
আল্লামা ইফসুফ আল-কারযাভী	:	ইসলামে হালাল-হারামের বিধান (অনু. মাও. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম) খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৫মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৬।
শাহীন আখতার	:	নারী ও আইন, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি, ঢাকা -১৯৯২
ইমাম আল নব্বী	:	শারহে মুসলিম, দার আল ইয়াহ ইয়া আত-তিরাস আল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ২য় সংস্করণ-১৯৭২
সম্পাদনা পরিষদ	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামে শিশু পরিচর্যা, ঢাকা-১৯৮০
ড. হাবীবুল্লাহ মোখতার	:	ইসলাম আউর তরবিয়্যতে আওলাদ (উর্দু), দারুত তাসরীফ, ১৯৮৮
আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী	:	সহীহ আল বুখারী, বশীর হোসাইন এন্ড সন্স, কলিকাতা-১৯৭৩
ইমাম গাযযালী	:	ইয়াও উলুমুদ্দীন (অনু.মাওলানা ফজলুল করিম, ঢাকা-১৯৬১)
সুলাইমান ইবনুল আশআস ইবনে ইসহাক আল সিজিস্তানী	:	আবু দাউদ, এম.এম সাইদ এন্ড কোং, করাচী-১৩৮৭
মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)	:	তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, (ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০)
সম্পাদনা পরিষদ	:	দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সম্পাদনা পরিষদ, কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম অলি আল দীন মুহাম্মদ	:	মিশকাত আল মাসাবিহ, এম, বশীর হাসান এন্ড সন্স, কলিকাতা, তা, বি.
ইমাম মুহাম্মদ (র.)	:	মুওয়াত্তা, অনূদিত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগষ্ট-১৯৮৮,
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	:	বাংলাদেশ রাষ্ট্র রাজনীতি , গণতন্ত্র ও সুশাসন, একুশে বাংলা প্রকাশনা , ঢাকা
ড. এমাউদ্দীন আহমেদ	:	রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক করর্পোরেশন লিঃ ঢাকা, ২০০৭
অধ্যাপক একে এম শহীদুল্লাহ, এম.রফিকুল ইসলাম	:	আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ওরাল পাবলিকেশন- ঢাকা ২০০৪
মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন	:	রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি, মৌসুমী পাবলিকেশনস , রাজশাহী-১৯৮৩
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	:	আল-কুর'আনে রাষ্ট্র ও সরকার, খায়রুন প্রকাশনী,ঢাকা
এ জেড , এম,শামসুল আলম	:	ইসলামী রাষ্ট্র , খোশরোজ, কিতাবমহল, ঢাকা ১৯৯৬
প্রফেসর ফিরোজা বেগম	:	রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি , এঞ্জেল প্রেস এ্যান্ড পাবলিকশন্স ২০০৩
ডা.মোঃ নিজাম উদ্দীন	:	দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ, ২০০৭
মুহাম্মদ ফরহাদ হোসেন	:	হযরত উমর (রাঃ) সুশাসন, দৈনিক ইত্তেফাক ২ মার্চ ২০০৭
অধ্যাপক গোলাম আজম	:	ইসলাম ও গণতন্ত্র, আল-আযমী পাবলিকেশনস,ঢাকা-২০০৬
গুড গভর্ন্যান্স রিসার্স গ্রুপ	:	সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও মত প্রকাশের মুখপত্র, মাননীয় ভোটার
দৈনিক সংগ্রাম	:	মহানবী (স.) সম্পাদিত জগতের প্রথম বহুজাতিক রাষ্ট্রসনদ, ১৪ এপ্রিল ২০০৭
বদর উদ্দিন আহমেদ	:	গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও নৈতিক দায়িত্ব, দৈনিক নয়াদিগন্ত

Dhaka University Institutional Repository

		দৈনিক সংগ্রাম, মহানবী (স.) সম্পাদিত জগতের প্রথম বহুজার্তিক রাষ্ট্রসনদ, ১৪ এপ্রিল ২০০৭
আমার দেশ	:	গণতন্ত্র ও ইসলাম, আমার দেশ , দৈনিক পত্রিকা , ২৭ এপ্রিল ২০০৭
ডা.মোঃ নুরুল ইসলাম	:	মানবাধিকার ও সমাজকর্ম , নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫
গাজী শামছুর রহমান	:	মানবাধিকার ভাষ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৪,
এ্যাড. মুজিবুর রহমান	:	ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন-৯১, বাংলাদেশ-সৌদী আরব, ভ্রাতৃ সমিতি ঢাকা,
অ,স,ম নুরুল ইসলাম ও মোঃ হাবিবুর রহমান	:	কল্যাণনীতি ও কর্মসূচী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭
রেজাউল করিম	:	সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকা-২০০৪
গোলাম মোস্তফা	:	বিশ্বনবী, আহম্মদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা-১৯৪৩
সৈয়দ বদরুদ্দোজা	:	হযরত মুহাম্মদ (স.): তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ,ঢাকা-১৯৯৭
আবুল আ'লা মওদুদী	:	বিশ্বনবীর রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি, অনুবাদ অধ্যপক লুৎফর রহমান ফারুকী সাইয়েদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা
ইমাম নববী	:	জামি তিরমিযী, রিয়াদুস সালিহীন,
মুহাম্মদ জুরকানী	:	শরহ আল-জুরকানী আলা মুয়াত্তাই ইমাম মালেক, ৮ম খন্ড (বৈরুত : দারুল মায়িদা ১৩৭৮হি.)
A.P. Cowic	:	OXford advance Learner's dictionary of current English (4th edition, oxford

Dhaka University Institutional Repository

University pres 1987, Machip pres 1993 Newyork)

Anwar Ahmed Quadri : Islamic Jurispradense in the morden world (Tajcompany Newdelhi-1986)

E.B. Taylor : Primitive Culture, Vol-1, London , 1981

Abul Hashim : The Creed of Islam, Islamic foundation Bangladesh, Dhaka-1980

David de Santillana : Law and Society, the Legacy of Islam,London,1931

Kazi Ayub Ali : An Introduction to Islamic Culture

George Barnard Shaw : The Genuine Islam, Singapore Vol-1, 1936,

M.F. Nimkoff : Marriage and the Family, Boston, 1947

Encyclopaedia Americana : Vol-ii, Crolier ircorporate 1980

Government of peoples republic of Bangladesh : The Dissolution of Muslim Marriages Act. 1939 (Vii of 1939)

: The Muslim Family laws Ordinamce, 1961(viii of 1961) ,

: The Muslim Marriage and Divorce (Ragistration) Act, 1974 (Lxll of 1974) ,

: The Family court ordinance, 1985 (xviii of 1985)

Hammuda Abdalati : Islam in Focus, Al-madina printing and publication co, Jeddah-1973

Abdel Rahim Omran : Family planning in the legacy of Islam, New York, 1992.

Sherwani H.K	:	Muslim Poitical Thought and Administration(1965) আবদুল মওদুদ,
Rosenthal Erwin	:	Political Thought in Mediaeval Islam .1968)
Dr. Garner	:	Polical Science and Government.
Bosworth Smith	:	Life of Muhommad
	:	Encyclopedia of Social Work Vol-iii, NSAW New York. 1995. P.2176
Md. Ali Akbar	:	Element of social welfare, (2nd ed), College of social welfare and Research Center, Dhaka.1965
	:	Encyclopodia of social work, in India Vol-2.1967